রক্তে কাঁপে দ্রোহ

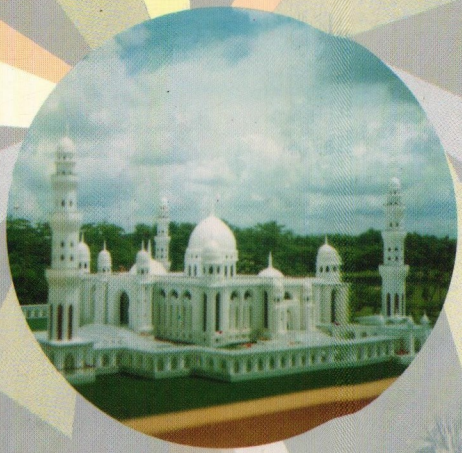

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

রক্তে কেনা দেশ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদ রফিকুল ইসলাম স্মৃতি সংকলন

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রক্তে জাগে দ্রোহ

শহীদ রফিকুল ইসলাম স্মৃতি সংকলন

সম্পাদক
মোঃ জিল্লুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মাহফুজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ আব্দুল হক
মোঃ শওকাত আলী
আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
নূরুল ইসলাম বুলবুল
মোঃ রাইসুল ইসলাম রাসেল
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
এ.টি.এম সিরাজুল হক
মুহাম্মদ সাইফুল আরেফীন

প্রচ্ছদ
মোবাশ্বির মজুমদার

গ্রাফিক্স
Tech N Graph
৭১, ইয়াছিন টাওয়ার (৩য় তলা)
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা - ১০০০।
ফোনঃ ০১১-৮৩৮০১২।

কম্পোজ ও মুদ্রণে
হক প্রিন্টার্স
১৪৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৭১০০৪৯৬

প্রথম প্রকাশ- ৩০ ডিসেম্বর ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ- ১৭ জুন ২০০৩

শুভেচ্ছা মূল্য
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সদা হাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটি আজ আর নেই,
ভাবতেই শান্তনার সব বাণী রুদ্ধ হয়ে আসে

www.pathagar.com

১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের সমাপনী অ্যালবামে লেখা
শহীদ রফিকুল ইসলামের বাণী।
সমাপনী অ্যালবাম প্রকাশের পূর্বেই তিনি
নির্মমভাবে শহীদ হন।

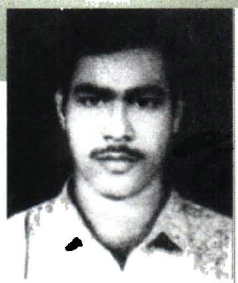

নাম ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম
পিতা ঃ মাওঃ সাইদুর রহমান
গ্রাম ঃ লাঙ্গল দাড়ীয়া
থানা ঃ আশাশুনি
জেলা ঃ সাতক্ষীরা।

শহীদ জিয়াউর রহমান হল ।
স্মৃতিময় ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে কষ্ট হলেও সেশনজটের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ায় ভালই লাগছে। সত্য ও সুন্দরের পক্ষে আমি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম সারাক্ষন, ভবিষ্যতেও থাকবো ইন্‌শাআল্লাহ।

ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের নাজেমে আলা মোস্তাক আহমেদ খাঁন **ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে** শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শহীদ রফিকুল ইসলাম

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী

মহান রবের শুকরিয়া আদায় করছি যার একান্ত মেহেরবানীতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের তৌহিদী জনতার অর্ধ শতাব্দীর রক্তঝরা আন্দোলনের ফসল। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের কথা বলতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন, শহীদ আমিনুর রহমান, শহীদ মহসিন কবীর, শহীদ আল-মামুন ও শহীদ রফিকুল ইসলাম। কি অপরাধ ছিল তাদের? রব্বুল আলামীনের ভাষায় "এছাড়া তাদের আর কোন অপরাধ ছিলনা যে,তারা স্ব-প্রশংসিত মহান রবের প্রতি ঈমান এনেছিল।" পাঁচজন শহীদ,অসংখ্য গুলিবিদ্ধ ও পঙ্গু ভাইদের রক্তে রঞ্জিত ই.বি.র প্রতি ইঞ্চি মাটি। আজকের সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস ও আমাদের ভাইদের ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানার ফসল। রক্তভেজা এই ময়দানে শিবির কর্মীরা প্রমান করেছে হত্যা করে, নির্যাতন চালিয়ে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করা যায়না বরং তা ইসলামী আন্দোলনের গতিকে আরো বেগবান করে। বাতিলের হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের মোকাবেলায় শহীদি কাফেলার প্রতিটি নেতাকর্মীর দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও মানসিক শক্তি দেখে আমার মনে হয়েছে বিজয় তাদের জন্য অপেক্ষামান (ইনশাআল্লাহ)। শহীদ রফিকুল ইসলাম সহ ৫ জন শহীদ, অসংখ্য পঙ্গু ও আহত ভাইদের রেখে যাওয়া কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব এখন ই.বি'র প্রতিটি জনশক্তির। আশা করি এ স্মরনিকা ই.বি সহ এদেশের ছাত্রসমাজকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করবে। মহান রব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে তার দ্বীনের কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দিন। আমিন।

(নূরুল ইসলাম বুলবুল)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

শাখা সভাপতির বাণী

শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মুক্তিকামী জনতার হৃদয়ের স্পন্দন। বাংলাদেশের সবুজ ভূখন্ডে মানুষের মনগড়া আদর্শের শাসন ও শোষনের নাগপাশ ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর প্রভূত্ব ও রসূল (সঃ) এ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আপোষহীন শ্লোগান নিয়ে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রয়ারী এক সোনাঝরা সকালে এ কাফেলার যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শ্লোগানকে উচ্চকিত করতে গিয়ে ২০০১ সালের ৮ জুন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে নির্মমভাবে শহীদ হন আল্লাহর দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী শহীদ রফিকুল ইসলাম। শহীদ রফিকুল ইসলাম, শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন, শহীদ আমিনুর রহমান, শহীদ মহসীন কবির, শহীদ আল-মামুন সহ অসংখ্য গুলিবিদ্ধ , আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী ভাইদের রক্তে রঞ্জিত ই.বি'র প্রতি ইঞ্চি মাটি। এই হত্যা ও সন্ত্রাস কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। বরং তা ছিল ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠীর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। ষড়যন্ত্রকারীদের সন্ত্রাস, হিংস্রতা ও নির্মম তান্ডবতা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্ত পিচ্ছিল অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করেছে। তাই আজ মুষ্টিবদ্ধ শপথ ই.বি'র সর্বত্রই "উজাড় দু'হাত জুড়ে শোধ নেব ঋণ দেবনা সীমানা ছেড়ে ইঞ্চি জমিন।" শহীদ রফিকুল ইসলামের বর্ণাঢ্য জীবনকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে আমাদের এই উদ্যোগ। শহীদের একজন সাথী হিসেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ স্মরনিকা দেশের পথ হারা ছাত্র সমাজের নিকট মুক্তির আলোকবর্তিকা হিসাবে পথ নির্দেশে সক্ষম হবে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা এবং সহযোগীতায় এই স্মরণিকা প্রকাশিত হলো তাদের সবাইকে হৃদয় নিঃসৃত মোবারকবাদ। মহান রব্বুল আলামীন শহীদ রফিকুল ইসলামের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ আমাদের সবাইকে আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দান করুন এবং শহীদের তপ্ত তাজা খুন কবুল করুন। আমীন।

(মুঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব কালের চিরন্তন ধারাবাহিকতা। সত্যের পতাকাবাহী নবীগণ এবং তাঁদের অনুসারীগণ যুগে যুগে এই সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছেন। ইসলামের ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করছে। সাময়িক বাধাগ্রস্থ হলেও সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের এই কাফেলা কখনো স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এই সংঘাত চলছে ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশেও। ২০০১ সালের ৮ জুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রচিত হয়েছিল সেই চিরাচরিত দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরতম অধ্যায়। একটি তাজা টগবগে তরুণের প্রাণোৎসর্গ তারই অনিবার্য সাক্ষ্য। স্কুল ও কলেজে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে একদিন মায়ের বুক শুন্য করে আদরের রফিক এসে ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। মায়ের আশা ছিল ছেলে তার উচ্চ শিক্ষা লাভ করে বড় হবে, দেশ জুড়ে সুখ্যাতি অর্জন করবে কিন্তু সেই আদরের রফিককে তারা মায়ের কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছে ক্ষত-বিক্ষত রক্তমাখা মুখে শহীদের খুনরাঙ্গা বিধ্বস্ত অবয়বে। পিতা-মাতার স্বপ্ন, সহপাঠীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, দুর্লভ প্রতিভা, একটি নক্ষত্র, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী এবং অনুপম চারিত্রিক গুণের অধিকারী শিবির নেতা রফিক সকলকে মুগ্ধ করে দূরের মানুষকে কাছে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তা সহ্য করতে না পেরে সেদিন হিংস্র দানবের মূর্তিতে আওয়ামী সরকারের মদদে জাসদ ছাত্রলীগ শহীদ রফিকের জীবন প্রদীপ চিরকালের মত নিভিয়ে দেয়। এই মহীরুহের জীবনালেখ্য ক্ষুদ্র স্মরণিকার মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা একটি ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও শহীদ রফিক বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে যে আল্পনা এঁকেছিলেন তার স্মৃতিগুলোকে রক্ত দিয়ে আল্পনা আঁকার অদম্য বাসনাকে সামনে নিয়েই এই স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শহীদ স্মৃতি সংকলন প্রকাশের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই শহীদের সাথীদের অসংখ্য লেখা আমরা পেয়েছি। কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক লেখা সংকুলান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 'রক্তে জাগে দ্রোহ' নামে শহীদ রফিকুল ইসলামের স্মৃতি সংকলন প্রয়াসকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন তাদেরকে পুরস্কৃত করার দায়ভার মহান রব্বুল আলামীনের উপর ছেড়ে দিলাম। শহীদের প্রতিটি রক্তের কণায় কণায় মহান প্রভু যেন উপলব্ধির আকাশে আলোময় সকালের উন্মেষ ঘটান। একদিন যেন মানুষের কাতারে মানুষের প্রকৃত মূল্য ভেদহীন সাম্যের সমাজ এবং সত্যের বিজয়ে উল্লাসিত হয় প্রতিটি শহীদি জনপদ। মহান রব্বুল আলামীনের নিকট আজ সেই প্রার্থনা।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইট-পাথর আর সবুজ ঘাসে ঢাকা এই ক্যাম্পাসে কালেমার শ্লোগানকে উচ্চকিত করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন, রক্ত দিয়েছেন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাঁদের আত্ম-ত্যাগের সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা কামনায়-

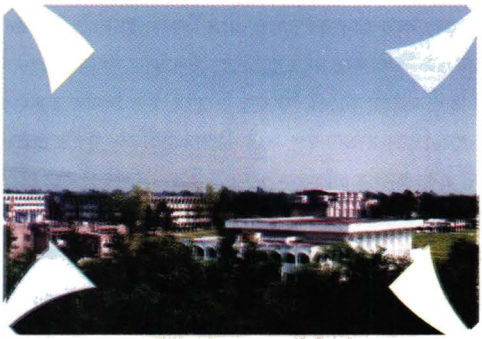

www.pathagar.com

সূচীপত্র ঃ

শাহাদাত ঃ মুমিন জীবনের কামনা ◆ অধ্যাপক গোলাম আযম ৩
জিন্দাদিল শহীদদের কাতারে দায়িত্ববান রফিক ভাই ◆ নুরুল ইসলাম বুলবুল ১২
কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২০০১-এ শিবিরের ১১৪তম শহীদ
শহীদ রফিকুল ইসলামের গর্বিত পিতা মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুর রহমান-এর উদ্বোধনী ভাষণ ১৬
শহীদ রফিক হাজারও মানুষের হৃদয়ে ◆ ইমাজ উদ্দীন মন্ডল ১৮
শহীদ রফিক ঃ কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্ন ◆ মোঃ রাইসুল ইসলাম রাসেল ২১
ই.বি ক্যাম্পাসের অতন্দ্র প্রহরী শহীদ রফিক ◆ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ২৩
রফিক স্মরণে কিছু ভাবনা ◆ আবদুর রউফ মোল্যা ২৯
একজন রফিক ভাই ◆ আহসানুল কবীর মুক্ত ৩১
রক্তসিক্ত সেই দিনটি ◆ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ৩৭
স্মৃতির দর্পন ◆ সুজাউদ্দীন জোয়ার্দার ৪১
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আওয়ামী দুঃশাসনের খন্ড চিত্র ◆ মোঃ জিল্লুর রহমান ৪৪
তুমি হেসে হেসে কাঁদালে সবাইকে ◆ মোঃ নুরুল ইসলাম ৫৮
শহীদ রফিক জেহাদী প্রেরণার উৎস ◆ মোহাম্মদ সামছুল হক ৬৩
অনুভূতির দিগন্তে শহীদ রফিকুল ইসলাম॥ ◆ মোঃ মফিজুল ইসলাম ৬৬
স্মৃতির গগনে অতুজ্জ্বল শহীদ রফিকুল ইসলাম ◆ মোঃ আকতার হোসাইন ৬৯
৫ জন শহীদের রক্তস্নাত ক্যাম্পাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ◆ আমান উদ্দীন মু. মুজাহিদ ৭২
ইসলামের বন্ধু হয়েই জীবন দিলেন যিনি ◆ মোঃ মাহফুজুর রহমান ৮২
আমাদের রফিক ভাই ◆ আমিনুল ইসলাম মুকুল ৮৬
যে খুন যোগায় প্রেরণা ◆ মোঃ আব্দুল হক ৮৯
স্মৃতির পাতায় শহীদ রফিকুল ইসলাম ◆ মুহাম্মদ নূরুল আমীন ৯৩
গর্বময় বেদনার ডায়েরী থেকে ◆ আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা ৯৬
যেমন দেখেছি রফিক কে ◆ মোঃ তৌফিকুল ইসলাম (মামুন)) ৯৮
শহীদ রফিক এক অনন্য প্রেরণা ◆ মুহাম্মদ আজিজুল হক ১০১
একজন স্বপ্নবানের স্বপ্নপুরণ ◆ কাজী মারুফ কারখী ১০৩
যে স্মৃতি চির অম্লান ◆ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ তুষার ১০৫
শত স্মৃতিতে ভাস্বর শহীদ রফিক আমার প্রেরণার উৎস ◆ মোঃ আব্দুল মান্নান ১০৮
ব্যাথাতুর সেই মুহুর্ত ◆ মোঃ ইমদাদুল্লাহ ১১০
যে কথা হৃদয়ে বাঁজে ◆ মুহা. রেজাউল হক ১১৫
শহীদ রফিক এখনও যিনি আমাদের নেতা ◆ মুঃ আবুল কালাম আজাদ ১১৭
তাঁর মত যেন হতে পারি ◆ আসাদ বিন আলীম ১২০

www.pathagar.com

চলে গেলেন সোনার মানুষ ◆ মোঃ কামারুল আলম ১২২
ফিরে এলো ৮ই জুন ◆ কাজী মাহবুবা আক্তারী ১২৪
এটা কি মগের মুল্লুক? ◆ আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের ১২৮
শহীদ রফিক ভাই ঃ যাকে পেয়েছি অতি সহজে ◆ মাহফুজুর রহমান রন্‌জু ১৩১
জান্নাতের পথে আলোর পথিক ◆ মু. উসমান গনি ১৩৪
ব্যাথাতুর স্মৃতি ◆ ওবায়দুল্লাহ (রাসেল) ১৩৮
বলা হলনা শেষ কথাটি ◆ মুহাঃ সাইফুল্লাহ আল মামুন ১৪১
যে কথা বার বার দোলা দেয় হৃদয়পটে ◆ তৌফিকুল ইসলাম ১৪৩
ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন এক নেতার নাম শহীদ রফিক ◆ মোঃ আব্দুল আলী (শাহীন) ১৪৫
যেদিন রফিক ভাইয়ের শাহাদাত ◆ মোঃ সুলতান মাহমুদ জিন্নাহ ১৪৮
স্মৃতিতে ভাস্বর শহীদ রফিকুল ইসলাম ◆ মু. রুহুল আমীন ১৫১
শোকাহত পিতার দুটি কথা ◆ মোঃ সাইদুর রহমান ১৫৪
সন্তান হারা মায়ের আহাজারী ◆ শহীদ রফিকের আম্মা ১৫৭
স্মৃতির আলপনায় একটি নাম ◆ মোঃ আঃ মালেক ১৫৯
শহীদ রফিক, কিছু স্মৃতি, কিছু কথা ◆ মোঃ খলিলুর রহমান ১৬৭
ভুলতে পারিনা শহীদ রফিককে ◆ মোঃ আব্দুল গাফফার ১৭০
শহীদ রফিকের ◆ বড় বোন হালিমা খাতুন ১৭২
শহীদ রফিকের ◆ সেঝ বোন জাহীদা ১৭৪
শহীদ রফিকের ৫ম বোন ◆ সাহিদা ১৭৬
মোঃ আবু ইউছুফ ◆ শহীদ রফিকের ছোট ভাই ১৭৮
শহীদ রফিকের ছোট বোন ◆ মিস মাসকুরা পারভীন ১৭৯
শহীদ রফিকের চতুর্থ বোন ◆ সাজিদা সুলতানা ১৮০
যে স্মৃতি আজও কাঁদায় ◆ মোঃ রেজাউল ইসলাম রেজা ১৮২

নিবেদিত কবিতা ঃ

আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস ◆ মতিউর রহমান মল্লিক ১৮৫
রাত দুপুরে শহীদ রফিক ◆ মু. আব্দুস সাত্তার ১৮৬
ফেরদাউসের পাখি◆ আব্দুল সামাদ আযাদ ১৮৬
লাল জামা চাই ◆ ওবায়দুল্লাহ রাসেল ১৮৭
সুন্দর একটি অমীয় জীবন ◆ মোঃ ফখরুল ইসলাম ১৮৮
শহীদ তাঁরা ◆ সাবিত ১৮৮
চির জাগ্রত তুমি ◆ মুঃ এহসানুল তানযীল (চমন) ১৮৯
ঝিনুক বোঝাই কষ্ট দানা ◆ মুহাম্মদ সাইফুল আরেফীন ১৯১

www.pathagar.com

শাহাদাত ঃ মুমিন জীবনের কামনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

শাহাদাত শব্দের অর্থ ঃ

শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখে বা সাক্ষ্য দিয়েছে। সাক্ষী সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। 'আশ্ শাহিদ' মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা অর্থে শাহাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন মজিদে শাহাদাত শব্দটি দু'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে; অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবান করার অর্থে। জীবন কুরবানী দেয়া অর্থে শাহাদাতের ব্যবহারও পরোক্ষভাবেও সাক্ষ্য দেয়া অর্থেই বুঝায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন কুরবানী দিল সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। উল্লেখিত দু'ধরণের অর্থ বুঝাবার জন্য কুরআনের কয়েকটি আয়াত আছে যাদের অর্থ- "যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

সাক্ষী অর্থে নিম্ন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছেঃ "এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।" (সূরা বাকারা-১৪৩)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।"(সূরা হাজ্জ্ব-৭৮)

জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছেঃ "এভাবে

www.pathagar.com

আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান।" সরাসরি জীবন দান অর্থে ব্যবহার খুব বেশি আয়াতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে অর্থে "যুদ্ধে গিয়েছে ও নিহত হয়েছে" এভাবে বহু জায়গায় শহীদদের কথা বলা হয়েছে।

এটা হলো ওহুদ যুদ্ধের পরের কথা। এখানে বলা হয়েছে বদরের যুদ্ধে তোমরা আঘাত করেছ আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছো। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? তোমরা সত্যিকার মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে।

এভাবে মানুষের মধ্যে একবার জয় আবার পরাজয় আসে। চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। এটা আল্লাহ কেন করেন? কেন জয়-পরাজয় দেয়া হয়? এটা বলতে গিয়ে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহ তোমাদের মাঝে মাঝে পরাজয়ও দেন এ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মধ্যে কার কার মজবুত ঈমান তা দেখার জন্যে আর তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্যে। এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ শহীদি শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়। সাক্ষী দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষী। আল্লাহর পথে নিহত সে জীবন দিয়ে সাক্ষী দিলো যে, সত্যিকার অর্থে সে দ্বীনকে গ্রহণ করেছে।

মুমিন জীবনের কাম্য

মুমিন জীবনের কাম্য কী হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায় মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষি ভূমি। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়িতে ভোগ করে; তেমনি মুমিন দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। যে আখিরাতের কামিয়াবী মুমিন জীবনের লক্ষ্য, তাকে এক কথায় বলা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসাবে বেহেশত লাভ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, "এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারো" হিসাব দিতে গেলেই মুছিবত। সে জন্য আখিরাতের কামিয়াবী বলতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে। মুমিন জীবনের আসল কাম্য হলো এটাই। দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু 'মাতাউল হায়াতিত দুনিয়া' বা জীবিকা আছে তা নিতান্তই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আর মুমিন বেঁচে থাকবে আখিরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য।

দুনিয়ার জীবন হলো খেলার মতো। ব্যক্তির জীবনে খেলাধুলারও প্রয়োজন আছে কিন্তু সারাটা জীবনই খেলা নয়, খেলা হলো সামান্য কিছু সময়ের জন্য; ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটা মর্যাদার দিক দিয়ে খেলা হিসাবে নেয়া দরকার। আমরা যেমন লেখা-পড়া ও অন্যান্য সিরিয়াস কাজ কর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসাবে কিছু সময় খেলাধূলা করে

www.pathagar.com

থাকি, তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসকেও আখিরাত কামাইয়ের আসল কাজের ফাঁকে খেলার মতো মনে করতে হবে। দুনিয়ার জীবন এমন কিছু নয় যে এটাকে টার্গেট অথবা জীবনের উদ্দেশ্য করে নিতে হবে অথবা এটাকেই একমাত্র দ্বীন বানিয়ে নিতে হবে। মুমিন জীবনে এটাই যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে থাকে, যা হওয়া বাঞ্চনীয়, তাহলো শাহাদাত তো জীবনের স্বাভাবিক কাম্য বিষয় হবার কথা। কেননা একমাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারে যে, জান্নাত তাঁর জন্য অবধারিত। মাওলানা মওদূদী মরহুমের ফাঁসির হুকুম হবার পর ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষে করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, "জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মওতের ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়। এ সময়, এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যুদন্ড নির্ধারণ করে থাকে; তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুকে ঠেকাবার। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোন শক্তি নেই মৃত্যু কার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি কি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করবো যে, আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও?" এভাবে তিনি মৃত্যুকে জয় করে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য নযীর সৃষ্টি করে গেছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাত বরণ করে ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। এতে এটিই প্রমাণিত হলো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নির্যাতন ও শাহাদাত বরণ ইতিহাসের অসম্ভব কোন অতীত কাহিনী নয়। এ যুগেও তা বাস্তব। বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা মানুষকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করবেন।

শাহাদাতের কামনা ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম

শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারে না। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভালো ছাত্র যেমন ভালো ফলাফলের প্রমাণ দেবার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুমিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপোসহীনভাবে লড়াই করে যাবে। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে কিনা তা নিজের প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্যের মাধ্যমে প্রমাণ পেতে পারে। এ জন্য বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। আন্দোলনের কর্মকান্ডে, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যুভয় অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল করে না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা বা জযবা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

"আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকদেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার

www.pathagar.com

জীবন বিক্রয় করে দেয়। আর যে আল্লাহর পথে লড়াই করে সে নিহত হোক, কিংবা বিজয়ী হোক, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব।" (সূরা আন নেছা-৭৪)

বস্তুতঃ যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় তারাই আল্লাহর পথে কিতাল (লড়াই) করতে পারে। কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। যুদ্ধে মারা ও মরা অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করার কাজই কিতাল। যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করে অথবা বিজয় লাভ করে গাজী হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহ বিরাট পুরস্কার দেয়ার কথা বলেছেন। কিতাল শুধু মুমিনরাই করে না, যারা কাফের-বেঈমান তারাও কিতাল করে। মুমিনরা কিতাল করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা কিতাল করে তাগুতের পথে ।

আল্লাহর নাফরমানীর কয়েকটা স্তর আছে। এর মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না তারা ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধকে স্বীকারই করে না তারা হলো কাফের। আর তাগুত হলো নাফরমানী ও সীমা লংঘনকারী। তাগুত নিজে তো আল্লাহর হুকুম পালন করেই না, অন্যদেরকেও নিজের আদেশ নিষেধ মানতে বাধ্য করে। এক কথায় আল্লাহর নাফরমানীর এ সীমা লংঘনকে বলা যায় বিদ্রোহ। একটি দেশে কেউ রাষ্ট্রের হুকুম মান্য না করলে তাকে অপরাধী, আর কেউ যদি রাষ্ট্রের প্রাধান্যই স্বীকার না করে এবং অন্যান্যদেরকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ডাকে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। ঠিক তেমনি তাগুত হলো বিদ্রোহী। এজন্য ইবলিশকে যেমন তাগুত বলে তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিকেও বলা হয় তাগুত। তাই অন্তর থেকেই তাগুতী শক্তিগুলিকে অস্বীকার করতে হবে। যে কালেমা পড়ে একজন লোককে ঈমান আনতে হয় তাতে আগে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এরপরই আসে আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতএব তাগুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে পূর্ণভাবে ঈমানকে উপলব্ধি করতে পারে না। জমিতে ভাল ধানের চাষ করতে হলে প্রথমে আগাছাসমূহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। তা না হলে ধান পাবার আশা অর্থহীন। অনুরুপভাবে মনে ঈমানের চাষ করতে হলে তাগুতের উৎখাত অবশ্যম্ভাবী। আর তাগুত কি তা না জানলে উৎপাটন করবে কি করে? বস্তুতঃ তাগুত ও ঈমান দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই। হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, না হয় তাগুতের পথে। কেননা আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। খেলাফতের মর্যাদা ছাড়া মানুষের অপর কোন মর্যাদা নেই। হয় আল্লাহর খলিফা হবে, না হয় ইবলিশের খলিফা হবে। খলিফা তাকে হতেই হবে। অনুরুপভাবে প্রত্যেক মানুষ কিতাল করছে- হয় ফী সাবীলিল্লাহ না হয় ফী সাবীলিত তাগুত, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।

শহীদের কামনা

জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় যারা জীবন দান করে তাদের মৃত বলা যাবে না, তারা মৃত্যুহীন। সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

জীবন্ত, কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।"
সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ নং আয়াতে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছেঃ
"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্ক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত।এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এখনো তথায় পৌঁছেনি তাদেরও কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।"
উল্লেখিত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, যারা শহীদ হয়েছে তারা শুধু নিজেদের মর্যাদার জন্যই সন্তুষ্ট নয়, অধিকন্তু তাদের যেসব সাথী দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পাবে এ কামনায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়। হাদীস শরীফে আছে যারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে, তারা কামনা করে যে তাদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায়। এবং তারা এ কামনা করে সন্তুষ্ট হয়। আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও সে অনুগ্রহ পেয়ে খুশি হবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে নবী করীম (সাঃ) বলেন, "জান্নাতবাসী মানুষ বেহেশতের নেয়ামতগুলো পেয়ে এতো তৃপ্ত হবে যে, তাদের কেউ এ নেয়ামত ছেড়ে দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্রম।" বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতে যারা যাবে তাদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবে না যে, সে দুনিয়ায় আবার ফিরে আসুক কিন্তু শহীদগণ কামনা করবে যেন আল্লাহ দুনিয়ায় তাদেরকে আবার ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে আরো ১০ বার যেন আল্লাহর পথে নিহত হতে পারে সে কামনা তারা করবে।"

শাহাদাতের মর্যাদা

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এখানে আমরা কোরআন থেকে দুটি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করছিঃ
সূরা আল হাজ্জ্ব এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ
"যারা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিয্ক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিয্কদাতা।"
সূরা মুহাম্মাদের ৪-৬ নং আয়াতেও অনুরুপভাবে বলা হয়েছেঃ
"অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ হবে তখন প্রথম কাজই হলো গলা কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন খুব ভালোভাবে তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষন না যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করে।

www.pathagar.com

এই-ই হল তোমাদের করার মত কাজ। আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর যে সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না। তিনি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন। এবং তাদেরকে সে জান্নাতে দাখিল করাবেন যার বিষয় তিনি তাদেরকে অবহিত করিয়েছেন।"

এখানে যে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা হলোঃ

১। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের আমল কোন ক্রমেই নষ্ট হবে না।

২। আল্লাহ তাদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার নেই।

৩। তাদের অবস্থা সব দিক থেকে সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন।

৪। তাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তার পরিচয় আগে থেকেই দেয়া থাকবে। দুনিয়াতে যে জান্নাতের খোশখবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে, এমন নয় যে, বলা হয়েছে একটায় আর প্রবেশ করানো হবে অন্যটায়।

হাদীসটি হলোঃ

নবীকরিম (সাঃ) বলেন, "জেনে রেখো জান্নাত হল তলোয়ারের ছায়াতলে।"

তলোয়ার যে ধরেনি, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে যে আসলো না তার আবার জান্নাত কিসের? কত জোর দিয়ে বলাহয়েছেঃ জেনে রাখো জান্নাত তো তলোয়ারের ছায়াতলে শেষ পর্যায়ে এসে কতগুলো হাদিস উল্লেখ না করলে উপরের কথাগুলো পরিষ্কার হয় না। শাহাদাতাতের প্রেরণা কত প্রবল হতে পারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ পূর্বক এখানে ৬টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছেঃ

(১) প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত রাবীয়াতুল কাযাব (রাঃ)। তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম (সাঃ) এর খেদমত করতাম দিনের বেলা, রাতে চলে যেতাম। একরাত্রি আমি দেখি রাসূল (সাঃ) কেবল "ছুবহানাল্লাহ ছুবহানাল্লাহ" পড়তে থাকলেন এবং বললেন যে, দেখ ছুবহানাল্লাহ পড়লে 'মিজান' পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শুনতে শুনতে আমার ঘুম ঘুম ভাবের সৃষ্টি হল। এ রকম প্রায়ই হতো। একদিন রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে রাবিয়া, আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও তাহলে তা আমি তোমাকে দিব। আমি বললাম আমি একটু চিন্তা করে নিই যে আমি কি চাইবো। আমি ভাবলাম দুনিয়াটাতো নষ্ট হয়ে যাবে, এটি চেয়ে কি লাভ? আমি বললাম আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসূল (সঃ) বললেন- এটাই তুমি চাইলে? বলে চুপ করে গেলেন এবংবললেন, কে তোমাকে এ কথা শিখালো? আমি বললাম কেউ আমাকে শিখায়নি। তবে আমি তো জানি যে দুনিয়া ধ্বংসশীল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং জানি যে আল্লাহর কাছে এমন একটি স্থান আছে যা আপনি চাইলেই আল্লাহর কাছ থেকে আপনি দিতে পারেন। এজন্য আমি ঠিক করেছি যে এটাই আমি পছন্দ করবো যে, আমাকে তুমি সাহায্য কর আমি

www.pathagar.com

বেশি বেশি সিজদা করে অর্থাৎ আমি যে তোমাকে দোয়া করব। তোমার জন্য এ দোয়া কবুলহবে বেশি বেশি সিজদা করলে বা নামায আদায় করলে।"

আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত- একদিন আমি রাসূল (সাঃ) এর কাছে বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যে আমাল করলে আমি বেহেশতে যাব, মানে বেহেশতেই তাদের ধান্ধা দুনিয়ার কোন ধান্ধা নেই।

(২) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওহুদের দিন যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর (জাবিরের পিতা) শহীদ হলেন তখন রাসূল (রাঃ) বললেন, "হে জাবির! তোমার বাবাকে আল্লাহ কি বললেন, তা কি তোমাকে আমি বলব? আল্লাহ তায়ালা কারো সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননা, কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন। তোমার বাবাকে আল্লাহ বললেন, হে আব্দুল্লাহ তুমি আমার কাছে কী চাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আবার জীবিত কর, আবার আমি নিহত হতে চাই। তখন আল্লাহ বললেন যে, এ নিয়ম তো নেই, আগেইএর ফয়সালা হয়ে গেছেন, কেউ একবার এখানে আসলে আর ফেরত যায় না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তাহলে অন্ততঃ এটা কর, আমি এই যে আকাঙ্খাটা করলাম এটি আমার পেছনে যে ভাইয়েরা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দাও।" এরপর এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ এ কথাটা পৌঁছে দিলেন। সূরা আল ইমরানের ১৬৯ ও ১৭০ নং আয়াত এ উদ্দেশ্যেই নাজিল হয়েছে।

(৩) আনাস (রাঃ) বলেন- আমার চাচা আনাস বিন নাজর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পয়লা যে যুদ্ধ করলেন, সে যুদ্ধে আমি তো হাজির ছিলাম না। কিন্তু এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা কোন যুদ্ধের সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবেন আমি কি করি। যখন ওহুদের দিন আসলো তখন মুসলমানদের কিছু লোক ভুল করলো এবং দুরবস্থা দেখে কিছু লোক ভেগে গেল, তখন তিনি আল্লাহকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, হে আল্লাহ! আমার ভাইয়েরা তোমার সাথে যে আচরণ করলো এজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর মুশরিকরা আমাদের সাথে এ আচরণ করলো, যে ব্যাপারে আমি দোষী নই। এরপর তিনি আগে বেড়ে গেলেন এবং সাঈদ বিন মায়াজ (রাঃ) এর সাথে তার দেখা হলো। বললেন, হে মায়াজ, জান্নাত, জান্নাত, আমি সাহায্যকারী রবের কছম করে বলছি আমি ওহুদের দিক থেকে জান্নাতের গন্ধ পাচ্ছি। অতঃপর সাদ বললেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইনি যুদ্ধে যা দেখালেন আমি তা পারতাম না। আনাস বললেন, আমার চাচার পায়ে আমি আশিটি যখম দেখলাম। প্রায় সবই তলোয়ারের, বল্লমের ও তীরের আঘাত। দেখলাম মুশরিকরা তাকে নিহত করেই ক্ষান্ত হয়নি, একেবারে বিকৃত করে ছেড়েছে। কেউ তাকে চিনতে পারেনি। একমাত্র তার বোন তার আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছে। আনাস বলেন- আমরা সকলেই ধারণা করি এ আয়াতটি এ জাতীয় ঘটনার পর নাজিল হয়েছে (সূরায়ে আহযাবের ২৩নং আয়াত)

www.pathagar.com

"মুমিনদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে। যারা আল্লাহ্‌র সাথে যে ওয়াদা করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক জীবনদান করেছে আর কতক অপেক্ষায় আছে। যারা তাদের আবরণ বদলায়নি।"

(৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কতক লোক রাসূলের (সাঃ) কাছে এসে বললোঃ হে রাসূল আমাদেরকে কোরআন-হাদীস শিখানো জন্য কিছু লোক দিন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আনসারদের মধ্য থেকে সত্তরজন লোক তাদের সাথে দিলেন, তাদেরকে কোরআন শিখানোর জন্য। তারা সব ক্বারী ছিলেন, এদের মধ্যে আমার মামা হারামও শরীক ছিলেন। তারা রাতের বেলা কোরআন শিখাতেন আর দিনের বেলা পানি উঠাতেন। পানি এনে মসজিদে রাখতেন। তারা দিনের বেলা আরো একটি কাজ করতেন। তারা লাকড়ি কুড়াতেন, বাজারে বিক্রি করে তদ্বারা আহলে সুফফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাবার কিনে আনতেন। এ লোকেরা ছিল বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদেরকে কতল করে ফেলল, সত্তর জনকেই কতল করল। যখন তাদেরকে কতল করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া করলেন- 'হে আল্লাহ্‌! আমাদের নবীর কাছে এ খবরটা তুমি পৌছিয়ে দাও, যে আমরা আমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, আমরা আমাদের রবের উপর খুশি হয়ে গেছি আর রবও আমাদের উপর খুশি হয়ে গেছে।' আমার মামা হারামের কাছে একজন লোক আসলো এবং পিছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল। বর্শা শরীরে বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার হয়ে গেলো। তিনি বললেন- 'কাবার রবের কসম আমি কামিয়াব হয়েছি।' অহীর মাধ্যমে এ খবর রাসূল (সাঃ) জানতে পেরে লোকদেরকে বললেন, "দেখো তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হয়ে গেছে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে এ দোয়া করল- হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে এ কথা পৌছায়ে দিন যে, আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি, আমাদের কুরবানীতে আমাদের রব খুশি হয়েছেন এবং আমরা আমাদের রবের পুরস্কার পেয়ে খুশি হয়েছি।"

(৫) আবি বকর ইবনে আবী মুসা আশারায়ী (রাঃ) বলেছেন- তারা দু'জনেই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন, রাসূল (সাঃ) বললেন- "নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়াতলে।" একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল যার কাপড়-চোপড় তেমন ছিল না। বললোঃ হে আবী মুসা! রাসূল (সাঃ) কি বললেন, শুনলেন তো। তিনি বললেন হ্যাঁ শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে সালাম দিয়ে যাচ্ছি, আর আসবো না। তারপর তার তলোয়ারের খাপটা ভেঙ্গে ফেলে দিলেন, এরপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চললেন, তাদেরকে মারতে থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি নিহত হলেন।

(৬) হযরত শাদ্দাদ বিন হাম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রাম্য আরব রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে ঈমান আনল এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে গেল। সে বলল, আমি বাড়ি-ঘর ছেড়ে আপনার সাথে মদীনায়ই থাকব।

এ লোক সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) কতক সাহাবাকে কিছু হেদায়েত দিলেন। যখনি জিহাদ

www.pathagar.com

হতো তাতে যে গনীমতের মাল মিলতো তা থেকে তিনি এ লোকের জন্য অংশ দিতেন এবং তা কোন এক সাহাবীর দায়িত্বে জমা রাখতেন যাতে সে লোক আসলে তাকে তা দেয়া হয়। একবার ঐ লোক উপস্থিত ছিল না। সে মুজাহিদদের উট চরাবার জন্য গিয়েছিল ফিরে আসার পর তাঁর হিস্যা তাকে দেয়া হলো।

সে বলল, এটা কী? লোকেরা বলল যে, রাসূল (সাঃ) আপনাকে দিয়েছেন। সে তার হিস্যা নিয়ে রাসূল(সাঃ) বললেন যে, "এটা তোমার হিস্যা যা আমি তোমাকে দিয়েছি।" সে বলল, আমি তো এ মালের জন্য আপনার সঙ্গী হইনি। আমি শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাব।

রাসূল (সাঃ) বললেন, "যদি তোমার নিয়ত সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ্ তোমার সাথে এরূপই করবেন।" কিছুদিন পর যখন লোকেরা জিহাদে গেল তখন এ লোকও তাদের সাথে শরীক হলো। যখন তার লাশ রাসূল (সাঃ) এর কাছে আনা হলো তখন দেখা গেল তার গলায় দুশমনের তীর লেগেছে।

রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই লোক যে শাহাদত কামনা করেছিল? সবাই বলরঃ 'হাঁ'। রাসূল (সাঃ) বললেন, "সে আল্লাহর নিকট খাঁটি আশা করেছিল বলে আল্লাহ্ তা পূরণ করলেন।"

তারপর রাসূল (সাঃ) নিজের জামা খুলে তা দিয়ে ঐ লোকের কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়ালেন এবং তার জন্য এ দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! এ লোক আপনার বান্দাহ যে আপনার পথেহিজরত করেছে এবং আপনার পথেই শাহাদাত পেল। এ বিষয়ে আমি তার সাক্ষী।"

এ সব হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়া মুমিনের জীবনে কিরূপ কাম্য হওয়া উচিত এর খাঁটি নমুনা এ হাদীসগুলোতে পাওয়া গেল। আল্লাহ্ পাক কার মওত কিভাবে কোথায় দেবেন এ কথা কারো জানার উপায় নেই। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কত লোক শহীদ হলো, কিন্তু বদর যুদ্ধে থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সকল যুদ্ধে শরীক থাকা সত্ত্বেও প্রথম চারজন সত্যপন্থী খলিফাগণ কোন যুদ্ধে শহীদ হননি। কিন্তু তাঁরা শাহাদাত কামনা করতেন বলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই তাঁরা শাহাদাত লাভ করেছিল। শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার খাঁটি কামনা যারা করবে তাদের জন্য রাসূল (সাঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ্ তাদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন। তাই আমাদের সবারই ইখলাসের সাথে আকাঙ্খা করা দরকার যেন আমাদের জীবনে শাহাদাত নসীব হয়। আল্লাহ্ আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা কবুল করুন। আমীন।

লেখক ঃ সাবেক আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

জিন্দাদিল শহীদদের কাতারে দায়িত্ববান রফিক ভাই

নুরুল ইসলাম বুলবুল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বড় আবেগ জড়িত একটি নাম। এই আবেগ শুধু আমার একার নয়, কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীরও নয় বরং এ আবেগ গোটা মুসলিম মিল্লাতের। এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপমহাদেশের বিখ্যাত মুসলিম মনীষী স্যার সৈয়দ আহমেদ, স্যার ওয়ালী উল্লাহ, মাওঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সহ উপমহাদেশের তৌহিদী জনতা দীর্ঘ রক্তঝরা আন্দোলন করেছেন। তাদের স্বপ্নের সেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি ঠিকই কিন্তু আজকের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আন্দোলনেরই ফসল। পরবর্তী পর্যায়ে মাওলানা মওদুদী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া প্রস্তাব যোগ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-এ বিশ্ববিদ্যালয় এমন সুযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ জ্ঞান বিশারদ তৈরী করবে যারা আধুনিক যুগে খাঁটি ইসলামী আদর্শ মোতাবেক দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। উপমহাদেশের তৌহিদী জনতার স্বপ্নের যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আন্দোলনের অপরাধে! মানুষ হত্যা করা হয় কিংবা পঙ্গু করা হয় এ অতি বিস্ময়ের, অসম্ভব বেদনার।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে আমার সম্পৃক্ততা অনেক দিনের। শহীদি ঈদগাহ চাপাইনবাবগঞ্জ, রক্তাক্ত মতিহার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কালেমার শ্লোগানকে উচ্চকিত করতে আমার সামান্য অংশগ্রহণ এবং রক্ত পিচ্ছিল এ পথের একজন যাত্রী হিসেবে অনেক

www.pathagar.com

ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি; যা কল্পনার চাইতেও রোমাঞ্চকর বেদনায়ক ও মর্মস্পর্শী। এর মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে ২০০১ সালের ৮ জুন শহীদ রফিকুল ইসলাম ভায়ের শাহাদাত। কেন্দ্রীয় সংগঠনের দায়িত্ব পালন কালে যতবারই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গিয়েছি ততবারই রফিক ভাইয়ের আন্তরিক ব্যবহার, সংগঠনের কাজের প্রতি তার পেরেশানী, সত্যনিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এ ধারণা শুধু আমার একার নয়, এ ধারণা সবার। আন্দোলনের প্রতি তার আন্তরিকতা ও ভালবাসা এমন ছিল যে পৃথিবীর কোন সম্পর্ক তাকে হকের পথ থেকে টলাতে পারেনি। দীর্ঘ আওয়ামী দুঃশাসনে তার ত্যাগ ও কুরবানীর কথা এখনো প্রতিটি জনশক্তির মুখে মুখে। ৮ জুন ২০০২ শহীদের ১ম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শহীদের বাড়ী যাচ্ছিলাম, অতীতের অনেক স্মৃতি চোখের সামনে ভীড় জমাচ্ছিল। সন্তানহারা আব্বা-আম্মার সামনে হাজির হবার পর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নিজেকে কিভাবে সংযত করব তাই ভাবছিলাম। ভাবনা শেষ না হতেই আমরা রফিক ভায়ের বাড়ীতে পৌছলাম, শহীদের পিতা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। একজন সন্তানহারা পিতার এই দৃঢ়চেতা মনোভাব নিঃসন্দেহে মনে রাখার মতো। শোকে পাথর শহীদ রফিকুল ইসলামের মাতা। সন্তান হারা মায়ের বেদনা ও নিরব চাহুনী কত মর্মস্পর্শী হতে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সেদিন আব্বা আম্মার সাথে কথা বলার জন্য বাড়ীর ভিতরে গিয়ে চৌকিতে বসলাম। সাথে আব্বা, ভাই এবং ঘরের ভিতরে জানালার পাশে দাড়ানো বোনেরা। কী শান্তনা দেব ভাষা খুজে পাচ্ছিলাম না। শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পিতা মাতার যে দৃঢ় মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখলাম; তাতে আশ্বস্ত হলাম। আল্লাহ এ ধরনের পিতা মাতাকেই শহীদের পিতা মাতা হবার সৌভাগ্য দিয়ে থাকেন।

শহীদ রফিকুল ইসলামের শাহাদাতের খবর আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরে থাকা অবস্থায় শুনতে পাই। আমাকে মোবাইলে জানান হল যে, রফিকুল ইসলাম ভাই শাহাদাত বরন করেছেন (ইন্না....উন)। তখন আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি; আমি বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম কোন রফিকুল ইসলাম; কি দায়িত্ব? আমি ভালভাবে জানতাম রফিকুল ইসলাম ই. বি. শাখার ক্রীড়া সম্পাদক। শহীদ রফিকুল ইসলাম স্বল্পভাষী সাহসী দৃঢ়চেতা, সদা তৎপর, নির্ভীক ও নিরব কর্মী ছিলেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকাকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য কিভাবে শত্রু মুক্ত করা যায়, কিভাবে শিবিরের অবস্থান শক্তিশালী করা যায় এটা ছিল তার প্রতিদিনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে রফিক ভাই নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তার সহজ সরল আন্তরিক আচরন, সদা তৎপর সর্বত্র বিচরন, সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তিনি সর্বস্তরের ছাত্র শিক্ষকের কাছে প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৯৮ সালের ২৯ শে অক্টোবর ই.বির তৎকালীন সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম ভাই গ্রেফতার হয়ে যান। একদিন পরেই ৩১শে অক্টোবর ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের

www.pathagar.com

বুলেটের আঘাতে শাহাদাতবরন করেন শিবির নেতা আল মামুন ও মহসিন কবীর। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি গ্রেফতার, আবার ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, সেই সাথে ২জন কর্মীর শাহাদাত ও নাজিম, এমদাদুল্লাহ, সাইফুল, রাসেল ভাই সহ ১৫/২০ জন শিবির নেতা কর্মীর মারাত্মক ভাবে আহত হবার ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠে। শিবির খুনীদের বিচারের দাবীতে ৭ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের Main Gate চত্বরে ছাত্র গণ-জমায়েতের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকদিন আমাকে অবস্থান করতে হয়েছিল। শেখপাড়ার জনি মেসে তার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল আমার। ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব আসার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল নির্বাচনের জন্য জমিয়তে তালাবা পাকিস্তানের তৎকালীন সভাপতি মোস্তাক ভাই, সেক্রেটারী জেনারেল নজরুল ইসলাম সহ ক্যাপাসে যাই। জিয়া হলের লাইব্রেরী কক্ষে অনুষ্ঠিত সদস্য বৈঠকে গেলে হল গেটে শহীদ রফিক ভাই হাস্যোজ্জ্বল ক্ষেত্রে আমাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। কে জানে তিনি আমাদের মাঝ থেকে চলে যাবেন আল্লাহর সান্নিধ্যে। তা যদি জানতাম তাহলে এ জান্নাতের অতিথিকে আমি সমস্ত ভালবাসা দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতাম। দায়িত্বপালনের সুবাদে এই প্রিয় রক্ত মাখা ক্যাম্পাসে অনেক বার যেতে হয়েছে আমাকে। সদস্য ভাইদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগও করতে হয়েছে। রফিক ভাইকে দেখতাম সাদ্দাম হলে চুপচাপ বসে থাকতে; যতক্ষণ থাকতাম অধিকাংশ সময়েই আশে পাশেই থাকতেন। জিয়া হলে মাহমুদ ও রফিক ভাই একসাথে থাকতেন। মাহমুদ আমাকে একদিন দুপুরে দাওয়াত করলো। বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি সেক্রেটারী, সাংগঠনিক সম্পাদক, জিয়া হল সভাপতি এবং রফিক ভাই সহ সেখানে গেলাম। মাহমুদের আরো কয়েকজন বন্ধুও ছিল। দেখলাম এবং অনুধাবন করলাম নিরব নির্ভীক শিবির নেতা রফিক ভাই এর প্রতি তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কতটুকু তা আমার নজর এড়ায়নি। শহীদ রফিক ভাই এর সাথে একাধিকবার ব্যক্তিগত Contact করেছি আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রীক অবস্থা নিয়ে তিনি অনেকগুলো বিষয় আমার কাছে তুলে ধরলেন। সবগুলো বিষয়ই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক পরিবেশের জন্য খুবই উপযোগী।

ফলে আমার পদক্ষেপ নিতে সহজ হয়। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ধারাবাহিকতায় বিশেষ কারণে রফিক ভাইকে প্রয়োজন হয়। জিয়া হল থেকে Contact এর জন্য তাকে ডেকে পাঠানো হলো। সেদিন কন্টাক্টে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় তার কাছ থেকে জানতে হয়েছিল। তিনি কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই অকপটেই তা স্বীকার করেছিলেন। তা থেকেই তার সত্যবাদিতা, সাহসীকতার পরিচয় মেলে।

শহীদ রফিক ভাই এর সাথে দলমত নির্বিশেষে সবার সম্পর্ক ছিল চমৎকার। ক্যাম্পাসে তার অনুপস্থিতি যেন একটি বটবৃক্ষের অনুপস্থিতি, যেন বা পুর্নিমারাতে হঠাৎ অমাবস্যার

www.pathagar.com

আগমন। যেন সুর্য্যের আলোকে হারিয়ে দিয়ে মেঘমালার আক্রমনে অন্ধকার পৃথিবীর প্রত্যাবর্তন। শিবিরের কোন জনশক্তিই এটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। মদনডাঙ্গায় যেদিন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তার উপর হামলা করে সেদিন তিনি 'কামাল মেসে থেকে বের হবার সময় সন্ত্রাসীরা তাকে ডাক দেয়; সশস্ত্র অবস্থায় থাকার পরও তিনি তাঁদেরকে বিশ্বাস করেন; তাদের ডাকে সাড়া দিলেন।" শিবির মেসে সন্ত্রাসীদের হামলা করার Information পাওয়ার পরও তিনি ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বশীল হিসেবে সবাইকে বের করে দেয়ার পর নিজে বের হন। পার্থিব মায়া ও জীবনকে উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর জিম্মাদারীত্বে নিজেকে সপে দিয়ে মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও যে দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

রফিক ভায়ের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। উপলব্ধি করলাম জীবিত রফিক ভায়ের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলোর চেয়ে শহীদ রফিকের কবরের পাশে দাড়ানো মুহূর্তগুলো অনেক-অনেক বেশী প্রেরণার। অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল মনে বয়ে যাচ্ছিল এক ইনকিলাবী তুফান। হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল "শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না।

সময়ের টানে চলে আসার সময় শহীদের নির্বাক পিতা-মাতার কাছ থেকে বাক রুদ্ধ কণ্ঠে বিদায় নিয়ে বললাম আপনার ছেলে মরেনি, সে শহীদ, আপনারা এক রফিক হারিয়েছেন আমরা হাজার, লক্ষ ছেলে আপনার রফিক।

শহীদ রফিকুল ইসলাম সহ একশত আঠার জন শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের সবুজ ভূ-খন্ড, শত শত আহত পঙ্গু ভাই তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করে জীবন্ত শহীদ হিসাবে মূর্তমান আমাদের সামনে। সন্তানহারা মা-বাবার আর্তনাদ কাঁপিয়ে তুলছে আল্লাহর আরশ। ভাই হারা বোনদের ফরিয়াদে, সতীর্থ হারানোর বেদনায় শোকাহত বন্ধুর হাহাকার আল্লাহর জমীনকে আন্দোলিত করছে। তাই প্রতিক্ষায় থাকি প্রতিদিন এমন একটি দিনের জন্য যে দিন শাহাদাতের এই সিঁড়ি বেয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর রাজ। শহীদের স্বপ্ন হবে বাস্তবায়িত। প্রিয়জন হারানোর ব্যাথা ভুলে হেসে উঠবে প্রতিটি শহীদি জনপদ। শহীদ রফিকের রক্ত আমাদের কোরানের রাজ কায়েমের চেতনাকে আরো উজ্জীবিত করুক। আমীন।

লেখক ঃ কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন ২০০১-এ
শিবিরের ১১৪তম শহীদ
শহীদ রফিকুল ইসলামের গর্বিত পিতা
মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুর রহমান-
এর উদ্বোধনী ভাষণ

বাস্তবতা সাক্ষ্য দিচ্ছে ইসলামী ছাত্রশিবির একবিংশ শতাব্দীর মজলুম মানবতার বন্ধু

মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুর রহমান

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ১১৬ জন শহীদের রক্তে ভেজা কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের এ বিশাল সদস্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কিছু বলার সুযোগ পাওয়ায় আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এ সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরও আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই একজন শহীদের পিতা হিসেবে তাদের সর্বোচ্চ সম্মেলনের উদ্বোধক করে আমাকে সম্মানিত করার জন্য।

প্রিয় উপস্থিতি,

তারুণ্যের এ সমাবেশে এসে আমি অভিভূত। দেশের ক্রমবর্ধমান তারুণ্যের অবক্ষয়ের মাঝেও সমাজ গঠনের জন্য একদল টগবগে তরুণ আজ যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। ক্ষুধা, দারিদ্র, সন্ত্রাস আর দূর্নীতির আকণ্ঠে নিমজ্জিত জাতির সামনে ছাত্রশিবির আজ এক উজ্জ্বল আলোর মশাল।

যেখানে সমাজও দিক নির্দেশনা দিতে পারছে না। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে ছাত্ররা জাতির কলংকময় অধ্যায় রচনা করছে। দখল-বেদখল আর অপরাজনীতির সর্বনাশা ছোবলে জড়িয়ে পড়ছে কোমলমতি জাতির ভবিষ্যত কর্ণধারগণ। সেক্ষেত্রে সকল বাঁধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র ডিঙ্গিয়ে ত্যাগ ও কুরবানীর রক্তসাগর পেরিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির সার্বজনীন শ্রেষ্ঠ আদর্শ ইসলামের সমাজ প্রতিষ্ঠার যে আদর্শিক জোয়ার সৃষ্টি করেছে তা হতাশাগ্রস্থ

www.pathagar.com

বাংলার মানুষকে নতুন করে পথ চলার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। দেশের বিবেকবান সকল অভিভাবকদের মত তাই ছাত্রশিবিরকে আমি অন্তরের সকল ভালবাসা দিয়ে দোয়া করি।

সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী,

স্বাধীন বাংলাদেশের ৩০টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। অনেক রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ আজ গুড়িয়ে যেতে বসেছে। দেশের জন্য যেন কারো দরদ নেই। ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা দখল আর ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের আখের গোছানোই আজ রাজনীতিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একুশ শতকের প্রারম্ভে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ মনে হয় দেশবাসীর উপলব্ধি কিছুটা হলেও শানিত হয়েছে আর তারই ফলশ্রুতিতে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, দলীয়করণ ও সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রজনতার ঐক্যবদ্ধ রায়ে গত ১ অক্টোবর একটি জোটবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বুকভরা আশা নিয়ে আমরা আবার তাকিয়ে আছি বর্তমান সরকারের দিকে। জানি না আমাদের স্বপ্ন বাস্তবতার সংস্পর্শ পাবে কিনা। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া কুকীর্তি আর ধ্বংসস্তুপ থেকে বেরিয়ে এসে সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ আবার এগিয়ে যেতে পারবে কিনা? বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের আশা ও উদ্বেগের কথা আজকের এই মহা সম্মেলন থেকে জানিয়ে দেয়া উচিত।

আমার সন্তান সম শিবিরের প্রিয় সদস্যরা,

আজ যদি আমার স্নেহের সন্তান রফিক বেঁচে থাকত, তাহলে সেও তোমাদের মত এ সম্মেলনে অংশ নিত। কিন্তু মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে সে আজ মহামহিম প্রভুর দরবারে তোমাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ শুধু আমার একার গৌরব নয়, এ গৌরব সর্বোতভাবে ইসলামী ছাত্রশিবির তথা তোমাদেরও। এক সন্তান হারিয়ে আমি আজ শত সহস্র সন্তান পেয়েছি। রফিক এবং তার সহযাত্রী ১১৬জন শহীদ যে কাফেলা উচ্চকিত করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে। আমাদের অসংখ্য সন্তানেরা পঙ্গুত্বের অসহনীয় কষ্টকে আজ চির জীবনের জন্য হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছে। কালেমার আওয়াজকে বিজয়ের বন্দরে উপনীত করার দায়িত্ব তোমাদের। এই জন্য নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও চরিত্রের গুণ আরো বাড়াতে হবে। তোমাদের নিরলস পরিশ্রমে আদর্শকে আরো উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। তবেই আহত, পঙ্গু ও শহীদদের জীবনদান স্বার্থক হবে।

সবশেষে আজকের এই প্রাণোচ্ছল সম্মেলনে উপস্থিত সুধীমন্ডলী, সাংবাদিক বৃন্দ, শহীদ পরিবারের সদস্যগণ, আহত সন্তানেরা এবং শহীদি কাফেলার প্রিয় সদস্যবৃন্দ সকলকে আমার অন্তরের অন্তস্থল হতে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আজকের সম্মেলন হোক তোমাদের সামনে এগিয়ে চলার দৃঢ় অঙ্গীকার ইসলামী ছাত্রশিবিরই আগামী দিনের ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে আমি ২০০১-২০০২ সেশনের সদস্য সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

www.pathagar.com

শহীদ রফিক হাজারও মানুষের হৃদয়ে

ইমাজ উদ্দীন মন্ডল

যুগে যুগে বেশ কিছু ক্ষনজন্মা মানুষ এ ধরনীতে এসেছে যাদের জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে অনেক শতআয়ু মানুষের চেয়ে তাদের সুকীর্তি সহজেই চোখে পড়ে। কেন যেন তাদের কাজগুলো একটু আলাদাভাবে চেনা যায়। অল্প সময়েই কিভাবে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায় তা যেন জন্মের পূর্বেই শিখে আসে। আল্লাহ যেন হাতে ধরে তাদের এ গুন গুলো দিয়ে পাঠিয়েছেন। শহীদ হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, শহীদ আব্দুল মালেক, আসলাম হুসাইন, মুন্সী আব্দুল হালিম, মোস্তাফিজ, মহসিন কবিরসহ শত শত শহীদের জীবন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদের পথ ধরে মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিলেন শহীদ রফিকুল ইসলাম।

২০০১ সাল, জুন মাসের ৮ তারিখ যশোর সফরে ছিলাম। সাথে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হেলাল উদ্দিন ভাই এবং রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি শাহাদাত হুসাইন ভাই। সফরের কাজ তখনও শেষ হয়নি। বিকাল বেলা কেন্দ্রীয় সভাপতি মোবাইলে জানালেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মদনডাঙ্গায় আমাদের একটি মেসে হামলা করা হয়েছে। রফিকুল ইসলাম ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি তখনই ঝিনেদাতে যাওয়ার জন্য বললেন। সন্ধ্যার একটু পূর্বে ঝিনেদা পৌঁছলাম। ঝিনেদা শহর তখন মিছিল শ্লোগানে প্রকম্পিত। আমি মিছিলে শরীক হলাম।

রাত্রে শহীদের কফিন আল-হেরা ইনস্টিটিউটে রাখা হলো। জরুরী কিছু কাজে

www.pathagar.com

ব্যস্ত থাকার কারণে রফিক ভাইয়ের লাশ দেখার সুযোগ তখনও হয়নি। কফিনের কাছে গেলাম। অনেকে কান্নাকাটি করছে। নিজেকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কাঁদা যাবে না। কাঁদলে অন্যদের কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। এরপরও পারিনি। কখন যে দু'চোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে গেছে টের পাইনি। কি স্নিগ্ধ, কোমল, শান্ত মুখ। মনে হচ্ছে কিছু বলবে। কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে না। সেখানে আর থাকতে পারলাম না। সবার অলক্ষে বেরিয়ে আসলাম। রাত্রে ভালঘুম হলো না। বারবার রফিক ভাইকে স্বপ্ন দেখছি আর জেগে উঠছি। শেষ রাত্রেও আর ঘুমাতে পারলাম না। আমার সাথে রফিক ভাইয়ের স্মৃতি এ্যালবামের পাতা উল্টাতে লাগলাম। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কলা ভবনের সামনে রফিক ভাইয়ের সাথে দেখা। দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ইমাজ ভাই অনেক দিন দেখিনা, কেমন আছেন.....। স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। আজানের ধ্বনি কানে এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল।

সকাল আটটায় জানাযা ঝিনেদা অগ্রণী চত্বরে। শহীদের কফিন নিয়ে যখন অগ্রণী চত্বরে পৌঁছালাম চারিদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ অগ্রণী চত্বরে আসতে শুরু করলো। অল্প সময়ের মধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সবার আশা তাদের প্রিয় মানুষটিকে একনজর দেখবে, তার জন্য দোয়া করবে। শেখপাড়া, মদনডাঙ্গা, গাড়াগঞ্জ ও ঝিনাইদহ শহরের প্রচুর মহিলা এসেছে শহীদ রফিক ভাইকে দেখার জন্য। সবাই তাদের প্রিয় সন্তান হারালে যেভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রফিক ভাইয়ের শাহাদাতে সবার চোখে মুখে সে কাতরতা লক্ষ্য করেছি। জানাযা পূর্ব সমাবেশে অনেকেই বক্তব্য দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বক্তব্য দিতে গিয়ে অশ্রু ঝরালেন। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন শিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল নজরুল ইসলাম ভাই। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও রফিক ভাইয়ের সহযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর আবেগময়ী বক্তব্যে কেউই নিজেকে সম্বোরণ করতে পারেনি। সবার চোখ ছল ছল।

জানাযা শেষ হলো। সবাই লাইন ধরে রফিক ভাইকে শেষবারের মত দেখে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রফিক ভাইয়ের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ইমাজ ভাই আমি রফিকের আদর্শের কেউ নই। তাকে কেন যেন ভাল লাগতো সে নিয়মিত আমার বাসায় যেত। রফিক নেই বিশ্বাসই করতেপারছি না। জানাযা ও সবার দেখা শেষ হলে কফিন নিয়ে সাতক্ষীরার দিকে রওনা হলাম। পথে আরো তিনটি জানাযা হলো। রফিক ভাই যশোরের বাগআঁচড়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছেন। সেখানে মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ জানাযার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সেখানে একটি জানাযার পর আবার সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন সাতক্ষীরা জামায়াত অফিসে পৌঁছলাম, কয়েকশত মহিলা রফিক ভাইকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কাউকেই রফিক ভাইকে দেখানো গেল না। কারণ কফিন বরফ, চা পাতি দিয়ে প্যাক করা। সবাই অশ্রু সজল চোখে শুধু কফিন দেখেই বিদায় নিল।

www.pathagar.com

সাতক্ষীরা রাজ্জাক পার্কে জানাযার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেও প্রচুর লোক রাজ্জাক পার্কে সমবেত। জানাযা শেষে আবার রওনা হলাম আশাশুনির দিকে। আশাশুনি থানা শহরে আরো একটি জানাযা শেষে শহীদের গ্রামের বাড়ীর পথে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। কিছু দূর পিচ এর পর ইট বিছানো রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে শতশত মানুষ দাঁড়িয়ে। সবার উৎসুক দৃষ্টি। কোন গাড়ীতে তাদের প্রিয় মানুষটির কফিন। গাড়ী যতই সামনের দিকে এগুচ্ছে মানুষের ভীড় ততই বাড়ছে। ভীড় ঠেলে কফিন বহর শহীদের বাড়ীর কাছাকাছি গেল। কিছদূর কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টি হওয়ার কারণে রাস্তায় প্রচুর কাঁদা। তারপরও এলাকার লোকজন কফিন বাহী গাড়িটি ঠেলে বাড়ীতে পৌঁছে দিল। আমরা হেটেই গেলাম। শহীদের বাড়ীতে পৌঁছে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এতো মানুষ। বাড়ীর ভেতরে-বাইরে, সামনের মাঠ, পুকুরের ধার কোথাও তিল ধরনের ঠাঁই নেই। কোথা থেকে আসলো এই হাজার হাজার মানুষ। গ্রামতো ছোট। গ্রামের চারিদিকে ফাঁকা চিংড়ী ঘের। দূরে আরেকটি গ্রাম। বুঝলাম রফিক ভাই এলাকায় খুবই পরিচিত ও প্রিয়। যার কারণে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে বৃষ্টি কাঁদা মাড়িয়ে পায়ে হেটে তাদের ভালবাসার মানুষটিকে দেখতে এসেছে। বাড়ির সামনের মাঠটিতে রফিক ভাইয়ের সর্বশেষও ৫ম জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। জানাযা পূর্ব সমাবেশে শহীদের পিতা এক আবেগময়ী ভাষণ দিলেন। তিনি মুষড়ে পড়েছেন এমন মনে হলো না। বরং তিনি বললেন, "আমার কোন সন্দেহ নেই যে, রফিক শহীদ হয়েছে। আমার গর্ব আমার ছেলে একজন শহীদ, আর আমি শহীদের পিতা।" শহীদের গর্ভধারিনী মা, ভাই, বোন সবার সাথে কথা বলেছি। অশ্রু সজল চোখে শহীদের মা বললেন, আমার রফিক নেই, কে আমায় দুর থেকে মা মা বলে ডাকবে। আমরা বললাম 'মা' আমরা আপনাকে মা বলে ডাকবো। তিনি বললেন, হ্যাঁ এখন তোমরাই আমার রফিক। আল্লাহ পছন্দ করে রফিককে নিয়ে গেছে। আমার কি করার আছে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ঝিনেদার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রায় ১০ দিন ঝিনেদাতে ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় কয়েকটি ছাত্র সুধী সমাবেশে যোগ দিয়েছি। সর্বশেষ সমাবেশ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে। বিশাল মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এই সমাবেশে যাওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সভাপতির। ঢাকাতে জরুরী কাজ থাকায় তিনি আমাকে পাঠালেন। ছাত্র সুধী সমাবেশে যখন রফিক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা বলছিলাম তখন ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কেউ কেউ নিরবে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন। সেদিনের সে সমাবেশে সবাইকে কাঁদতে দেখে নিজেকে খুব হতভাগ্য মনে হয়েছিল। কত মানুষ শহীদ রফিকের জন্য কাঁদে। হাজার হাজার মানুষ তার জন্য দোয়া করে। কত সৌভাগ্য শহীদ রফিকের। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস শহীদ রফিক পায়চারী করছে জান্নাতের বাগিচায়।

লেখক ঃ সাবেক কেন্দ্রীয় দাওয়াতী কার্যক্রম বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরি

www.pathagar.com

শহীদ রফিক ঃ কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্ন

মোঃ রাইসুল ইসলাম রাসেল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাছে বড় আবেগ আর অনুভূতি মেশানো একটি নাম, আমার জীবনের ছয়টি সংগ্রাম মুখর বছর কাটিয়েছি এই ময়দানে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িয়ে আমার রক্ত, আমার ভালবাসা, প্রিয়জন হারানোর বেদনা। যা মনে উঠলে এখনো নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারিনা। কোনদিনও ভাবিনি রফিক ভাই সম্পর্কে স্মরনিকায় লিখতে হবে। অনেক চেষ্টা করেও লিখতে পারিনি শেষে রানার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পারায় এই কলম ধরা।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির কিছুদিন পর থেকেই রফিক ভায়ের সাথে ঘনিষ্টতা বাড়ে তারপর সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে আমার কুষ্টিয়ার অবস্থান কালেও সে সম্পর্কে ভাটা পড়েনি। রফিক ভাইকে আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম '৯৬ এর ২৬শে সেপ্টেম্বরে আমিন ভায়ের শাহাদাতের ঘটনার পর। আওয়ামী দুঃশাসনের ফলে পিষ্ট ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সবাই। তখন সেই রক্ত পিচ্ছিল পথে রফিক ভাইকে দেখেছি অত্যন্ত নির্ভীক এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ময়দান মোকাবেলায়। জীবনে কোনদিন তাকে দেখিনি দ্বীনের কাজে কারো পিছু থাকতে। ক্রাইসিস ময়দানে নিজেই আগে ভূমিকা রাখতে চাইতেন সারাক্ষন ক্যাম্পাসে কাটিয়ে আবার সারারাত দ্বীনের পাহারাতে রাত কাটাতেন। কোনদিন দেখিনি তাকে রাত্রে ঘুম ভাঙানোর জন্য দুটি ডাক দিতে। রফিক ভায়ের শাহাদাতের পর আমার চারপাশের দুনিয়া এলোমেলো হয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মাথার উপর থেকে সরে গেলো বিরাট একটা ছায়া নিজেকে শান্তনা দিচ্ছিলাম। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, কারণ জনশক্তির যে আহাজারি আমি শক্ত না থাকলে জনশক্তি আরো ভেঙ্গে পড়বে। নিজেকে শান্তনা দিতে পারলাম না কিছুতেই। শহীদের সাথীরা দীপ্ত কণ্ঠে শপথ নিয়েছিল। রফিক ভাইয়ের খুনীদের ই.বি তে ঠাই নাই। তাদের জন্য ই.বি হারাম। আজও ক্যাম্পাসের খবর শুনি খুনীদের খুজেও পাওয়া যায় না। তখন মনে মনে বলি রফিক ভাই যারা তোমাকে হত্যা করে ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রশিবিরকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল তারাই আজ বিতাড়িত।

কফিনের সাথে শহীদের বাড়ী থেকে আসার সময় হৃদয় কিছুতেই সাড়া দিচ্ছিল না। তারপরও আসতে হয় তাই আসা। দীর্ঘ দিনের এক সাথে পথ চলার সাথী, একই স্বপ্নে লালন করা সাথীকে রেখে আসলাম খাচায় ঘেরা, উচু ঢিবি মাটির নীচে।

রফিক ভাই শহীদ হয়ে চলে গেছেন ওপারে রেখে গেছেন দ্বীনের কঠিন জিম্মাদারী। তা পালন করার দায়িত্ব এখন শহীদ রফিকের সাথীদের উত্তরাধিকারীদের। ই.বির ১৭৫ একরের প্রতিটি ইঞ্চি ছাত্রশিবিরের রক্তে কেনা, সে রক্ত মামুন, মহসিন, আমিন, রফিকের। অসংখ্য পঙ্গু ও আহত ভাই জীবন্ত শহীদ আমাদের সামনে। তাই বজ্র কঠোর শপথ আমাদের যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য শহীদ রফিক জীবন দিয়েছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ক্লান্তি নেই। শহীদ রফিকের রক্তের বিনিময়ে এ দেশে কোরআনের রাজ কায়েম হবেই। এই প্রত্যয়ে জাগরিত হই প্রতি দিন।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ই.বি ক্যাম্পাসের অতন্দ্র প্রহরী শহীদ রফিক

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকেই অবিসংবাদিত। আলোর পশ্চাতে আঁধারের আগমনের মতো সত্যের পথে মিথ্যার লেলিহান থাবা সর্বত্র বিরাজিত। আর সেই ঐহিক সত্যকে উচ্চকিত করবার নিমিত্তে জীবনবাজী রেখে লড়ে গেছেন আল্লাহর একান্ত প্রিয় সাহসী সিপাহসালারা। অপর দিকে মিথ্যার পূজারী, তাগুতের সঙ্গীরা উঠে পড়ে লেগে আছে শুভ সুন্দর শাশ্বত সত্যকে টুটি চেপে মারার জন্য। ফুৎকারেই নিবাসিত করতে চায় সেই মহান ঐহিক আলো। আল্লাহ্‌র চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় মিথ্যার সেই অপশক্তি বরাবরই বিপর্যস্ত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়, দুনিয়ার বুকে। যা আজও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের সামনে।

আল্লাহ্‌র চ্যালেঞ্জের আলোকেই যুগে-যুগে বাতিল পরাভূত হয়েছে, পরাভূত হয়েছে ফেরাউন, নমরুদ, আবু জেহেলরা। তাদের উত্তরসূরিদের আজকের এই হিংস্রনখর জুলুম নির্যাতনের দ্বার ভেঙে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনানীরা রক্তের বিনিময়ে হলেও এগিয়ে যাবে। যাবেই যাবে।

নবী-রাসূলগণের পথ ধরে যেভাবে এগিয়ে গেছে আম্মার, খাব্বাব, সুমাইয়া সহ অসংখ্য নির্যাতিত, নিপীড়িত বনী আদম; রচিত হয়েছে রক্তে রঞ্জিত এক করুণ ট্রাজেডি এরই ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলা কাফেলার নাম ইসলামী ছাত্রশিবির। শতশত আহত-পঙ্গু শতাধিক শহীদের এই মিছিলে শরীক হলেন আমাদের প্রিয় ভাই

www.pathagar.com

রফিকুল ইসলাম। মহান আল্লাহ্‌র সাহসী সৈনিক শহীদ রফিক ফুল হয়ে ফুটে রইলেন মহান প্রভুর প্রিয় বাগান জান্নাতুল ফিরদাউসে।

চলে গেলেন প্রিয় মঞ্জিলে; রেখে গেলেন সর্বদা অনুপ্রেরণার কিছু চিরভাস্বর স্মৃতি।

৬ই জুন ২০০১ ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি রাসেল ভাই গিয়েছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাংগঠনিক সফরে। আমি এবং প্রশিক্ষন সম্পাদক নুরুল ইসলাম ভাই গিয়েছিলাম শহীদ আমিন ভাইয়ের স্মৃতি বিজড়িত বিত্তিপাড়া শাখায় সীরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায়। সভা শেষে ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মেইন গেটে এসেই দেখি পুলিশের জটলা, চলে আসলাম শহীদ মহসীন কবীরের স্মৃতি বিজড়িত সাদ্দাম হল গেইটে। হলের সামনে এসে দেখলাম সদস্য ভাইয়েরা উদ্বিগ্ন, আমি আসতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তারা, জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? চোখে মুখে তাদের আবেগ উৎকণ্ঠা। রফিক ভাই হাসতে হাসতে সামনে এসে হাজির। বললেন, আপনার জন্য খুব টেনশনে ছিলাম। আমি পুনরায় আবেগ আপ্লুত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেন? কি হয়েছে? রফিক ভাই খুলে বললেন সব ঘটনা। সন্ধ্যার পূর্ব মূহুর্তে জাসদ ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডার সাদ্দাম হল গেইটে বেপরোয়া সিগারেট টানছিল। তার দুই দিন আগে ক্যাম্পাসে তারা ধর ধর শিবির ধর, ধরে ধরে জবাই কর এই শ্লোগান দিয়ে মিছিল করছিল। সুতরাং হল গেটে সিগারেট টানার বিষয়টি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। কয়েকজন শিবির কর্মী তাদেরকে হল গেট থেকে অন্যত্র সিগারেট টানতে বলায় তারা শিবির কর্মীদের প্রতি চড়াও হয়। হল থেকে সাধারণ ছাত্ররা এগিয়ে আসলে তারা পালিয়ে যায়। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ পরদিন ক্যাম্পাস ও হল বন্ধ করে দিলে আমরা সবাই ঝিনাইদহে চলে গেলাম। আল হেরা মসজিদে অবস্থান করলাম। ঐ দিন রাতে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার নিমিত্তে কয়েক দফা বৈঠক হয়। সিদ্ধান্ত হল পরদিন সকালে শিবিরের ইবি সভাপতিসহ চারজন ভাই মদনডাঙ্গায় আসবেন। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে সবাই গভীর ঘুমে নিমগ্ন। সুবহি সাদিকের সময় চারদিকে যখন মুয়াযযিনের আজানের ধ্বনি কানে ভেসে আসছিল ঠিক সেই মুহূর্তে রফিক ভাইকে আস্তে ডেকে বললাম আপনার নেতৃত্বে বাদ ফজর মদনডাঙ্গায় (বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্ববর্তী গ্রাম) চারজন ভাইয়ের যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। আমার সামনে এটাই তাঁর জীবনের শেষ হাসি। নামাজ শেষে রফিক ভাইসহ চারজন দায়িত্বশীল মদনডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আমি দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ঝিনেদা অবস্থান করছিলাম। অবশেষে আমারও মদনডাঙ্গা যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো। ৩টার দিকে মোটর সাইকেল নিয়ে রওনা হলাম। হঠাৎ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ইজহার ভাইয়ের বড় ছেলে ফারুক ইকবাল আমার সামনে এসে হাজির। কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো মোস্তাফিজ ভাই মদনডাঙ্গা যাওয়ার পরিবেশ নেই। রফিক ভাই মারাত্মক আহত হাসপাতালে চলেন। ছুটে গেলাম হাসপাতালে। জনশক্তির

www.pathagar.com

উপচে পড়া ভীড়কে উপেক্ষা করে রফিক ভাইয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম রফিক ভাই হাসপাতালের বেডে। (প্রচুর রক্ত ক্ষরণের কারণে) শরীরে রক্ত দেয়া হচ্ছে হঠাৎ রক্তের স্যালাইন বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার শরীর থেকে সূঁচ খুলে ফেললেন। আহসানুল কবির মুক্ত ভাই (সাবেক ই.বি সেক্রেঃ) এবং মোস্তাফিজ ভাইকে (সাবেক ঝিনেদা জেলা সভাপতি) আড়ালে ডেকে নিয়ে কি যেন বললেন। আমাদের বুঝতে বাকী রইলো না যে, রফিক ভাই আর নেই, তিনি চলে গেলেন মহান প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে। শাহাদাত পরবর্তী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে ব্যস্ত থাকার কারণে শহীদের পিতা-মাতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় কদিন পর। শহীদের পিতা ..... যদিও বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন সময়ে বেশ শক্ত বক্তৃতা দিয়েছেন। বুঝিয়েছেন পুত্র শহীদ হওয়ায় তিনি গর্বিত। কিন্তু রাতের আঁধারে একান্তে মহান প্রভুর দরবারে প্রিয় সন্তানটির জন্য দুহাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে এখন তার চক্ষু নষ্ট হবার উপক্রম।

মা নির্বাক পাথরের মত। কোন কথা বলতে পারেননি– ভাই-বোন এবং স্বজনদের আহাজারিতে আকাশ, বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল।

আমরা যখন ডিপার্টমেন্টের সকলে মিলে শিক্ষা সফরে গেলাম তখন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের কারণে রফিক ভাইকে থেকে যেতে হলো ক্যাম্পাসে।

পুরো সফরে তাকে খুব অনুভব করি আমরা। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম সমাপনীটা কুষ্টিয়াতে করবো এবং রফিক ভাইকে নিয়ে করবো। আলহামদুলিল্লাহ পুরো সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি একক প্রাধান্য রেখেছেন। সবাইকে হাসিয়েছেন আনন্দ দিয়েছেন। এমনিতেই তার উপস্থিতি বন্ধু মহলে প্রাণচাঞ্চল্য এনে দিত। সমাপনীর অংশ হিসেবে রফিক ভাইকে নিয়ে আমরা কুষ্টিয়া লাভলী টাওয়ারের ছাদে উঠলাম। ছাদে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ কুষ্টিয়াকে এক মনোরম প্রকৃতির মোহনীয়তার আবেশে দেখা গেল। দূরের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, গড়াই নদী, গাছপালা ইত্যাদি দেখতে দেখতে আমি বিবরণ দিচ্ছিলাম সিলেট জাফলং ও মাধবকুন্ডের মনকাড়া দৃশ্যের। আর রফিক ভাই তন্ময় হয়ে তা শুনছেন এবং মনে হলো সেই সুদূর সিলেট-জাফলং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-আনন্দ তিনি এতেই ঢের উপভোগ করছেন।

তার এই অসাধারণ মন-মনন মানসিকতার উৎকর্ষিক পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করে।

শহীদ রফিক ভাই ছিলেন আমার ক্লাসমেট। ক্লাসের বিনয়ী ছাত্ররা হার মানতো তার বিনয়ের কাছে। যা শিক্ষকগণের নিকট অনুপম দৃষ্টান্ত। শাহাদাত পরবর্তী শিক্ষক গনের অনুভূতি ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। তারা যে রফিক ভাইকে এত ভালবাসতেন, আগে বুঝিনি। অনেকে আবেগের প্রাবল্যে শহীদ রফিক ভাইয়ের অনেক অনুকরণীয় দিক তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সময়ে তাকে স্যারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হতো। শত অনুরোধ সত্ত্বেও স্যারদের সম্মুখে শহীদ রফিক ভাই কখনও চেয়ারে বসতেন না। স্যারদের সামনে চেয়ারে বসা ছিল সম্মানজনক কিন্তু তিনি নিজেকে মনে করতেন অতি নগন্য। এ

www.pathagar.com

সম্মানের উপযুক্ত তিনি নন। আর তাই মহান আল্লাহতায়ালা তাকে এত বড় সম্মান দিলেন। তাইতো সবচেয়ে সম্মানিত চেয়ার আজ তার জন্য।

সারাক্ষন সংগঠন নিয়ে ব্যস্ততা। পড়ার সময় পেতেন না তেমন। তাই মাঝে মধ্যে আমরা একত্রে বসে তাকরার করতাম। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের সবার আগে রফিক ভাইয়ের মুখস্থ হয়ে যেত। এমনকি এমন অনেক জটিল শব্দের অর্থ তিনি তাৎক্ষনিক করে ফেলতেন যে শব্দের অর্থ ডিকশনারীতেও পেতাম না। তার মুখস্থ শক্তি ক্যাচিং পাওয়ার এবং উপস্থিত শব্দ জ্ঞান আমাদের মুগ্ধ করতো।

শুধু সংগঠনের মধ্যে নয় দারুন সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের সঙ্গে। সে কারণে আমরা অনেক সময় অনেক বড় ধরনের সংঘাত এড়াতে পেরেছি।

রফিক ভাইয়ের শাহাদাতে তাই বিরোধীদের চোখেও কান্না ও দুঃখবোধ দেখেছি। আর সাধারণের মাঝেও ছিল তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা।

রফিক ভাইয়ের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। তথাপি কখনও কোনও দুস্থঃ অসহায়কে হাত পেতে খালি হাতে ফিরতে হয়নি। একবার শ্রীরামপুর থেকে এক সুধী এলেন তার স্ত্রীর চিকিৎসায় কিছু সাহায্যের জন্য। রফিক ভাই নিজের পকেট হাতড়ে যা পেলেন তাতো দিলেনই উপরন্তু এতে হবে না ভেবে সংগঠনকে বলে আরও কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।

উপস্থিত জ্ঞান, তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রজ্ঞা ছিল অতুলনীয়। ক্যাম্পাসে যে কোন ধরনের মিসসিসুয়েশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, সেক্রেটারী পর্যন্ত পরামর্শ নিতেন তার কাছে। যত বড়ই গন্ডগোল হোক তার মুখে থাকতো হাসি। এবং মাথা থাকত এত ঠান্ডা যে ত্বরিৎ কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বেগ পেতে হতনা।

একবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) বলেন– আল কোরান ভীরু কাপুরুষের জন্য নাযিল হয়নি বরং কোরান নাযিল হয়েছে ওই সব নর শার্দুলের জন্য যারা নদীর স্রোতকে থামিয়ে দেয়ার এবং বাতাসের গতিকে পাল্টিয়ে দেয়ার মতো দুঃসাহস রাখে।" শহীদ রফিক ভাই ছিলেন এ বক্তব্যের বাস্তব অনুসারী। ইসলামী আন্দোলনের এ অকুতোভয় সৈনিক অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ছিলেন বলিষ্ট কণ্ঠস্বর। এক্ষেত্রে তিনি কারও রক্ত চক্ষুকে পরোয়া করতেন না। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আপোষহীন।

তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের অতন্দ্রপ্রহরী। কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি জনশক্তি এবং ময়দানের হেফাজতের জন্য অসংখ্য রাত জেগে কাটিয়েছেন। গভীর রাত্রিতে কোনও প্রয়োজনে তাকে ডাকলে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাওয়া যেত। তাঁর এই বলিষ্ট ভূমিকা রাসূলের (সঃ) সেই বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়– "দুটি চক্ষু এমন আছে যাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একটি হলো ঐ চোখ যা আল্লাহ্‌র ভয়ে নিভৃতে

www.pathagar.com

কাঁদে এবং অপরটি হলো সেই চোখ যা রাত জেগে আল্লাহর সৈন্যদের পাহারা দেয়।" শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি শাহাদাতের নজরানা পেশ করে আমাদের সাথে ত্যাগ ও কুরবানীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা যুগেযুগে আন্দোলনের কর্মীদের জন্য পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। শহীদ রফিকুল ইসলাম মহান রাব্বুল আলামীনের সেই আয়াতের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়েছেন– "..... মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নিজের জীবনমান বাজি ধরে, বস্তুত আল্লাহ ওই সব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। (বাকারা ২০৭)

শহীদ রফিকুল ইসলাম ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। নিজে যখন কোথাও এ বিষয়ে আলোচনা করতেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মদনডাঙ্গা এলাকায় দায়িত্ব পালন কালে একবার কর্মীদের শবেবেদারী প্রোগ্রামে মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রফিক ভাই। "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ ও কোরবানী" শীর্ষক আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। তার কান্নায় উপস্থিত সকল কর্মী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

শাহাদাতের অদম্য ইচ্ছা পোষণ করতেন তিনি। তার মাঝে ছিল আল্লাহ্‌র এই পরীক্ষায় "আল্লাহ এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার এবং এজন্য তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহন করতে চান"–(আল-ইমরান ১৪০) উত্তীর্ণ হবার সুতীব্র বাসনা। উত্তপ্ত ময়দানে গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মৃত্যুকে তিনি কোন ও পরোয়াই করতেন না। নিজের জীবনবাজি রেখে যেকোনও পরিস্থিতি মুকাবেলা করতেন। তাইতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত স্মৃতি এলবামে লিখেছিলেন সত্য ও সুন্দরের পক্ষে আমি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম সারাক্ষণ, ভবিষ্যতেও থাকবোই ইন্‌শাআল্লাহ। অবশেষে তিনি ৮ই জুন ২০০১ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী মদনডাঙ্গা ছাত্রাবাসে জাসদ-ছাত্রলীগের হামলায় নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। বাস্তবায়িত হলো তার দীর্ঘদিনের লালিত প্রত্যাশা ও সুতীব্র বাসনা।

রফিক ভাইয়ের সঙ্গে হাজারও স্মৃতি জমা হয়ে আছে স্মৃতির ভান্ডারে। যার কোনটাই ভুলবার নয়। কিন্তু কখনও ভাবিনি একইসঙ্গে ভর্তি হওয়া এই রফিক ভাইয়ের মৃত্যু নিয়ে আমাকে লিখতে হবে তার শেষ দিনের সেই ফজর ওয়াক্তের এক চিলতে হাসি এখনও আমাকে নির্বাক করে, শহীদের কথা আলোচনায় উঠলেই মনে পড়ে যায় সূর্যোদয় থেকে রাত অবধি একজন প্রশ্নহীন মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। তার হাসি মুখে রাত্রি জাগরণের কথা। সমূহ বিপদের মুখে তাঁর নির্ভিক ও স্বাভাবিক আচরনের কথা। প্রচার বিমুখ অতি সাধারন এক অনাড়ম্বর মানুষের ত্যাগের কথা। কিন্তু শহীদের রেখে যাওয়া কাজের সুকঠিন জিম্মাদারি আমাদের কাঁধে রয়েছে আমরা কি আদৌ সেই অহর্নিশ দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনে উদগ্রীব রয়েছি? পেরেছি কি সারাদিনের পরিশ্রম শেষে হাসি মুখে রাত্রি জাগরনে অভ্যস্ত হতে? সাহাবিদের নির্ভেজাল চরিত্রকি প্রতিস্থাপিত হয়েছে আমাদের চরিত্রে? দ্বীনের পথে সব হারানোর আনন্দ কি আমাদের অনুভূতিতে হাতছানি দেয়? এই নির্ভীক রক্ত দান যদি আমাদের পাওয়া কাজের বাসনাকে উদ্বেলিত না করে। আমাদের চেতনাকে পরিশুদ্ধ না করে তাহলে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের সকাল হবে সুদূর পরাহত। আর আমরা নিপতিত হব দুরূহ জবাবদিহিতার নিকষ রাত্রিতে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার দ্বীনের পথে সুদৃঢ় করুন। কবুল করুন শহীদ রফিকুল ইসলামের পবিত্র রক্তকে। আর দান করুন শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা। --- আমীন।

লেখক ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

রফিক স্মরণে কিছু ভাবনা

আবদুর রউফ মোল্যা

সমৃদ্ধ উপাদান এবং উপাদানের বিন্যাস পদ্ধতি নির্মিত বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে। যেমন তাজমহল একটি নাম, একটা প্রাসাদ। বহুমূল্যমানের পাথর শিল্পীর কারুকার্যময় বিন্যাস পদ্ধতিতে স্থাপিত হওয়ায়, নয়ন ভূলানো এক আশ্চর্য ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে বর্তমান।

তেমনি মানুষ একটা নাম-একটা প্রাসাদ। সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্য মানুষে অংকিত করে। স্রষ্টা মানুষকে এক তুলনাহীন প্রাসাদে রূপদান করেছেন (লাকাদ খালাকনাল ইনছানা ফি আহছানে তাকবীম)।

তাজমহলে শাহাজাহানের প্রাণাধিক প্রিয় মমতাজ শায়িত, আর মানুষের শায়িত স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ বস্তু রূহ।

তাজমহলে মমতাজ শায়িত না থাকলে এমন আকর্ষনীয় সৃষ্টিতে রূপ লাভ করত কিনা সন্দেহ আছে কারণ শাহাজাহান নির্মিত অন্যান্য সৌধগুলোতে মমতাজ নাই, তাই তার গুরুত্ব তত নাই।

অনুরূপ ভাবে মানুষে রূহ না থাকলে তারও কোন গুরুত্ব নাই। অর্থাৎ মৃতটা নিক্ষিপ্ত বস্তু।

শ্রুতি আছে শাহাজাহানের শেষ বয়সে, শয়নকক্ষ থেকে তাজমহলটি সরাসরি দেখা যায় এমন একটা কক্ষ নির্মাণ করে শাহাজাহান সেখানে থাকতেন এবং সারা দিন রাত অনুভবে তাঁকে কাছে পেতেন। এক সময়ে তার এক পুত্র ঐ অর্গল পথটা বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি উম্মাদ হয়ে উঠেন। শেষে ঐ পুত্রটা পেরিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় তার ব্যবস্থা করে দেন

www.pathagar.com

এবং তিনি শান্ত হন।

স্রষ্টা এবং বান্দার মধ্যে এমন একটা পেরিস্কোপের নাম সালাত বা নামাজ। নামাজ রূপ পেরিস্কোপের মাধ্যমে স্রষ্টাকে অনুভব পাওয়া যায়।

২

তাজমহলে যদি জীবন্ত মমতাজ থাকত আর নিজ প্রয়োজনে শাহজাহান যদি তাকে ডাকতেন এবং সে ডাকে যদি মমতাজ নাই সাড়া দিতেন তবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হত? মমতাজের শ্রেষ্টত্ব শাহজাহানের আদেশ পালন করার এবং নিকৃষ্টত্ব হল প্রত্যাখান করায়।

তেমনি ভাবে যে বা যারা স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিল তারা উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ মুজাহিদ কিন্তু যারা জীবন দিল। তারা অধিক, অধিক উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ তারা "শহীদ"। এমনি ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে, আমাদের প্রানাধিক প্রিয় "রফিক" শহীদ হয়ে ফিরে গেল। এই শহীদেরা মৃত নয় - এরা জীবিত। এরা স্রষ্টা থকে রিজিক প্রাপ্ত হয়। এরা গোটা মুসলিম জাতির ধ্রুব তারা"।

সৃষ্টির আদিথেকে আজ পর্যন্ত আকাশে একধরনের তারকা দেখা যায়-যে তারার সাহায্যে মানুষ বিজন মরুপথে অথবা মহা সমুদ্রে পথের দিশা খুজে পায় তেমনি গোটা মুসলিম জাতি এই শহীদ রূপ ধ্রুবতারার নিজ পথ খুজে পায়।

যেদিন আকাশ থেকে এই ধ্রুব তারা হারিয়ে যাবে সেদিন গোটা পৃথিবী ধ্বংশ হয়ে যাবে। অনুরুপ ভাবে জাতির পথ থেকে যেদিন রফিকেরা হারিয়ে যাবে সেদিন এ জাতি ধ্বংশ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের এমন বিভ্রান্তি থেকে দুরে রাখুন। আমীন!

www.pathagar.com

একজন রফিক ভাই

আহসানুল কবীর মুক্ত

জুমার নামাজ সেরে ঝিনেদা জেলা মেসে রেষ্ট নেওয়ার জন্যে উঠলাম। রক্ত ভেজা শার্ট পরা একটা ছেলে হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকেই বলল, ভার্সিটির এক ভাই মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছে, শেখ পাড়া মেস থেকে অনেক ভাইকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে.....। স্কুল পড়ুয়া শিবির কর্মী এই ছেলে; কথা শেষ করতে পারেনি ওর গলাটা যেন আটকিয়ে গেল, দ্রুত তৈরী হয়ে জেলা সভাপতি মুস্তাফিজ ভাই সহ রিকশায় উঠলাম, ও উঠলো ওর ছোট্ট সাইকেলটাই, আগেই জেনেছি হাসপাতালে এখনো কোন ডাক্তার আসেননি। রাস্তার পাশে এক ক্লিনিকে ডাক্তার আছে জেনে দু'জন ঢুকলাম। রুগীর মারাত্মক অবস্থাটা তুলে ধরার পর ডাক্তার তেমন গুরুত্ব দিলেন না, এটা সেটা করতে করতে আরো ১০/১৫ মিনিট দেরি করলেন। আমি আগেই বের হয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটলাম, পথে মাসুদের সাথে দেখা, ওর কাছেই জানলাম, রফিক ভাই হাসপাতালে, ইতোমধ্যে দ্বীনি ভাই বোনরা অনেকেই হাসপাতালে ভিড় করেছেন সবারই শুক্‌নো চেহারা, অজানা আশংকার ছাপ সবার চেহারাই। একটা ষ্ট্রেচারের উপর শোয়ানো রফিক ভাইয়ের পুরো শরীর রক্তে ভেজা, মাথা মুখ অস্বাভাবিক ভাবে ফোলা। পানি থেকে মাছ ডাঙ্গায় তুললে মাঝে মাঝে যেরকম ফুলকা উচু করে, রফিক ভাই তখন ও রকমই করছিলেন। সামান্য অভিজ্ঞরাও এ অবস্থা দেখে বুঝবে যে আর ফিরবে না। ডাক্তার এসে অপারেশন থিয়েটারের নিতে

www.pathagar.com

বললেন। জনশক্তি সবাই ও.টি রুমের সামনে ভিড় করল, অনেকেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন, অনেকে জোরে জোরে দোয়া পড়ছেন। ৫/৬ মিনিট পর ডাক্তার বের হয়ে এসে এক জনকে ভিতরে যেতে বললেন, ডাক্তারের চেহারা দেখে ঘটনা অনুমান করতে পারলাম, আমি ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে গিয়ে ডাক্তার বললেন, দুঃখিত উনি অনেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন; শুধু সান্তনার জন্যে ওটিতে আনা। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। রফিক ভাইয়ের শরীর তখন পুরো নিস্তেজ। দুই হাত আমার হাতে নিলাম যে ভাবে রফিক ভাই আমার হাত উনার হাতের মধ্যে নিয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে কথা বলতেন। ডাক্তার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি অনুরোধ করে বললাম, আপনি বাইরে বের হলে সবাই বুঝে যাবে এই মুহূর্তে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়ে যাবে, আপনি একটু বসুন। একটু পরে বাইরে এসে দেখি সবাই হাত তুলে দোয়া করছে। হাও মাও করে কাঁদছে--- আমাদের রফিক ভাইকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দাও---। আমাকে বাইরে আসতে দেখে অনেকেই দোয়া ছেড়ে দিয়ে জানতে চাইলো, কি অবস্থা? একজন বলল, অ্যাম্বুলেন্স রেডি আছে, এখানে না রেখে ঢাকা নেওয়া ভালো। কারোর কথাই যেন আমি শুনিনি এরকম ভাব করে কিছুক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে ছিলাম। তারপর একজনের কাছ থেকে ক্যামেরা চেয়ে নিলাম। ও বুঝতে পেরে 'র-ফি-ক ভাই' বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো। সভাপতি রাসেল ভাইকে সব জনশক্তি নিয়ে হাসপাতাল মসজিদে যেতে বলে আমি ভিতরে ঢুকে গেলাম। রফিক ভাইরের কিছু ছবি নিয়ে, আহত জায়গা গুলো দেখলাম। মারাত্মক আঘাত ছিল মাথার পিছন সাইডে, ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে গেছে। একটু পরে ওটি থেকে নিয়ে আসা হল হাসপাতালের সিড়ির নিচে যেখানে লাশ রাখা হয়। এই হাসপাতালের এখানেই ইতোপূর্বে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়েছে শহীদ মোজাফফর, শহীদ আবু বক্কর,শহীদ শাহ্ আলম, শহীদ আমীনুর রহমান, শহীদ মহসিন।

৭ তাং বৃহস্পতিবার ছিল আমার মামলার হাজিরা, ঢাকা থেকে রওনা হয়ে বুধবার বিকালে ক্যাম্পাসে পৌছলাম। ২০০০ সালের মাঝামাঝি ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে প্রয়োজনে অথবা কোন খোড়া অজুহাত দাড় করিয়ে নিজেকে নিজেই ম্যানেজ করে যখন ক্যাম্পাসে আসার সিদ্ধান্ত নিতাম তখন খুব ভালো লাগতো। ভিতরটা খুশিতে উত্লিয়ে উঠতো। ক্যাম্পাসে ঢোকার পর মনে হয় যেন আপন জনদের মধ্যে এসে গেছি। নিজের মনের এই অবস্থাটা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করি। এজন্যে ক্যাম্পাসে ঢুকে যার সাথেই দেখা হত বলতাম-অমুক কাজের জন্যে আসতে হল। বুধবার বিকালে বাস থেকে নেমে হলের কাছাকাছি এসে প্রথমে চোখাচোখি হল রফিক ভাইয়ের সাথে, কয়েক জনের সাথে বসে উনি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। 'আরে মুক্ত ভাই যে - বলে উঠে এসে মোলাকাত করলেন। আমার ডান হাতটা ওনার দু'হাতের মধ্যে নিয়ে স্বভাব-সুলভভাবে অনর্গল ফোটাতে লাগলেন, হাসতে হাসতে বললেন- আর একটা পরীক্ষা

www.pathagar.com

বাকী, ভাইভা দিয়েই ঢাকা আসছি। হাত ধরে হাটতে হাটতে সাদ্দাম হলের আমার সেই সাবেক রুম ৩৩৩-এ আসলাম, রুমে বসে অনেক কথা হল।

১৯৯৮ সালে ক্যাম্পাসের জনশক্তি হয়ে ঝিনেদা থেকে যখন হলে আসলাম রফিক ভাই তখন মদনডাঙ্গা শাখার দায়িত্বশীল। সম্ভবত এটা আমার খারাপ একটা স্বভাব যে, কারো সাথে হঠাৎ করেই ঘনিষ্ট হই না বা হতে পারি না। ব্যক্তির সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়ে পরিমাপ করি এর সাথে কতটুকু ঘনিষ্ট হওয়া উচিত। রফিক ভাইয়ের ব্যাপারে ও রকম ধারণা করতে বেশ সময় লেগে যায় আমার। উনার লজিং বাড়ীতে আমাকে একদিন আম খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। হল মসজিদে আসর পড়ে দু'জন সাথে নিয়ে একটা ভ্যান নিয়ে রওনা হলাম মদন ভাঙ্গায়। পাকা রাস্তা শেষে ভ্যান ছেড়ে দিয়ে হাটা শুরু করলাম তিনজনে। বাড়ীর সামনে দিয়ে নদী। নদীর ধারে আম গাছের নিচে বাঁশের তৈরী চরাটের (এলাকার ভাষা) উপর পা দুলিয়ে বসেছিলেন রফিক ভাই। উনার কাঁধের উপর দুই আড়াই বছরের এক পিচ্ছি চুল ধরে বসে আছে। আশে পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। আমাদের দেখেই রফিক ভাই পিচ্ছিটা কাধে করেই উঠে দাড়ালেন। আমরা পৌছাতেই ছেলে মেয়ে গুলো একত্রিত হয়ে এক সাথে কপালে হাত লাগিয়ে আস্সালামু আলাইকুম বলে উঠলো। রফিক ভাই ঘাড় বাঁকা করে উপরের দিকে তাকিয়ে পিচ্ছিটাকে সালাম দিতে বললেন, পিচ্ছিটা সাথে সাথে কপালে হাত ঠেকিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। এটা দেখে অন্যরা খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলো। রফিক ভাই আমার হাত ধরে বাড়ীর দিকে হাটতেই বললাম, চমৎকার জায়গা এখানেই বসি। রফিক ভাই ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে অনেক কাঁচা পাকা আম কেটে মশলা মেখে আনলেন। নদীর ধারে ফুরফুরে বাতাস সেই সাথে রফিক ভাইয়ের প্রশিক্ষিত বাচ্চাদের কাঁনামাছি, দাড়িয়াবান্ধা খেলা দেখতে দেখতে অনেক সময় কেটে গেল। সন্ধার পর নদীর ভিতর নেমে গিয়ে পানির কাছাকাছি দুর্বা ঘাসের উপর বসে চার জনে অনেক কথাবার্তা অনেক হাসাহাসি করেছিলাম।

রফিক ভাইয়ের সাথে একান্ত ভাবে যারা মিশেছে তারা হয়তো উনার মধ্যে সদা সতেজ মুক্ত সহজ সরল একটা মন খুজে পেয়েছে। কারো মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে উনি সামনা সামনি বলতেন। এতে অনেকেই হয়তো কষ্ঠ পেতো। একদিন সদস্য বৈঠকে উনার সংক্ষিপ্ত দারস ছিল। আমি খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কোরআন থেকে তুলে নিয়ে ছুড়ে মারছেন কথাগুলো। সেই আঘাতে আমার ভিতরের কোন কালো পাহাড় যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পানির সাথে গুলিয়ে যাচ্ছে। সে পাহাড়ের অস্তিত্ব আমি খুঁজে পাইনি কোন দিন, অন্যদের চোখে ধরা পড়তো। সত্যিই খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছিলাম ঐ দিন।

দলমত নির্বিশেষে সবার সাথে সমান ভাবে মিশতেন উনি। অন্যান্য দলের নেতা কর্মীরাও উনার সাথে ফ্রি হয়ে মিশতো। এমনকি যে ছেলেগুলো রফিক ভাইকে এভাবে

www.pathagar.com

মারলো, ওদের সাথেও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন রফিক ভাই। ৬ তারিখ বুধবারের যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উনার শাহাদাৎ। হলের সামনে সিগারেট খাওয়া নিয়ে জাসদের অছাত্র উশৃংখল ৩/৪ টা ছেলের সাথে হলের ছেলেদের হাতাহাতি-রফিক ভাইই এগিয়ে এসে ঠেকালেন। ছেলেগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে বাইরে পাঠালেন। এই ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ হল বন্ধ করে দিল। এতে সন্ত্রাসীগুলো উৎসাহিত হয়ে গেল। পরে জানলাম শুক্রবার দিন যারা রফিক ভাইকে মারলো তাদের মধ্যে ঐ ছেলেগুলোর ভূমিকা বেশি ছিল যাদেরকে রফিক ভাই বুধবার দিন বড় আঘাত থেকে বাচিয়ে ছিলেন।

৯ তারিখ সকালে ঝিনেদা অগ্রণী মোড়ে জানাজা শেষে উনার কফিন নিয়ে সাতক্ষীরার দিকে রওনা হলাম আমরা। ভার্সিটির বাস অ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোসহ এক বিরাট বহর। পথে অনেক জায়গায় জানাজার নামাজ হল। বাড়ী পৌছার আগে যে খানে জানাজা হল, জায়গাটার নাম মনে নেই - ওখানে বিশাল জমায়েত। একজন চিৎকার করে স্লোগান দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, অন্যদের কাছে জানলাম। লোকটা রফিক ভাইয়ের ছেলে বেলার ক্লাস ফ্রেন্ড এবং এই এলাকায় এক সাথে কিছু দিন দাওয়াতের কাজ করেছেন। এখানে যখন পথ সভা চলছে তখন আমাদের মাইক্রোবাসগুলো সামনে রাস্তার পাশে দাড় করানো। একটার মধ্যে আমি এবং আঃ মালেক ভাই (শহীদের চাচাত ভাই)। দেখলাম আধা বয়সী এক মহিলা পাগলীনির মত বিলাপ করছেন আর সবগুলো মাইক্রোর জানালা ধরে ধরে উকি দিচ্ছেন। আমাদের মাইক্রোর কাছে এসে মালেক ভাইকে দেখে মহিলা চিৎকার করে উঠলেন --- ও মা-লে-ক আমার - বাছা-ডা কই ---। মালেক ভাইও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন, মহিলার বিলাপ দেখে আশপাশে বেশ ভিড় জমে গেল, সবাই চোখ মুছতে লাগলো। মহিলা মালেক ভাইদের আপন কেউ হবে মনে করেছিলাম কিন্তু পরে জানলাম, অনেক আগে এই মহিলা রফিক ভাইদের বাড়ী কাজ করতো, রফিক ভাই তখন একটু একটু কথা বলতে শিখেছে, এই মহিলা ছাড়া অন্য কারো কাছে নাকি রফিক ভাই ভাত খেতেন না।

রফিক ভাইয়ের বাড়ীতে যখন আমরা পৌছলাম তখন আসরের আযান হল। বাড়ীর বাউন্ডারী প্রাচীরের দরজার সামনে বেশ খানিকটা ফাকা জায়গা। অ্যাম্বুলেন্স থেকে কাঠের বাক্সটা নামানো হল। হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছে এক নজর দেখার জন্যে। প্রাচীরের উপরে, গাছের ডালে, আশ পাশের ঘরের ছাদে পুরুষ মহিলা মিলে প্রচন্ড চাপাচাপি করছে। বাড়ীর ভিতর থেকে স্বজনদের বিলাপ শোনা যাচ্ছে। কারো চোখ শুক্‌নো দেখিনি। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে অপেক্ষমান রফিক ভাইকে যখন কাঠের বাক্স ভেঙ্গে বের করা হল, আশে পাশের সবাই চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। অনেক্ষণ ধরে চলল বুক ফাঁটা চিৎকার। একে একে শহীদের মা বোনদের নিয়ে আসা হল এক নজর শেষ বারের মত দেখানোর জন্যে। বুক চাপড়িয়ে আহাজারী করছে অনেকেই। এরই মধ্যে ভিড় ঠেলে উচ্চ স্বরে - তোরা কাঁদিসনে, রফিকের কষ্ট হবে --- বলতে

www.pathagar.com

বলতে একজন সুঠাম দেহের মুরুব্বী এগিয়ে আসছিলেন, গায়ে নিল রংঙের পাঞ্জাবী ঘামে ভেজা, মাথার টুপীর নিচ দিয়ে ঘাম বেয়ে বেয়ে পড়ছে। আমি ওনাকে শহীদের কাছে যেতে বাধা দিলাম। সবেগে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে উনি শহীদের কাছে গিয়ে যারা বিলাপ করছিল তাদের উঠিয়ে দিলেন। তারপর শহীদের কপালে হাত বুলিয়ে উঠে দাড়িয়ে বললেন - আর দেরি করা যাবে না, কবর তৈরী হয়ে গেছে, ধরেন তো আপনারা --- বলেই উনি খাটিয়ার এক পাশ ধরলেন। পাশের একজনের কাছ থেকে জানলাম উনি শহীদের গর্বিত পিতা আশ্চর্য হলাম, একজন পিতা কিভাবে এতটা স্বাভাবিক থাকতে পারেন। উনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল আসলেই উনি গর্ববোধ করছেন।

ঘন্টা খানেক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। বড় একটা পুকুর। পুকুরের দক্ষিণ এবং পূর্ব পাশের পাড়টা বেশ চওড়া, সারি দিয়ে লাগানো নারিকেল আর সুপারী গাছ। দক্ষিণ পাশে অনেক দুর পর্যন্ত পানি আর পানি। মাঝে মাঝে খন্ড খন্ড করে বাঁধ দেওয়া দেখে বোঝা যাচ্ছে চিংড়ী চাষ হয়। দক্ষিণ দিকে থেকে বেশ জোরেই বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পানির ঢেও এ পড়ন্ত সূর্যের আলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে চিক্ চিক্ করছে। পূর্ব পাশে সর্ব শেষ জানাজা হল। জানাজা পড়ালেন শহীদের পিতা, জানাজার পূর্বে শহীদের পিতার বক্তব্য শুনে প্রায় সবাই ডুকরে কেঁদে উঠলো। উনি শপথ করিয়ে নিলেন-রফিকের রেখে যাওয়া বাকী কাজ কি আপনারা করবেন --? ভিতর থেকে কে যেন 'নারায়ে তাকবীর' বলে উঠলো চিৎকার করে। সবার কান্না ভেজা কণ্ঠ থেকে উত্তরটা ঠিকমত এলো না। সূর্যটা লাল হয়ে ডুবু ডুবু অবস্থা, মাটির নিচে তৈরী করা ছোট ঘরে রফিক ভাইকে রেখে আমরা একে একে সবাই রাস্তায় উঠে আসলাম। রাস্তায় দাড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। সূর্যের লাল রশ্মি কাঁচা মাটির টিবির উপর পড়ে যেন খুশিতে বাগ বাগ, আল্লাহর মেহমানকে যেন স্বাগত জানাচ্ছে। আমি স্বাভাবিকতা হারাচ্ছি বুঝতে পেরে কে যেন আমার হাত ধরে টেনে আনলো। শহীদের পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। একটু পরেই মাগরিবের আযান হল। আমার সামনে হাটছিল মাসুদ ও মাঝে মাঝে লম্বা শ্বাস ফেলছে আর বলছে-হায়রে রফিক ভাই। রাস্তার পাশে মসজিদ। ওজু করার জন্যে কেউ টিউবয়েলে কেউ পাশের পুকুরে নেমে পড়লে। দেখলাম অন্য দিকে তাকিয়ে মাসুদ দাড়িয়ে আছে, দু'চোখ থেকে অশ্রু বেয়ে পড়ছে। এক পর্যায়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কয়েকজন ওকে ধরে ফেলল। হাত পা ছুড়ে বিলাপ করতে লাগলো। আমি পাশে যেতেই আরো বিলাপ করে বলল মুক্ত ভাই আপনাকে তো বলেছিলাম রাতে আলহেরায় আসেন আপনার জনশক্তিরা সব না খেয়ে আছে-- আপনি কেন আসলেন না, আপনি কেন আসলেন না,--- আপনি---। বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। দীর্ঘ সময় মাথায় পানি দিতে হল, চোখে মুখে পানি ছিটা দিতে দিতে এক সময় চোখ খুললো---।

রাতে আমি আলহেরায় আসলে কি হত? কুষ্টিয়া কোর্টে মামলার হাজিরা দিয়ে পুরানো

www.pathagar.com

স্মৃতিতে পানি ছিটা দিতে সাকসেস কোচিং এ গেলাম। ওখানে আসর পড়ে বাসস্ট্যান্ডে আসলাম ক্যাম্পাসে আসবো বলে। ভার্সিটি অনেকগুলো গাড়ি দাড়িয়ে আছে, ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে নামছে। জানতে পারলাম ক্যাম্পাসের অবস্থা ভালো নয়, হল বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের ভায়েরা সবাই ঝিনেদা চলে গেছে। সন্ধ্যার অনেক পরে ঝিনেদা আসলাম। দেখলাম, মাসুদের সাথে আরো ৩/৪ জন কলা আর পাউরুটী নিয়ে রিকশায় উঠছে। দুর থেকে চোখাচোখি হল। মাসুদ হাত উঠিয়ে বলল, সবাই আল হেরায় আছে, রাতে আসেন। শহরে ঘুরাঘুরি করতে করতে রাতে আল হেরায় যাওয়ার সুযোগ হল না, ফজরের পর পরই গেলাম। যেয়ে জানলাম রাসেল ভাই রফিক ভাই সহ ৫/৬ জন ক্যাম্পাস এলাকায় গেছেন। রাতে আসলে কি হত? এতটুকুই হয়ত হতো যে জীবিত রফিক ভাইয়ের সাথে আরেকবার কথা বলতে পারতাম। তাতে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত কি বদলে যেত? আল্লাহর সিদ্ধান্ত তো আগেই চূড়ান্ত ছিল। "ওয়া ইয়াত্তা খিজু মিন্‌কুম শুহাদা---" আমি অবশ্যই তোমাদের থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে নিয়ে নেবো----"।

লেখক ঃ সাবেক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

www.pathagar.com

রক্তসিক্ত সেই দিনটি

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। নিয়মিত সাংগঠনিক কাজে মহেশপুর গিয়েছিলাম। শহরে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেসে ফিরলাম মাগরিবের পর, মেসে আশা মাত্রই জেলা জামায়াত অফিস থেকে ফোন আসল, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। বিকাল ৪টায় সকল ছাত্রদের হল ত্যাগ করতে হয়েছে। কতৃপক্ষের নির্দেশ পেয়ে ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দ সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে ঝিনাইদহের আলহেরা স্কুলে এসে অবস্থান করছে। তাদের খোঁজ নেওয়ার জন্য তৎক্ষণাত আলহেরায় ছুটে গেলাম। সেখানে ই.বি সভাপতি রাসেল ভাইসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলদের সাথে দেখা হল। সবাইর খোজ খবর নিয়ে রাত্রে সবার সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল। শহর শাখার কয়েকজন ভাইকে দায়িত্ব দেওয়া হল সবার খাবারের ব্যাবস্থা করার।

ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। হল খোলা থেকেছে, আবার কখনও হল বন্ধ হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসের দায়িত্বশীল ছাত্র সংগঠন হিসেবে সাধারণ ছাত্রদের এবং শিবিরের জনশক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশে বিভিন্ন মেসে সবার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু এবারই ব্যতিক্রম ঘটনা। একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ ক্যাম্পাস ও হল বন্ধ করে দিল। স্বাভাবিক কারণেই ছাত্রদের হল ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু আরো ব্যতিক্রম দেখা গেল অন্যান্য বারের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশে ও থাকার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করা গেলনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা মূলতঃ নিষিদ্ধঘোষিত চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের অভয়রণ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভুত পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে জেলা জামায়াত অফিসে বৈঠক ডাকা হল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিসহ কয়েকজন দায়িত্বশীল, জেলাশিবির নেতৃবৃন্দ ও জেলা ও শহর জামায়াতের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রাসেল ভাই ঘটনার বিবরণ দিলেন। সবদিক আলোচনা পর্যালোচনা করে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হল।

১. ক্যাম্পাসের আশে পাশে জনশক্তিদের রাখার ব্যবস্থা করা। আর সে জন্য এলাকার জামায়াতের নেতা কর্মী ও সুধীদের নিয়ে সমাবেশ করা।

২. যাদের সাথে ঘটনা ঘটেছে তাদের সাথে মিমাংসার জন্য তাদের আশ্রয়দাতাদের সাথে কথা বলা।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিমাংসার জন্য তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হল তৎকালীন শহর জামায়াতের আমীর আব্দুল আলিম ভাইকে, তিনি ঠিকাদারী ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তাদের স্থানীয় প্রভাবশালী মুরুব্বি দবির উদ্দিন জোয়ার্দারদের সাথে ব্যবসায়ী সম্পর্ক ছিল। পরদিন শুক্রবার জেলা জামায়াতের আব্দুল আলিম ভাই জেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আনোয়ার ভাই সহ শেখপাড়ায় গেলেন।

ক্যাম্পাসের পাশে জনশক্তিদের থাকার ব্যাবস্থা করা ও সমাবেশের প্রস্তুতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি রাসেল ভাই, রফিক ভাই শফিক ভাই সহ ৫ জন সদস্য এবং আমি শুক্রবার ফজরের পর পরই মদনডাঙ্গার যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আমি জেলার সূধীর সাইকেল নিলাম। বাকীরা লাইনের গাড়ীতে যাওয়ার কথা থাকলেও ভাগ্যক্রমে একটা প্রাইভেট কার পেয়ে গেলাম। শহরের সাথী মামুন হাসান ভাই উনাদের প্রাইভেট কারটি নিয়ে সকালে চালানোর জন্য বের হওয়ায় সুবিধা হল। উনাকে বললাম রাসেল ভাইদের মদনডাঙ্গায় দিয়ে আসতে। আমি আর মফিজ ভাই মটর সাইকেলে রওয়ানা হলাম। সকাল ৭টার দিকে আমরা মদনডাঙ্গায় কামাল মেসে পৌছলাম। সেখানে নাস্তার ব্যবস্থা করা হল। ইতিমধ্যে আঃ আলিম ভাই দবির জোয়ার্দারের সাথে কথা বলে বিকাল ৪টায় তাদের সাথে বসার কথা হল। উনারাও কামাল মেসে আসলেন একসাথে সবাই নাস্তা সেরে নিলাম। এদিকে রফিক ভাই আমার মটর সাইকেলটি নিয়ে মদনডাঙ্গা গ্রামে মুরুব্বীদের সাথে দেখা করে আসলেন এলেই মটর সাইকেলটি নিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলেন আমি তার কাছে যেতেই তিনি তার স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে বললেন কিছু হয়নি। একটু পড়ে গেলাম আরকি।

বাদজুমা স্থানীয় জামায়াতের কর্মী সমাবেশ হবে। যেখানে মেহমান হিসেবে জেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আনোয়ার ভাই থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতিসহ যে কয়জন সদস্য ভাই আছেন তারা সবাই মিলে নামাজ পর্যন্ত

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্ববর্তী এলাকায় গণসংযোগ ও সমাবেশের দাওয়াতী কাজের জন্য কামাল মেসে থেকে গেলেন। আমি এবং মফিজ ভাই ঝিনাইদহে চলে আসলাম।

ঝিনাইদহ এসে জুমার নামাজ আদায় করলাম। বিকাল ৪টার বৈঠক আবার শেখপাড়া যেতে হবে। নামাজ শেষ করে এসেই যেতে বললাম। এমন সময় আলহেরা পাড়ার একজন কর্মী হাপাতে হাপাতে এসে সংবাদ দিল রফিক ভাই আহত হয়েছেন, রাসেল ভাইরা ওনাকে নিয়ে হাসপাতলে এসেছেন আপনাকে এক্ষুণি যেতে বলেছে। শুক্রবার হওয়ায় হাসপাতালে কোন ডাক্তার নেই।

আমি খাবার শেষ না করেই হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। আঃ আলিম ভাইকে ফোন করে সংবাদটি জানিয়ে দিয়ে রিক্সা নিয়ে মেস থেকে বের হলাম। তখনও ডাক্তারের কোন ব্যবস্থা হয়নি। ফোন করে জানতে পারলাম সার্জিক্যাল ডাক্তার নাসির সাহেব আল ফালাহ হাসপাতালে আছেন। সেখানে যেয়ে ওনাকে ঘটনা জানিয়ে সাথে করে নিয়ে হাসপাতালে আসলাম। জরুরী বিভাগে এসে গলিতে আহত রফিক ভাইকে দেখলাম। রক্তে পুরো শরীর ভিজে আছে। মাথাটা তাঁর অনেকটা থেতলে গেছে। শ্বাস নিচ্ছে অনেক পরপর। ডাক্তার সাহেব দেখে আমাকে আস্তে আস্তে বললেন অবস্থা বেশী ভাল নয়, অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে তেমন লাভ হবে না। তারপরও বললেন নিয়ে যাই, যাতে লোকজন কিছুটা শান্ত থাকে। ডাক্তারের কথা শুনে আমার পা একেবারে অচল হয়ে গেল। ই.বি সভাপতিসহ তখন শতশত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাধারণ জনতা হাসপাতালের বারান্দায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতলোকের উপস্থিতিতেও আমাকে অসহায় মনে হল। কাউকে কিছু বলতে পারছিলাম না। আর কতক্ষণ পরেই হয়ত আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সদা হাস্যজ্জল সেই রফিক ভাই এ সংবাদটি সবাইকে আমাকেই দিতে হবে। শহরের দায়িত্বশীল ও জনশক্তিদের খবর দেওয়া হল হাসপাতালে চলে আসার জন্য। দুরু দুরু বুক নিয়ে অপেক্ষা করছি OT থেকে কি খবর আসে জানার জন্য। প্রায় ২০মিঃ অতিক্রম হয়ে গেছে। এমন সময় একজন দৌড়ে এসে বলল ডাক্তার সাহেব আপনাকে ডাকছে। দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই পাঁ দিতে পারছিলাম না সামনে। কারণ ডাক্তার যা দিবেন তাতো আমার আগেই জানা, ফিরে আসতেই ই.বি. সভাপতি রাসেল ভাই সহ সবাই ঘিরে ধরল। কিছুতেই বলতে পারছিলাম না রফিক ভাই নেই; আমার অবস্থা দেখে অনেক কষ্টে বললাম রফিক ভাই নেই।

মুহূর্তেই হাসপাতালের সব দিকে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হল। ই.বি সভাপতি রাসেল ভাই, সদস্য মাসুদ সহ শহীদ রফিকের সাথীদের বুকফাটা চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠল। সবাই একে অপরকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। যিনি স্বাভাবিক থাকতে পারবেন তিনি আজ সবাইকে ফেলে চলে গেছেন। রফিক ভাই এর শাহাদাতের খবর, হাজার হাজার ছাত্রজনতা ছুটে আসতে থাকল হাসপাতালে।

www.pathagar.com

এদিকে আসরের নামাজের সময় প্রায় কাছাকাছি। অফিসিয়ালি সময় প্রায় শেষ। এই স্বল্প সময়ে পোষ্ট মর্টেমের ব্যবস্থা করতে না পারলে আগামীকাল সকাল ৯ টার আগে আর সম্ভব হবে না। জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলে থানায় ওসি কে ফোন করা হলো। তিনি একজন দারোগা পাঠিয়ে দিলেন। ঘটনার বিবরণ নিয়ে মামলা লিখে নিলেন। হাসপাতাল কতৃপক্ষের সাথে আলাপ করে কাজের মধ্যেই পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করা হলো। পোষ্টমর্টেম শেষ করে কফিন নিয়ে রাখা হলো আলহেরায়।

এদিকে ঝিনাইদহ শহরে শহীদের শোকার্ত সাথীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল শ্লোগানে শ্লোগানে উচ্চারিত হলো শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না। রফিক ভাইয়ের খুনীদের ফাঁসি চাই দিতে হবে।

কর্মসূচী নির্ধারণ হল, শনিবার সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ অগ্রণী চত্বরে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে শহীদের গ্রামের বাড়ী সাতক্ষীরার আশাশুনি থানায়। সেখানে কাটিয়েছেন তার শৈশব কৈশোরে দিনগুলি। শনিবার সকাল ১০টায় জানাযা অনুষ্ঠিত হল। জানাযা পূর্ব সমাবেশ ই.বি শিক্ষক কর্মকর্তাসহ শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য করলেন। হাজার হাজার ছাত্রজনতা জানাযায় উপস্থিত হয়ে শহীদের শাহাদাত কবুলের প্রার্থনা করলেন। জানাযা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে করে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন শহীদ রফিক। সে ফিরে আসবেন না আর কোন দিন প্রিয় ক্যাম্পাসে। হাস্যোজ্জল চেহারা দিয়ে মাতিয়ে রাখবেন না বন্ধুদের, জনশক্তিদের। অশ্রুসিক্ত নয়ন বুকফাটা কান্না, আর ভালবাসা দিয়ে বিদায় দিলেন শেষ বারের শহীদের দীর্ঘ দিনের সাথীরা। এভাবেই রফিক চলে গেলেন চিরদিনের মত। আমাদের জন্য রেখে গেলেন তাঁর অপুর্ণ স্বপ্ন। বাস্তবায়নের দায়িত্ব। আল্লাহপাক তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন আমাদেরকে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখক ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ।

www.pathagar.com

স্মৃতির দর্পন

সুজাউদ্দীন জোয়ার্দ্দার

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে "শহীদি প্রেরণা" মুমিন জীবনের জন্য সামনে চলার পথে এক দুর্নিবার স্পন্দন, যা আন্দোলনের মুল সত্তার গতিধারা নিয়ন্ত্রণে চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করে। যুগে যুগে নবী-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের পথ সহ ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায় এ কথাটি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষনা করেছে। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিটি শহীদি অধ্যায়ের সোনালী সোপানও একই সূত্রে গাঁথা। সেই সোনালী অধ্যায়ের পাতায় শহীদ রফিকুল ইসলাম নিজেকে স্থান করে নিয়ে ধন্য করেছেন জীবনকে, পৌছে গিয়েছেন জীবন পথের সঠিক ও নির্ভুল এবং চূড়ান্ত মঞ্জিলে।

দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ভেজাল ইসলামী শিক্ষার লালন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠুক এটা কখনও মনে প্রাণে গ্রহন করতে পারেনি ইসলাম বিরোধী স্বার্থান্বেষী মহল। তথাকথিত সর্বহারার স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত অত্র এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবে এমনটি ভাবতে ও তারা কষ্ট পায়। তাদের অভিপ্রায় ফুৎকার দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে নিভিয়ে দিয়ে গড়ে তুলবে মানব রচিত বস্তাপঁচা বস্তুবাদী জড়বাদী ও সুবিধাবাদী মতবাদের চারণক্ষেত্র রূপে। কিন্তু তাঁদের এই অভিপ্রায় এ বাঁধ সাধে ইসলামী আন্দোলনের অকুতভয় কাফেলা ইসলামী ছাত্র শিবির। ফলে বিশ্বব্যাপী সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়

www.pathagar.com

আদর্শিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে আদর্শিক লড়াইয়ে চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে নির্মম সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয় ইসলাম বিরোধী স্বার্থান্বেষী মহল। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সূচিত হয় একের পর এক ট্রাজেডী যুক্ত অধ্যায়। যে ট্রাজেডীর স্বীকার হন শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন, শহীদ আমিনুর রহমানসহ ৫ জন, শহীদ রফিকুল ইসলাম-ই ছিলেন আমার একমাত্র নিকটতম পরিচিত মুখ যার অনেক স্মৃতিময় অধ্যায় আমার জীবনের সাথে জড়িত। তার অনেক কিছুই আজ স্মৃতির অন্তরালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তবে ভাবাবেগ নয় বরং নিকটতম প্রিয়জনের কিছু স্মৃতিকে স্মরণ করতেই কলমের আঁচড়ে দু কথা লিখতে হচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১০ই আগষ্ট এরপর থেকে কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকে সংগত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সকল দায়িত্বশীলদের সাথে নিকটতম সম্পর্কের সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয় যা পুর্বে ছিল না। কারণ তার পূর্বে সাংগঠনিকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপালন করেছি। কুষ্টিয়ায় এসেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সেক্রেটারী বাদে যে কজন দায়িত্বশীলের সাথে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল শহীদ রফিকুল ইসলাম তার মধ্যে অন্যতম। হাস্যজ্জল চেহারা অমায়িক মার্জিত ব্যবহার আর মেহমান দারীর প্রতি দায়িত্ববোধই এই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার সেতু বন্ধন রচনা করেছে। ক্যাম্পাসে গিয়ে সাদ্দাম হলের দোকানগুলোর সামনে দাড়াতেই রফিক ভাই এর অভ্যর্থনা– এই জেলা সভাপতি এসেছে বসতে দেন, সুজা ভাই কি খাবেন বসেন। পাশাপাশি করমর্দন ও আলিঙ্গন-এই ছিল যার চরিত্রের পুষ্পিত দর্পন তাকে কখনও ও হৃদয় থেকে মুছে দেয়া যায় ক্ষনিকের জন্যও? হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে দিয়ে ভালবাসার মাধ্যমে যিনি জয় করেছেন আমাদের হৃদয়কে সেই আবেগ আর ভালবাসার প্রতি অবিচার করে চলেছি কিনা জানিনা, তবে শাহাদাতের পর বারবার মনে হয় "রফিক ভাই" আপনার এই মার্জিত আচরণের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে সার্বিক মোয়ামেলাতের মাধ্যমে ইনসাফপূর্ণভাবে প্রতিত্তোর করতে পারিনি, অপরদিকে দ্বীন কায়েমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবন দিয়ে যে অসমাপ্ত কাজ আমাদের জন্য রেখে দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন সেই কাজের আঞ্জাম কতটা দিতে পারছি তাও আত্মসমালোচনার বিচারে আসামীর কাঠগড়ায় দায়বদ্ধ রয়েই গেছি বলে মনে হয়। যা হোক শহীদ রফিক ভাই জীবন দিয়ে যে প্রেরণায় আমাদের নতুন করে আর একবার জাগিয়ে দিলেন সেই দিক থেকে ও তো তার কাছে ঋনের দায়ে আবদ্ধ হয়ে আছি বলে মনে হয। এ ধরনের মর্মপীড়ার কারণ শুধু একটায় যেন মহান আল্লাহ পাক তার অপার করুনায় ও অনুগ্রহে শহীদের সাথী হিসাবে আমাদের মত গুনাহগার অধম বান্দাদের ক্ষমা করে তার প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করে নেন। শহীদ রফিক ভাইকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনের গতিপথ থামিয়ে দেবার অভিপ্রায় যাদের ছিল সেই হিংস্র হায়েনারা কি একবারও ভেবেছিল তাদের এই মহাপরিকল্পনা শুধু

www.pathagar.com

চরমভাবে ব্যর্থই হয়নি বরং ইসলামী আন্দোলনের গতিপথ আরো অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে তাদের অজস্র পরিকল্পনা গ্রহণ করার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যার বাস্তবতা আমরা এখনও এভাবেই দেখি যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথ আরো নিষ্কন্টক হয়েছে গতি আরো বেশী সঞ্চারিত হয়েছে, শহীদ রফিকের অজস্র সাথীরা শহীদি তামান্নায় উজ্জীবিত হয়েছে আর খুনীরা পলায়নপর জীবন যাপন করছে বলে শুনতে পাই। এ থেকেও কি শেখার কিছু নেই? তাইতো মহান আল্লাহ পাকের ঘোষনা– অর্থাৎ তারা চায় আল্লাহর দ্বীনের আলোকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে আর মহান আল্লাহ তার এই আলো-কে প্রজ্জ্বলিত করবেন-ই তাদের জন্য যতই যন্ত্রনা দায়ক হোক না কেন?

এভাবে সত্য মিথ্যার দ্বান্দ্বিক যুদ্ধে আল্লাহর পরিকল্পনায় ইসলামী আন্দোলন তার গতিপথ সঞ্চারিত করে পৌছে যাবে কাংখিত মঞ্জিলে। আর তখন-ই শহীদ রফিকের ন্যায় অসংখ্য শহীদ ভাইদের জীবন বিলিয়ে দেয়ার সোনালী ইতিহাসের সার্থকতা খুজে পাবে তার উত্তরসুরীরা।

লেখক ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, কুষ্টিয়া জেলা শাখা।

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আওয়ামী দুঃশাসনের খন্ড চিত্র

মোঃ জিল্লুর রহমান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ একটি নাম, একটি আবেগ। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর নিরন্তর সংগ্রাম এবং চেষ্টার ফসল। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পরপরই যাত্রাপথেই হোচট খেয়ে সময়ের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতে চলেছে আমাদের স্বপ্নের এই বিশ্ববিদ্যালয়। সন্ত্রাস আর অসৎ উদ্দেশ্য সাধনই এর মুল লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজিই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের মূল কারণ। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বার বার টানা হেছড়া এবং কিছু প্রভাবশালী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে তা হয়ে ওঠেনি। প্রশাসনের ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও রাজনীতির কারণে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে আন্দোলন শুরু করে। প্রথম প্রথম কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হলেও পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের তীব্রতায় আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এভাবে একদিন ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি স্থায়ী রূপ নেয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কর্তৃক সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ছিল না। বরং তা ছিল তাদের আদর্শিক ধারাবাহিকতা। বিগত আওয়ামী আমলে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদ হয়েছে রক্তাক্ত। মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ছিলনা, ছিলনা স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি।

www.pathagar.com

দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও সন্ত্রাসে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মানবতা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও তার ব্যতিক্রম নয়। আওয়ামী আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত কিছু অনিয়ম ও সন্ত্রাসের খণ্ড চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

৯ জুলাই ১৯৯৬ প্রশাসনিক পদ সমূহে অবৈধ ভাবে দলীয় লোক নিয়োগ ও শেখ মুজিবের ছবি টাঙ্গানোকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ (শা-পা)র নেতা-কর্মীরা দুগ্রুপে বিভক্ত হয়ে অতর্কিতভাবে ভিসি এবং রেজিষ্ট্রার অফিস আক্রমন করে ব্যাপক ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে ভবনের ৭ জন কমকর্তা ও কর্মচারী শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত হন। (দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম)

২৩ জুলাই ১৯৯৬ ছাত্রলীগ ছাত্রদলের উপর হামলা করে। এতে ৫-৬ জন নেতা কর্মী আহত হয় যা জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৫সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের দুজন সমর্থকের মধ্যে হাতা-হাতি হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় শিবির সভাপতি আসাদুজ্জামান কয়েক জন নেতাকর্মী সহ ই-বি মেইন গেটের বাইরে মাগরিব নামাজ আদায় শেষে মেইন গেটে পৌছা মাত্র পূর্ব থেকে অবস্থান নেওয়া সন্ত্রাসী হারুন (বর্তমানে আইন অনুষদের শাখা কর্মকর্তা) এর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের সশস্ত্রকর্মীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কিন্তু গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। এমতাবস্থায় তিনি কর্মীদের ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের শান্ত করতে উদ্যত হলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তাঁকে অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে এলে ছাত্রলীগের হামলায় রফিকুল ইসলাম, আবু জাহের, মিজানুর রহমান সহ আরো ২০-২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। (ইত্তেফাক, ইনকিলাব ও জাতীয় দৈনিক সমূহ)

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ শিবির সভাপতি আসাদুজ্জামান সহ ২০-২৫ জন নেতা কর্মীকে আহত করার প্রতিবাদে ছাত্র শিবির মিছিল শেষে প্রধান গেটে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। ঐ সময় ছাত্রলীগ এলাকার নিষিদ্ধঘোষিত চরমপন্থীদের মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে জড় করে প্রধান গেটসহ তিন গেট দিয়ে একযোগে হামলা চালায়। বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত ছাত্রলীগ ও বহিরাগত সন্ত্রাসীরা এ সময় ষ্টেনগান, কাটারাইফেল, এলএমজি ও বন্দুক দিয়ে গুলি বর্ষণ করতে করতে ক্যাম্পাসে প্রবেশের প্রচেষ্টা চালায়। এতে আবুল কালাম মজুমদার, মাহমুদ হাসান, আমিনুর রহমান, মোশাররফ হোসেন, আনোয়ার হোসেন, মনিরুজ্জামান, মাসুদ, মনিরুল ইসলাম, মামুনুর রশিদ, শহীদ, হাসান ওবায়েদ, এনায়েত, তাজুল ইসলাম, ওবায়েদ, মুজিব, শফিকুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলামসহ প্রায় ৩০ জন শিবির নেতা-কর্মী গুলি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি বর্ষন করতে করতে গেট ভেঙ্গে শহীদ জিয়াউর রহমান হল দখলের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এ হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক জামিনুর রহমান ও ক্যাম্পাস সভাপতি মোস্তফা জামান সহ ২০ জন নেতা কর্মী মারাত্মক আহত

www.pathagar.com

হয়। এসময় ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া পুলিশের এসপি যথাক্রমে আবু বকর সিদ্দীক ও মাহফুজের নেতৃত্বে দুই প্লাটুন পুলিশ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়। তারা সন্ত্রাসীদের পরিবর্তে নিরস্ত্র শিবির কর্মীদের উপর ১২ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বিপুল উদ্দীপনায় নিরস্ত্র শিবির নেতা ও কর্মীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এখানে আব্দুল হান্নান, নাজিম উদ্দীন, বসীর উদ্দীন, বদরুল আলম ও আব্দুল মালেক সহ আরো অর্ধশতাধিক গুলিবিদ্ধ হন। তাদের দ্বিতীয় দফার হামলা বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে। এরপর পুলিশ ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। দীর্ঘ ৪ ঘন্টা সংঘর্ষের সময় পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয় ও পক্ষপাত মূলক ভূমিকা পালন করে। পরে সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রদের হল ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিশি প্রহরায় কয়েকটি বাস রুগী নিয়ে ঝিনাইদহ যাওয়ার পথে সন্ত্রাসীরা পুনরায় হামলা চালায়। পুলিশ প্রশাসন ও শিক্ষকদের অনুরোধেও খুনী চক্রের মন গলেনি। পরবর্তীতে আহতদেরকে কুষ্টিয়া মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ঘুরে ঝিনাইদহ পাঠানো হয়। ঝিনাইদহ থেকে ঢাকায় পাঠানোর পথে আল-কোরআন বিভাগের মেধাবী ছাত্র (পরবর্তীতে ফল প্রকাশ হয় সেখানে যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়) শিবির নেতা আমিনুর রহমান শাহাদত বরণ করেন। উল্লেখ্য দুপুরের ঘটনায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হারুন শিবির কর্মীদের উপরে ককটেল নিক্ষেপ করতে গিয়ে ককটেল তার হাতে বিস্ফোরিত হলে তার হাতে আঙ্গুল উড়ে যায়। (উক্ত হারুন এখন বিজ্ঞান অনুষদের শাখা কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আছে)।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সূত্র অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের বার বার অনুরোধে সাড়া দিয়ে সকাল থেকে পুলিশ প্রশাসন সক্রীয় থাকলে এত বড় ঘটনা ঘটত না। প্রশাসনের এই ভূমিকা ও অসহযোগীতার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যবর্গ সকল প্রভোস্ট ও হাউস টিউটর একযোগে পদত্যাগ করেন। (ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজার্ভার সহ সকল জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক)

৮ জানুয়ারী ১৯৯৭ইং ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাদের কেন্দ্রীয় সভাপতির উপস্থিতিতে বিনা উস্কানিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্টিনে খাবার খাওয়া অবস্থায় শিবির কর্মী আব্দুল্লাহ আল মামুন রানার উপর হামলা করে মারাত্মক আহত করে। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় চিকিৎসারত ছিলেন। (ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দৈনিক সফগ্রাম)

৫ মে ৯৭ইং তারিখে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী মামুন ও বহিরাগত সন্ত্রাসী সাকি আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে লাইব্রেরী কর্মকর্তার নিকট ৫০ হাজার টাকার চাঁদা দাবী করে এবং তার রুমে টেবিলের উপর ৬ রাউন্ড গুলি রেখে আসে। (দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা)

৭ মে ৯৭ইং তারিখে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মিছিল ও সমাবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতে বাধা দিলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদেরকে

www.pathagar.com

লাঞ্ছিত করে।

১৯৯৬-১৯৯৭ শিক্ষা বর্ষে ছাত্রলীগ ক্যাডার এসকান্দার আলীকে ভর্তির উদ্দেশ্যে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ভর্তি হওয়ার সময় সংগঠনের ভূমিকার কারণে বাদ পড়ে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া গৃহীত হলেও আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের চাপের মুখে তা সম্ভবপর হয়নি।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবির ধর, হত্যা কর, জবাই কর প্রভৃতি উত্তেজনাকর স্লোগান দিয়ে মিছিল ও সমাবেশ করলে ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে স্মারক লিপি প্রদান করা হলেও প্রশাসনের পক্ষ এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ছাত্রলীগের জোহা গ্রুপ ও হারুনগ্রুপের মধ্যে অভ্যন্তরীন কোন্দলের জের হিসাবে বন্দুক যুদ্ধ সংঘটি হয়। এতে ক্যাম্পাসে এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। পুলিশের সামনে, প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করলেও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। (ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দৈনিক সঙগ্রাম)

২৩ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী মামুন সহ আরো কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে শিবির কর্মী বায়েজীদের উপর হামলা চালায়।

৩১ অক্টোবর ৯৭ইং সাদ্দাম হলের বার্ষিক প্রীতিভোজ উপলক্ষে ছাত্রলীগ ৩০টি অবৈধ কার্ড দাবী করে। কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করায় প্রীতিভোজ বানচালের উদ্দেশ্যে মেইন গেটে ছাত্রলীগ রাত ৮.০০ টার গাড়িতে নিরীহ সাধারণ ছাত্রদের উপর নগ্নভাবে হামলা চালায়। এতে ৪ জন সাধারণ ছাত্র আহত হয়। এ ছাড়াও ছাত্রলীগ হল লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

৯ নভেম্বর ১৯৯৭ইং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী, ক্যাম্পাসে সকল সন্ত্রাসের অন্যতম হোতা খুরশিদ হাসান মামুন পুলিশের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা পড়লেও আওয়ামী পন্থী শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতাদের চাপের মুখে পুলিশ মামুনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। (ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দৈনিকসঙগ্রাম)

৭ মার্চ '৯৮ইং দুপুর ১ টার দিকে শিবির নেতা খন্দকার এ বি এম কবীর উদ্দীন সাংগঠনিক কাজ শেষে কুষ্টিয়া হতে বাস যোগে মেইন গেটে নামলে আগে থেকে ওত পেতে থাকা ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমন চালায়।

৮ মার্চ ৯৮ ইং শিবির নেতা খ. কবীর উদ্দীন এর উপর হামলার প্রতিবাদে ছাত্র শিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর ছাত্রলীগ কর্মীরা হামলা চালালে কয়েকজন নেতা-কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়। (ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম)

৯ মার্চ ৯৮ইং ছাত্রলীগের বহিরাগত ক্যাডাররা দুই হলের মাঝখান দিয়ে শহীদ জিয়াউর রহমান হল দখলের উদ্দেশ্যে নামাযরত শিবির কর্মীদের উপর হামলা চালায়। (দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা, দৈনিক সংগ্রাম)

www.pathagar.com

২ জুন ৯৮ইং তারিখে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির বাছাই পর্ব চলাকালীন আনুমানিক ৯.৩০ মিনিটে আওয়ামী ছাত্রলীগের কতিপয় সন্ত্রাসী তাদের দলীয় ছাত্র ভর্তি করার জন্য অবৈধ চাপ দেয়। এক পর্যায়ে জোর পূর্বক খেলা বন্ধ করে দেয় ও খেলার সরঞ্জামাদি ছিনিয়ে নেয় এবং খেলার মাঠে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। যাতে বিচারক মন্ডলী নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যথাযথভাবে খেলোয়াড় বাছাই করতে বাধার সম্মুখীন হয়।

২২ জুলাই ১৯৯৮ শিবির নেতা নুরুল ইসলাম খোকন ও জিয়াউর রহমান বাসে উঠার উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান গেটে গেলে পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা চিহ্নিত সন্ত্রাসী হান্নান, পিন্টু লাল দত্ত, কেরামত, ডাবলুসহ আরো অনেকে তাদের উপর রামদা, কিরিজ, কাটা রাইফেলসহ মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। এ সময় জিয়াউর রহমান ও খোকন মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। এ সংবাদ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে শিবির কর্মীরা সাধারণ ছাত্রদের সাথে নিয়ে শিবির নেতাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসে। এ সময় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষন করে পালিয়ে যায়। এরপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা প্রধান গেট, শেখপাড়া বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে বাসে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক শিবির কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের মারধর ও নাজেহাল করে। (ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম)

২৩ জুলাই ১৯৯৮ইং তারিখে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তাদের ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ঠিক তখনই বেলা আনুমানিক পৌনে ১টায়র সময় ছাত্রলীগ ইবি সভাপতি জহিরুল ইসলাম মিল্টনের নেতৃত্বে শতাধিক বহিরাগত অস্ত্রধারীদের নিয়ে অনুষদ নিচে অবস্থানরত শিবির নেতা কর্মীদের উপর হামলা চালায়। এতে একজন নির্মাণ শ্রমিকসহ কয়েকজন আহত হয়।

২৪ জুলাই ১৯৯৮ইং গাড়াগঞ্জ বাস ষ্ট্যান্ডে দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় শিবির নেতা মোঃ ইলিয়াসকে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী মনিরুলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মারাত্মক জখম করে। উক্ত ইলিয়াস আজও ঐ যখম জনিত অসুস্থতায় ভুগছেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের দমন না করে সন্ত্রাসীদের কাছে মাথানত করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। উল্লেখ্য সন্ত্রাসী মনিরুলকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়ে বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা কর্মকর্তা হিসাবে চাকুরী দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

৯ আগস্ট ৯৮ইং তারিখে ছাত্রলীগ ক্যাডার ক্যাম্পাসে শতাধিক অপকর্মের হোতা খুরশিদ জাহান মামুন কুষ্টিয়া থেকে ক্যাম্পাসে আসার পথে মাদকাশক্ত অবস্থায় বাসের গেটে ঝুলে আসার সময় পড়ে গিয়ে বিপরীত গামী একটি ট্রাকের চাকায় পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী, হেলপার ও ড্রাইভারের স্বীকারোক্তি মতে এবং নিহতের বাড়ী থেকে এটাকে নিছক একটি সড়ক দূর্ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ছাত্রলীগ শিবিরকে জড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে চোরা গুপ্তা হামলা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। স্বাভাবিক মৃত্যুকে সামনে রেখে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

৪৮ ঘন্টা ধর্মঘট আহবান করে এবং মিথ্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ছাত্রশিবিরের তৎকালীন সভাপতি-সেক্রেটারীসহ ৬ জন নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করে। (ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রামসহ জাতীয় ও স্থানীয় সকল দৈনিক সমূহ) ১১ আগস্ট ৯৮ইং মামুনের সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ আহুত ৪৮ ঘন্টা ধর্মঘটের প্রথম দিনে সকাল থেকেই ছাত্রলীগের চুরাগুপ্তা হামলায় ১০ জন শিবির নেতা কর্মী ও সাধারণ ছাত্র আহত হয়। সকাল থেকেই ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে পুলিশের সামনেই সন্ত্রাসী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। বেলা পোনে এগারটার দিকে শিবির সন্দেহে তোবারক ও ওমর ফয়সালসহ ৩ জন সাধারণ ছাত্রকে মেইন গেটে বাস থেকে নামার সময় প্রচন্ড কিল ঘুশি ও বেদম প্রহার করে রাস্তায় ফেলে দিলে কর্মচারীরা উদ্ধার করে। বেলা ১২ টার দিকে একই স্থানে ছাত্র লীগ শিবির নেতা সৈয়দ আহমেদ এর উপর অতর্কিত হামলা করে এবং তাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে। সন্ত্রাসীরা আহতদের নিকট থেকে টাকা পয়সাসহ ব্যাগে রক্ষিত জিনিস পত্র ছিনিয়ে নেয়। বেলা ২.১৫টায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী শেখপাড়া বাজারে স্থানীয় মেম্বার ও জামাত নেতা আমিনুল ইসলামের বড় ছেলে শিবির কর্মী হাসানুল বান্না চপলের উপর ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে মারাত্মক জখম করে। চপল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে শেখপাড়া বাজারে পৌছালে সন্ত্রাসীরা তাকে একা পেয়ে ঘিরে ধরে এবং রামদা ও হাতুড়ি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্মম ভাবে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় বাজারের লোক জন তাকে উদ্ধার করে। পরে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করার পর আশংকাজনক অবস্থায় ঢাকা স্থানান্তর করা হয়। একই সময়ে দাড়ি-টুপি পরা ২ জন পথচারীকে ছাত্রলীগ লাঞ্ছিত করে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে।

২৯ আগস্ট ৯৮ তৎকালীন শিবির সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম সাংগঠনিক কাজে কুষ্টিয়া আসেন এবং সাংগঠনিক কাজ শেষে জোহরের নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের কাছে ওয়ারেন্ট দেখতে চাইলে পুলিশ কর্মকর্তা জানান উপরে নির্দেশে বাধ্য হয়েই তাদেরকে এটা করতে হয়েছে। (দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা, দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাব)

৩১ অক্টোবর ৯৮ইং শিবির নেতা নজরুল ইসলামের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শিবিরের বিশাল মিছিলের উপর ছাত্রলীগ ও তাদের বহিরাগত সন্ত্রাসীরা ভারী আগ্নেয়াস্ত্রসহ ঝাপিয়ে পড়ে। হামলায় গুলি বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন শিবির নেতা আল-মামুন, নাজিম উদ্দীন, এমদাদুল্লাহ, সাইফুল ইসলাম ও রাইসুল ইসলাম রাসেলসহ আরো অনেকে। শিবির কর্মীরা আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে আসলে পুলিশের এ.এস.পি আয়ুব আলী ও এস আই ছামছুল হুদার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী শিবির কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের উপর বেপোয়ারা গুলি বর্ষন করতে থাকলে শিবির কর্মী ও ছাত্র জনতা সাদ্দাম হলে আশ্রয় গ্রহণ

www.pathagar.com

করেও পুলিশের গুলি থেকে রেহায় পাইনি। পাশাপাশি ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা পুলিশের সাথে একযোগে গুলি করতে করতে সাদ্দাম হলের দিকে অগ্রসর হয়। এতে হল গেটের সামনে মহসীন কবীর, আহসানুল কবীর মুক্ত সহ ২০ জন মারাত্মক ভাবে গুলি বিদ্ধ হয়। মারাত্মক ভাবে গুলি আল-মামুন ও নাজিম উদ্দীন, এমদাদুল্লাহ ও সাইফুল ইসলামকে ঝিনাইদহ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর পর শিবির নেতা মহসিন কবীর শাহাদাত বরণ করেন। অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তারের পরামর্শক্রমে আল মামুন, সাইফুল, নাজিম উদ্দীন ও এমদাদকে ঢাকাতে স্থানান্তর করা হয়। পর দিন ১-১১-৯৮ইং তারিখে বেলা আনুমানিক ১১.২০ দিকে শিবির নেতা আল মামুন শাহাদত বরণ করেন। উল্লেখ্য এ এস পি সার্কেল (কুষ্টিয়া) আয়ুব আলী এস আই ছামছুল হুদা ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালন কালে ম্যাজিষ্ট্রেট রেজাউল করীমকে শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করে জোরপূর্বক গুলি করার অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর করান। এতে বাধা দিলে ক্যাম্পাসের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক পুলিশ কর্তৃক শরীরিক ভাবে লাঞ্চিত হন। (বাংলাদেশ বার্তা, ইত্তেফাক, ইনকিলাব, সংবাদ, সংগ্রাম, ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ)

২০ ডিসেম্বর ৯৮ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্রশিবির কর্মী জিল্লুর রহমান একাডেমীক কাজে ক্যাম্পাসে অবস্থান কালে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তার উপর ন্যাক্কারজনক হামলা চালায়। এতে তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শিবির কর্মীরা আহত জিল্লুর রহমানকে উদ্ধারে এগিয়ে আসলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাদের উপর গুলি করতে করতে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুনরায় সংগঠিত হয়ে দুই হলের মাঝ খান দিয়ে এবং আনন্দ নগর এর পার্শ্ব দিয়ে (যেখানে এখন মুজিব হল হয়েছে) একযোগে হামলা চালায়। এতে শিবির নেতা রাইসুল ইসলাম রাসেল, আবুল কালাম আজাদ, শফিকুল ইসলাম স্বপনসহ ২০-২৫ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়।

২৯ ডিসেম্বর ৯৮ বিশ্ববিদ্যালয় হল বন্ধ থাকায় শিবির কর্মীরা ম্যাচে অবস্থান কালে ইফতারী গ্রহণের ঠিক পূর্বমূহুর্তে ছাত্রলীগ সেক্রেটারী আঃ হান্নানের নেতৃত্বে ম্যাচের (জনি ম্যাচ) দুদিক থেকে আক্রমণ চালায়। ম্যাচে অবস্থানরত শিবির কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরীহ বি এন পি এবং জামাতকর্মীদের বাড়ীতে আক্রমণ চালিয়ে আবু তালেব মন্ডল, আঃ মান্নান, কামাল, বকুলসহ ৩০-৪০ জনকে মারাত্মক ভাবে গুলি বিদ্ধ করে। তাদেরকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতারে প্রাথমিক ভাবে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ৪ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।

২৭ জানুয়ারী ৯৯ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে আওয়ামী পুলিশ নিরীহ শিবির কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিবির কর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালায় এবং শিবির নেতা আঃ মালেককে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা হত্যা মামলায় চালান দেওয়া হয়। পরে রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো

www.pathagar.com

হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত মামলায় আঃ মালেক বেকুসুর খালাস পান।

২০ ফেব্রুয়ারী ৯৯ইং তারিখে অবৈধ ভাবে দলীয় লোকদের চাকুরীর নিয়োগের দাবীতে ছাত্রলীগ কর্মীরা ভিসি অফিস ভাংচুর করে। ছাত্রশিবির এর পক্ষ থেকে এ ঘটনার বিচার দাবি করে স্মারক লিপি প্রদান করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

৯৯ সালের মার্চ মাসের নতুন বৎসরের প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় ডায়েরী থেকে ইবি প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য ন্যাক্কারজনক ভাবে বাদ দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্রশিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সহ শিক্ষক সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এক পর্যায়ে ডায়েরীতে প্রতিষ্ঠাতার নাম ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সংযোজনের দাবীতে ৬ মার্চ থেকে ৭২ ঘন্টা হরতাল আহবান করা হয়। এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশী হামলা চালান হয় এবং ছাত্রদল নেতা কাজল সহ-৪-৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিনের এ অচল অবস্থা চলার পর কোন সমাধান ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ভিসি কায়েস উদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বের সমস্ত ঐতিহ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলগুলো বন্ধ রেখে ছাত্র সংগঠনগুলো ও শিক্ষক সমিতির পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্তকে উপক্ষো করে কড়া পুলিশ ও বিডি আর প্রহরায় ১৭ই এপ্রিল ৯৯ থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু করে। উল্লেখ্য অধিকাংশ বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা বিভাগীয় সমন্বয়কারীদের অনুপস্থিতিতে ম্যাজেষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে জোরপূর্বক তালা ভেঙ্গে প্রশ্নপত্র বের করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দিয়ে পরীক্ষা নিতে বাধ্য করা হয়।

২৬ সেপ্টেম্বর ৯৯ইং গত ১৯৯৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের বহিরাগত সন্ত্রাসী বর্বোচিত হামলায় শাহাদত বরণকারী শহীদ আমিনুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামী ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে এক বিশাল শোক র‍্যালী ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ শেষে শিবির কর্মীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে গন্তব্য স্থলে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ও বহিরাগত আর্মস ক্যাডাররা শিবির কর্মীদের উপর অতর্কিত গুলি বর্ষন করে।

২২ নভেম্বর ৯৯ইং বিশ্ববিদ্যালয় দুইজন ছাত্রের মাঝে কথা কাটা কাটির মত তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ ছাত্ররা ১২টার দিকে যখন ক্যাম্পাসে হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে করে ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া যাচ্ছিল ঐ সময় ক্যাম্পাসে পার্শ্ববর্তী ভাটই বাজারে ছাত্রলীগ পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে গাড়ীতে হামলা চালিয়ে সাধারণ ছাত্রসহ শিবির কর্মীদের আহত করে। আহতদেরকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়-রুহুল আমীন, সাজাহান, মশিউর ও আকরাম। উক্ত ঘটনার সংবাদ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং

www.pathagar.com

পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হতে বাধা প্রদান করে। এ পরিস্থিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক সেন্টিমেন্টকে তোয়াক্কা না করে ভিসি কায়েস উদ্দীনের নির্দেশে পুলিশ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর চড়াও হয় এবং ২০ রাউন্ড গুলি বর্ষন করে। এতে আইন বিভাগের ছাত্র হাসানুল বান্না চপল গুলি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

২৮ সভেম্বর ৯৯ইং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলার দোহায় দিয়ে ছাত্রশিবিরের নেতা কর্মীদেরকে পুলিশী হয়ারানি করা হয়। এর অংশ হিসেবে প্রতি রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এবং ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া শিবির নিয়ন্ত্রিত ম্যাচগুলিতে প্রতি রাত্রেই পুলিশী তল্লাসী চলতে থাকে। অবশেষে ২৮-১১-৯৯ দিবাগত রাত্রে রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী জনি ম্যাচ হতে ম্যাচ সভাপতি আবদুল্লাহ ইবনে নিজাম সহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। একই সময় পুলিশ মদনডাঙ্গা কামাল ম্যাচ থেকে ৪ জন সাধারণ ছাত্র গ্রেফার করে এবং ঝিনাইদহ শহরে বিভিন্ন ম্যঅচে হানা দিয়ে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। সময় পুলিশ দাড়ি-টুপি ধারী ছাত্রদেরকে শিবির হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের সাথে দূর্ব্যবহার ও নির্যাতন করে।

১৬ এপ্রিল ২০০০ হাদীস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও কাচেরকোল ইউনিয়নের সভাপতি আহসানউল্লাহকে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তার লজিং বাড়িতে গিয়ে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে আসে।

২১ এপ্রিল ছাত্রলীগ ক্যাডাররা শিবির নেতা ছাইদুর রহমানকে মারাত্মকভাবে আহত করেন।

১মে ২০০০ তৎকালীন শিবিরের সভাপতি ও সেক্রেটারী একটি প্রোগ্রামে গেলে মামুনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রোগ্রাম বানচাল করে, উস্কানীমূলক স্লোগান দেয়া এবং প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে করে শিবির নেতাদের খুঁজতে থাকে।

৪মে ২০০০ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ধাওয়াপাল্টা ধাওয়ায় ৫ জন আহত হয়। বেলা ১১.৩০ টার দিকে ছাত্রলীদের এক জংগী মিছিল বের করে এবং ছাত্রদল নেতা কর্মীদের খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে ছাত্রদল সভাপতিসহ কয়েকজনকে ধাওয়া করলে তারা নতুন অডিটরিয়ামের পাশে অবস্থান করে। ছাত্রলীগের মিছিলটি ক্যান্টিনের সামনে পৌছালে ছাত্রদল নেতা লিটনকে একাকী পেয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। এই ঘটনার পর ছাত্রদল পুনরায় সংগঠিত হয়ে ছাত্রলীগকে ধাওয়া করলে তারা মেইন গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে হতে হটে যায়। এই সময় উভয় দলের মধ্যে ৩ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। উক্ত ঘটনায় ছাত্রলীগ কর্মী মিলন এবং ছাত্রদল কর্মী লিটন, আমিন সহ ৫ জন আহত হয়।

১৪মে ২০০০ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দলীয় কায়দায় এক জন নামকরা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীকে ভর্তি পরীক্ষা

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ ছাড়ায় ভর্তি সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিভাগের অপেক্ষমান তালিকায় ৭৩ নং স্থান অধিকারী মোঃ আলমগীর হোসেন তার ফরম উত্তোলন করে এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোঃ আনিসুর রহমান বিকাশকে সেই ফরমে নিজের কাগজ পত্র সংযুক্ত করে বিভাগীয় সভাপতির স্বাক্ষর নকল করে ভর্তি করান। সরকারী ছাত্র সংগঠনের সাথে এই গভীর চক্রান্তের সাথে কিছু প্রভাবশালী আওয়ামী শিক্ষক ও কর্মচারীর প্রত্যক্ষ হাত ছিল। পরে জালিয়াতি ধরা পড়লে ভর্তি বাতিল হলেও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোন শাস্তি ব্যবস্থা করা হয়নি।

২৪মে ২০০০ ইং তারিখে দিবাগত রাত্রে ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের আই.টি বিভাগের ল্যাবে ৩১টি কম্পিউটারের মধ্যে ৩০টি কম্পিউটারের প্রসেসর ও র‍্যাম চুরি হয়ে যায়। বিজ্ঞান অনুষদের প্রধান কলাপসিবল গেট এবং ৪র্থ তলার ল্যাব গুলোর কলাপসিবল গেট তালাবদ্ধ থাকার পরেও এই ধরণের চুরি একই সাথে রহস্য ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এই মর্মে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও দলীয় অসাধু দূর্নীতিপরায়ন সন্ত্রাসী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের যোগসাজসে এই ধরনের ঘটনা ঘটার ফলে দলীয় ব্যানারে কর্মকর্তা কর্মচারীদের রক্ষা করার জন্য তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখে নাই। (দৈনিক সংগ্রাম)

২৬মে ২০০০ কাচেরকোলের ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে শিবির নেতা তুষার ও সাঈদ অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পায়।

২৯মে ২০০০ইং তারিখে দুপুরে ১২.৩০ টায় ছাত্রলীগ সভাপতি ও সেক্রেটারীর নেতৃত্বে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রলীগ কর্মী কর্তৃক ই.বি ক্রিড়া বিভাগের অফিসে অতর্কিত হামলা করে ব্যাপক ভাংচুর ও তান্ডবলীলা চালায়। ক্রীড়া বিভাগের পরিচালককে না পেয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালী করে। তান্ডবে অর্ধলক্ষাধীক টাকার মালামালের ক্ষতি সাধন হয়। কিছুদিন পূর্বে ছাত্রলীগ তাদের মনোনিত ৪ জনের একটি তালিকা ক্রীড়া বিভাগে প্রেরণ করে এবং সে অনুযায়ী ভর্তির জন্য চাপ দেয়। সর্বশেষ ভর্তির শেষ দিনে তাদের পছন্দসই ব্যক্তিদের তালিকা অনুযায়ী ভর্তি না করায় ছাত্রলীগ ক্রীড়া অফিস ভাংচুর করে।

জুন ২০০০ দীর্ঘদিন যাবৎ শেখ মুজিবুর রহমান হল উদ্বোধন করা হলেও তখন পর্যন্ত কোন ছাত্র তোলা হয়নি। কারণ, অবৈধ ভাবে ছাত্রলীগকে সিট দেওয়ার নীল নকসা চলছিল। পরবর্তীতে আওয়ামী পন্থী শিক্ষক দের পরামর্শক্রমে ভিসি শুধুমাত্র প্রথম বর্ষ থেকে ৬০% সিট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং উক্ত পদ্ধতিতেও ছাত্রলীগের মেধা অনুসারে কোন সিট না হওয়ায় অবৈধভাবে ৩০টি সিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন সময়ে নজীরের পরিপন্থী। সাথে সাথে ছাত্র জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দীর্ঘ দিনের অচল অবস্থা নিরসন কল্পে ডান পন্থী শিক্ষকদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে কোন নিয়ম নীতি ছাড়াই ছাত্রলীগকে ৬টি সিট প্রদান করেন।

www.pathagar.com

১ জুলাই ২০০০ সকাল ১১টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা জহুরুল হক হিরুর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেলে কর্তব্যরত ডাক্তার সিরাজুল ইসলামের নিকট প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অবৈধভাবে ঔষুধ দাবি করলে ডাক্তার তাকে ঔষধ দিতে অস্বীকার করায় উক্ত সন্ত্রাসীরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আহত করে। এ সময় মেডিকেল সেন্টারে অবস্থারত অন্যান্য ডাক্তার ও কর্মকর্তা এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় শিক্ষক কর্মকর্তা সকলের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টির হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সন্ত্রাসীদের বিচারের দাবীতে ডাক্তারগণ কর্মবিরতি এবং ভিসির নিকট লিখিত অভিযোগ জানালেও কোন বিচার হয়নি।

০৯ জুলাই ২০০০ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে ব্যাবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক সরফরাজ নেওয়াজ লাঞ্ছিত হন। শিক্ষক সমিতি সহ ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন ও বিচারের দাবী জানালেও এর কোন বিচার হয়নি।

২০ জুলাই ২০০০ইং তারিখে বহিরাগত নিষিদ্ধ পার্টির সদস্য এবং দলীয় সাবেক ক্যাডারদের নিয়ে ছাত্রলীগ অস্ত্রের মহড়া দেয়। ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক দাংগা পুলিশের উপস্থিতিতে মহড়া চালায়। ছাত্রলীগ জঙ্গী মিছিল বের করে এবং প্রশাসন ভবনের প্রবেশ পথে গেটে কর্তব্যরত কর্মচারী সমিতির সভাপতি আতিয়ার রহমান প্রশাসনের নির্দেশে কলাবসেবল গেটে তালা লাগিয়ে দিলে ছাত্রলীগ সভাপতির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র গ্রুপ উক্ত কর্মচারীকে মারাত্মক আহত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করার পর তার অবস্থার অবনিত ঘটলে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

২৮ জুলাই ২০০০ আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের ইন্ধনে পুলিশ ধর্মতত্ত্ব অনুষদের সাবেক ডিন ডক্টর এ.এইচ.এম ইয়াহিয়ার রহমানের কুষ্টিয়াস্থ বাসভবনে তালেবান সন্দেহে হয়রানির উদ্দেশ্যে তল্লাশি চালায়। বিষয়টি ক্যাম্পাসের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

আগস্ট ২০০০ শান্ত ক্যাম্পাসে শত শত ছাত্র ছাত্রীর সামনে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী খোকন, মামুন, মিঠু, সহ চিহ্নিত অস্ত্রধারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সভাপতি নজরুল ইসলাম ও শিবির নেতা রাইসুল ইসলাম রাসেলকে হত্যার উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আকষ্মিক মুহূর্মুহু গুলি ছোড়ে এতে গুলি বিদ্ধ হয়ে মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শিবির নেতা মোহাম্মদুল্লাহ, (যার একটি চোখ গুলির আঘাতে চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে) নূরুল আমিন, জাহাঙ্গীর হুসাইন, রুস্তম সহ আরো অনেকে। পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট ও বিডি-আর এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। উল্লেখ্য ইবি থানার ওসি বাদশা মিয়া ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ না করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ নুরুল আমিন ও জাহাঙ্গীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।

৩১ আগস্ট ২০০০ ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে চাঁদার টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ক্যাডার শাকি, ডাবলু, ও রুমির নেতৃত্বে স্বশস্ত্র একটি গ্রুপ ছাত্রলীগ নেতা

www.pathagar.com

গিয়াস ও বহিরাগত সন্ত্রাসী পিকুলকে ছুরিকাঘাত করে মারাত্মক যখম করে।
অক্টোবর ২০০০ রুহুল আমিন বাবু, ফারুকসহ কয়েকজন কর্মচারীর সাথে সাধারণ ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। এতে সাধারণ ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রসাশন ভবন ভাংচুর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনে অগ্নিসংযোগ করে। এতে কোন ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রলীগের প্রত্যক্ষ মদদে ছাত্র শিবির ও ছাত্রদল নেতাদের উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা দেখিয়ে জননিরাপত্তা আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। উক্ত ঘটনায় প্রায় ৬০ জন আওয়ামী বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ একটি মিছিলে হামলা চালালে প্রায় ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। উল্লেখ্য মিথ্যা মামলায় সবাই বেকসুর খালাস পেয়েছেন।
১০ জানুয়ারী ২০০১ শেখ মুজিবুর রহমান হলে অবৈধ সিটের দাবীতে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রক্টর অফিস ভাংচুর করে।
২৪ জানুয়ারী ২০০১ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে টেন্ডার চলাকালে ছাত্রলীগের বহিরাগত সন্ত্রাসী রফিকুল ও সেলিমকে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে ছাত্রলীগের সভাপতি রফেল ও কুখ্যাত ওসি বাদশা মিয়ার যোগসাজসে সেলিমকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং জব্দকৃত অস্ত্র ফেরত নিতে তদবীর চালায়। কিন্তু বিষয়টি সাধারণ ছাত্র ছাত্রী ও সাংবাদিকদের মাঝে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয় নাই। এ ব্যাপারে থানায় একটি অস্ত্র মামলা হয়। (যার নম্বর ইবি ১৯/ক অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন)
২৩ মার্চ ২০০১ মুজিব হলের অবৈধ সিট প্রদানকে কেন্দ্র করে গত ২২ তারিখে ছাত্রদল কর্তৃক মুজিব হলের অফিস ও শেখ মুজিবের ছবি ভাংচুর করার কারণে তাৎক্ষণিক কোন মামলা দায়ের না হলেও পরের দিন বিকালে মেইন গেট থেকে পুলিশ ৫৪ ধারায় ছাত্রদল সভাপতিকে গ্রেপ্তার করে।
২৪ মার্চ ২০০১ ছাত্রদলের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছাত্রলীগ অতর্কিত হামলা চালালে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এ সময় উভয় দলের মধ্যে ১০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। এতে ছাত্রদলের নেতা মুরাদ, মোমিন, জাহাঙ্গীর, সোহরাব মারাত্মক আহত হয়। এ সময় ছাত্রলীগ সবুজ চত্তর এবং ছাত্রদল প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। বেলা ১ টার দিকে ছাত্রদল ধর্মতত্ত্ব অনুষদের দিকে অগ্রসর হলে ছাত্রলীগ পূনরায় পুলিশের সহযোগীতায় ছাত্রদলের উপর পূনরায় আক্রমন চালায়। এ সময় উভয় গ্রুপই গুলি বিনিময় করে। ঘটনাস্থলে ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাদশা মিয়া উপস্থিত থাকলেও তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। পরে ছাত্রলীগ এক সমাবেশে মিলিত হয়ে ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে। অপরদিকে এই ঘটনার সময় মেইন গেট হতে অস্ত্রসহ তিনজন বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হলেও অদৃশ্য কারণে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
২৮ মার্চ ২০০১ ইং তারিখে ই.বি. থানার পুলিশ ছাত্রদল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার

www.pathagar.com

৩ জন কর্মীকে ক্যাম্পাস পার্শ্ববর্তী ম্যাচ হতে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। উল্লেখ্য ২২ শে মার্চ মুজিব হলে প্রভোস্টের অফিস ও মুজিবের ছবি ভাংচুরের ঘটনায় ই. বি কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের সভাপতি সেক্রেটারী সহ ১৮ জন নেতা কর্মীর নামে জন নিরাপত্তা আইনের মামলা দায়ের করে। এরই প্রেক্ষিতে পুলিশ বুধবার রাতে এই ৩ কর্মীকে গ্রেফতার করে কুষ্টিয়া জেল হাজতে প্রেরণ করে। তবে তাদের নামে কোন মামলা ছিলনা।

২৯ শে এপ্রিল ২০০১ইং তারিখে দুপুর ১২.৩০ টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারী প্রশাসন ভবনে ভিসির অফিস কক্ষে ভিসি প্রফেসর লুৎফর রহমানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শান্তিপূর্ণ বজায় এবং একাডেমিক অভিন্ন বিষয়ে আলাপরত অবস্থায় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারীর উপস্থিতিতে সশস্ত্র ক্যাডার ও সন্ত্রাসীরা উক্ত শিক্ষক বৃন্দকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলায় ভিসি অফিসের দরজা ভেঙ্গে যায়। পরে শিক্ষকবৃন্দ প্রশাসন ভবন থেকে অনুষদ ভবনে যাওয়ার সময় সবুজ চত্বরের মোড়ে প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর, ইংরেজী বিভাগের সভাপতি, ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সামনে আবারো ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা শিক্ষক বৃন্দের নাম ধরে অশ্রাব্য বিশ্রি ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে শিক্ষকদের উপর আক্রমন করতে উদ্যত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষক সমিতি ভিসির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

৫মে ২০০১ ইং তারিখে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সমবেশ ঘটিয়ে পুলিশের সামনে হল দখলের ঘোষণা দেয়। একই দিনে ছাত্রলীগের টেন্টের কাছ থেকে পুলিশ অস্ত্র উদ্ধার করে। একই দিনে দুপুর ২ টার দিকে ছাত্রলীগ টেন্টের পার্শ্বস্ত বিজ্ঞান অনুষদের ১০১ নং কক্ষ হতে পুলিশ ২টি পাইপ গান ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। ইবি থানার পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাদশা মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ এই ব্যাগ ভর্তি অস্ত্র জব্দ করে। এদিকে অস্ত্রগুলো থানা পুলিশ থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রলীগ থানার সাথে ব্যর্থ দরকষাকষি করে।

৮মে ২০০১ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের উত্তর পাশে সিড়ির নিচে বেলা ১টায় ছাত্রলীগের বহিরাগত ক্যাডার মেয়ে নিয়ে ডেটিং করছিল। এই সময় ইমাম সাহেব মসজিদের পবিত্রতার খাতিরে অনত্রে গিয়ে গল্প করতে বলে। উক্ত ক্যাডার ক্ষিপ্ত হয়ে তখন চলে যায়। দুপুর ২টা দিকে ছাত্রলীগ ক্যাডার সেলিম সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ইমামকে মারার জন্য মসজিদ সংলগ্ন তার বাস ভবনে চড়াও হয়। তাকে মারতে উদ্যত হলে নির্মাণ শ্রমিকগণ তাদের হাত থেকে ইমাম সাহেবকে প্রাণে রক্ষা করে। (দৈনিক সংগ্রাম)

৮জুন ০১ইং আওয়ামী পন্থী শিক্ষক, কুখ্যাত ওসি বাদশা মিয়া ও ছাত্রলীগ সভাপতি রফেলের প্রত্যক্ষ মদদে জাসদ ছাত্রলীগ অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদনডাঙ্গার

www.pathagar.com

কামাল ম্যাচে দুপুরে খাবাররত অবস্থায় শিবির নেতা রফিকুল ইসলামকে নির্মমভাবে আহত করে। তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর শাহাদত বরণ করেন। উল্লেখ্য খুনীরা ঘটনা ঘটিয়ে থানাতে এসে ওসি বাদশা মিয়া এবং ছাত্রলীগ সভাপতি রফেলের সাথে উল্লাস করে।

২৩ জুন ০১ প্রশাসনিক ভবনের সামনে নিজ বাস ভবনে যাওয়ার প্রস্তুতি কালে ছাত্রলীগ সভাপতি বি এম রফেল ও সেক্রেটারী মামুনের নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন বহিরাগত সন্ত্রাসী অবৈধভাবে চাকুরীর দাবীতে ১ ঘন্টা ধরে ভিসি ও ট্রেজারারকে গাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখে। ভিসি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের দাবী মেনে নিতে অসম্মতি জানালে সন্ত্রাসীরা ভিসিকে নাজেহাল করে। তারা আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের মনোনীত ২০ জনকে চাকুরী প্রদান না করলে ভিসিকে দেখে নেওয়ার হুমকি প্রদান করে।

এই শেষ নয় আওয়ামী দুঃশাসনে সমগ্র দেশের মত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সেক্টর হয়েছে অনিয়ম ও দূর্নীতির শিকার। ইবির প্রতি ইঞ্চি মাটি তার নিরব সাক্ষী। গাড়ি ক্রয়, লাইব্রেরীর বই ক্রয় সহ বিভিন্ন ক্রয়ে সীমাহীন দূর্নীতি, পরিবহন সেক্টরে পুকুর চুরি, আইডিবির টাকার অপব্যবহার (যার ফলে প্রতিটি অডিটেই দেখা দিয়েছে বিপুল অডিট আপত্তি) যা ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। প্রতিটি অনিয়ম ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ সচেতন মহল সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে। গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি কিন্তু সে সব তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অজ্ঞাত কারণে আজও আলোর মুখ দেখেনি। বরং অনিয়মকারী ও সন্ত্রাসীরা হয়েছে পুরস্কৃত। তাইতো জোট সরকারের আমলেও তারা তৈরী করছে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার ব্লু প্রিন্ট।

লেখক ঃ সেক্রেটারী বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

তুমি হেসে হেসে কাঁদালে সবাইকে

মোঃ নুরুল ইসলাম

রাত তখন আনুমানিক ৮টা ৩০মিনিট। আমি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান সভাপতি মুস্তাফিজ ভাই আবাসিক এলাকায় একটি সীরাত মাহফিল শেষ করে হোন্ডায় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুল ফটক দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করি। ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশের উপস্থিতি দেখে আমরা গাড়ী থামিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাংবাদিকের থেকে কি হয়েছে জানতে চাই। সাংবাদিক আমাদের দেখে দ্রুত হলের দিকে চলে যেতে বলে। আমরা হলে দিকে চলে আসি। হল গেটে অবস্থানরত অবস্থায় শহীদ রফিক ভাই ও অন্যান্য সদস্য ও ভাইদের কাছ থেকে ক্যাম্পাসে কি ঘটেছে এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রাসেল ভাই সাংগঠনিক সফরে চুয়াডাঙ্গা থাকায় সেক্রেটারী মুস্তাফিজ ভাই আমাদের নিয়ে পরিস্তিতি পর্যালোচনা করেন। রফিক ভাই আমাদেরকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং আমরা পরবর্তী করনীয় নির্ধারন করি।

কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকে যারা সহ্য করতে পারে না, ছাত্রশিবিরের অগ্রযাত্রাকে যারা স্তব্ধ করে দিতে চায়, ছাত্রশিবিরের বিরোধিতা করা যাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু শিক্ষক অত্যন্ত সুপরিকল্পিতবাবে কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই পরের দিন ৬ই জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমূহ বন্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে একটি অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলে দেয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশের আলোকেই আমরা

www.pathagar.com

বিকাল ৫টার মধ্যে হল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেই। বেলা তখন ৩টা ৩০বাজে রফিক ভাই এবং এহসানুত তানজিল চমন এবং আমি সাদ্দাম হলের সামনে বসে চা পান করছিলাম। রফিক ভাই তখন আমাকে বললেন, কমান্ডার (তিনি আমাকে কমান্ডার বলে ডাকতেন) ক্যাম্পাস যেহেতু বন্ধ হয়ে গেল তাই মন চাচ্ছে একটু বাড়ী ঘুরে আসি। রফিক ভাই ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বে থাকার কারণে যখন তখন বাড়ী যেতে পারতেন না। সুযোগ পেলেও ২/১ দিন থেকে চলে আসতে হতো। তাই তার ব্যাকুল মন বাড়ী যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আমি তখনো জানতাম না যে, রফিক ভাইয়ের দেহ মন কোন জান্নাতী পোশাক পরে ২দিন পরে বাড়ী যাওয়ার জন্য পেরেশান। তিনি আমাকে এ কথাও বললেন যে, আপনার একজন সাথী শামীম ভাই আমার কাছে থেকে ১০০/- ঋণ নিয়েছে এই টাকাসহ আরো কিছু টাকা দিলে আমি বাড়ী ঘুরে আসতে পারবো। আমি তখন বলেছিলাম আপনার বাড়ী যাওয়ার কোন সুযোগ আছে নাকি? রফিক ভাই বললেন, যেহেতু সুযোগ পেয়ে গেলাম তাহলে একটু বাড়ী ঘুরে আসি না। আমি বললাম ঠিক আছে বাড়ী যাওয়ার আগে টাকা নিয়ে যাবেন। তিনি বাড়ী ঠিকই গেলেন কিন্তু সাদা কাফন পরে, শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে হেসে খেলে সবাইকে কাঁদিয়ে সুখ সাগরে ভাসিয়ে অন্তিম ঠিকানায়।

পাঁচটা বাজার আগেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে আরোহন করি। বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে খবর আসলো যে জাসদ ছাত্রলীগের নরপিশাচরা আমাদের গাড়ীতে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে পারে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পুলিশী প্রহরায় আমাদের গাড়ী ঝিনাইদহ পানে ছুটে চললো। আমি এবং রফিক ভাই দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইদের বহনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসের পিছনের দরজায় দাড়িয়ে ইসলামী সংগীত গেয়ে গেয়ে সন্দেহজনক স্থানগুলোর দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখছিলাম। রফিক ভাইকে তখন একটু গম্ভীর মনে হয়েছিল। কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনি যে দুই দিন পর তিনি আমাদের এতিম বানিয়ে চিরকালের জন্য চলে যাবেন তার আপন প্রভুর ঠিকানায়। গাড়াগঞ্জ বাজার পার হলে আমাদের মোটামুটি নিশ্চিত হলাম আমাদের গাড়ী আর নরঘাতকদের দ্বারা এ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রফিক ভাই গেট ছেড়ে একটু উপরে উঠলেন।

গাড়ী ঝিনাইদহের আলহেরাতে পৌছার পর আমরা দ্রুত আসরের নামাজ আদায় করলাম, মাগরিবের নামাজের পর জরুরী ভাবে বসে আমাদের পরবর্তী করণীয় এবং রাতের খাবার ও শৃংখলার জন্য রফিক ভাই সহ কয়েকজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

রাত তখন আনুমানিক ১০.১৫ আমার একটি প্রাইভেট পরীক্ষা থাকার কারণে পার্শ্ববর্তী একটি মেসে পড়াশুনার জন্য রাত্রি যাপন করতে রাসেল ভাইয়ের কাছ থেকে ছুটি নেই। চমনকে সাথে নিয়ে রওনা দেয়ার মুহূর্তে রফিক ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাই। রফিক ভাই তখন তার ব্যাগ থেকে একটি আম বের করে আমাদের দুজনকে খেতে দেন। এবং বললেন আমের কথা আর কাউকে বলবেন না। কারণ আমার কাছে যথেষ্ট

www.pathagar.com

পরিমান নেই যে, অন্য কাউকে দিতে পারবো। সালাম বিনিময়ের পর মেসে চলে আসি। পরদিন ৮ই জুন শুক্রবার, ফজরের নামাজের পর পূর্বের সিদ্ধান্তের আলোকে মদনভাঙ্গা যাওয়ার জন্য চমন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসে। ৮ তারিখ পরীক্ষা থাকার কারণে আমি একটু পড়তে বসি। কিন্তু কি যেন একটি অনুমেয় দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। পড়া লেখার মধ্যে হঠাৎ যেন অন্য এক নতুন জগতে চলে যাই, আবার নিজেকে লেখাপড়ার দিকে ফিরে আনার চেষ্টা করি। এই অবস্থাতেই জুমআর নামাজের সময় হয়ে গেল। নামাজ শেষ করে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে বিশ্রাম নিতে যাই। আমতা আমতা করে ঘুমাচ্ছিলাম। কিন্তু স্বপ্নের জগতে মনে হচ্ছিল কোথায় মিছিল হচ্ছে মনের মধ্যে একটু অশান্তি বিরাজ করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাক্তন সদস্য গিয়াস উদ্দিন ভাই আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, এখনও শুয়ে আছেন রফিক ভাই শাহাদত বরণ করেছেন। ঘুমের রেশ তখনও কাটেনি আমি তার কথা বুঝতে না পেরে তখনও বুঝতে পারিনি। আবার জিজ্ঞেস করলাম- শাহাদত, কে শাহাদাত বরণ করেছে, কি হয়েছে? তিনি একটু রাগত স্বরে বললেন, ক্রীড়া সম্পাদক সাতক্ষীরার রফিক ভাই শাহাদত বরণ করেছেন। আমি তখনও বুঝতে পারিনি। আমার আর বুঝতে বাকী থাকলোনা আমাদেরই প্রাণের ভাই রফিকুল ইসলাম তার জীবনের চূড়ান্ত মান্যিলের পানে পাড়ি জমিয়েছেন।

রফিক ভাইয়ের শাহাদাতের খবর যেন নীল আকাশ তার জমিনকে চেপে ধরেছে, আর এখান থেকে বের হবার কোন রাস্তা নেই। জীবনের অসংখ্য শোক দুঃখের বাঁকে এ সংবাদটি এতই মর্মপীড়া প্রদান করলো যেন সবচেয়ে আপন ভাইটি হারিয়ে এতিম হয়ে গেলাম।

শহীদ রফিক ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ শুনতে হবে জীবনে কখনো কল্পনাও করিনি। সংঘাতময় ক্যাম্পাসে যদিও আমরা প্রতিনিয়ত শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত থাকতাম কিন্তু এ পর্যায়ের সদা সতর্ক একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিককে হারিয়ে ফেলবো তা ভাবতেও পারিনি। মাত্র কয়েকদিন পর যার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ হওয়ার কথা ছিল তাকে এমনি লাশ হয়ে ফিরতে হবে তা কেউই জানতো না।

শহীদ রফিক ভাইয়ের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক থাকার কারণে ব্যক্তিগত অনেক বিষয় জানার সুযোগ হয়েছিল। আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যেই তার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। তিনি দুবেলা ভাত খেতেন এবং একবেলা রুটি খেতেন যাতে একটু সাশ্রয় করা যায়। আমাকে প্রায়ই বলতেন নূরুল ভাই আমার একটি চাকুরীর প্রয়োজন কারণ আমার বোনদেরকে বিবাহের ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। আমি একদিন পত্রিকায় দেখি Muslim Aid এ একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। রফিক ভাই Muslim Aid এর কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কথা জানালে সেখানে আবেদন করেন। কিন্তু যেদিন তার আবেদন পত্র ঢাকায় Muslim Aid এর অফিসে জমা পড়লো

www.pathagar.com

সে দিনই তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়োগ লাভ করেন।

শহীদ রফিক ভাই সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ও ফুরফুরা মেজাজে থাকতেন। কোন টেনশন বা কষ্টের চাপ তার চেহারায় ফুটে উঠতো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য সংঘাতময় পরিবেশে তাকে অত্যন্ত ধীর স্থির ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে দেখেছি। তার মত অপরিসীম সাহসী নিবেদিত প্রাণ আল্লাহর সৈনিক জীবনে খুব কমই দেখেছি। প্রায়ই তিনি একা একা হোন্ডা নিয়ে ক্যাম্পাসের বাহিরে চলে যেতেন। নিষেধ করলে বলতেন আমাকে নিয়ে দুঃচিন্তার কারন নেই, আমাকে কেউ মারবে না।

আওয়ামী দুঃশাসনের পাঁচটি বছর তাকে অনেক কষ্ট আর সর্বদা টেনশনে কাটাতে হতো। ছাত্রলীগের খুনীরা সর্বদা বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল চেপে রাখতো ছাত্রশিবিরের রক্তে তাদের বন্দুকের বুলেটকে লাল করার জন্য। আর এ কারণেই পুরো ক্যাম্পাস পুলিশি তল্লাশীর আতংক থাকায় তাকে প্রায়ই খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হতো। কোন রাতই তাকে ২/৩ টার আগের ঘুমাতে দেখিনি।

অন্যায় অসত্যকে কখনও তিনি মেনে নিতেন না। কারো মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে সরাসরি তাকে তা সংশোধনের জন্য বলতেন। প্রায়ই কয়েকজন ভাই সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলতেন ওরা ইসলামী আন্দোলনের জন্য বোঝা এবং আদৌ ইসলামী আন্দোলন করে কিনা আমার সন্দেহ হয়।

খেলাধুলার প্রতি তার বেশ ঝোক ছিল যদিও কোন খেলাই ভাল করে খেলতে পারতেন না। ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন শিবিরের উদ্যোগে স্বাধীনতা কাপ ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেছিলেন এবং নিজের মাঝে মধ্যে ধারাভাষ্য দিতেন।

দীর্ঘ পাঁচটি বছর তার সাথে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার মত একনিষ্ঠ, সৎ, সাহসী, নিবেদিত প্রাণ, সর্বদা চঞ্চল, উন্নত আসন ও হাস্যোজ্জ্বল সদালাপী, আল্লাহর পথের নির্ভীক সৈনিক জীবনে কমই দেখেছি। তার জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগই আমাদের জন্য অনুকরণীয়, অনুস্মরণীয়।

সংঘাতময় আওয়ামী দুঃশাসনে পাঁচটি বছর ছাত্রশিবিরের সাথে তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে কিন্তু সুখের দিনের ছাত্রশিবিরের দেখে যাওয়ার সুযোগ তার হয়নি। জীবনে অনেক আপনজন হারিয়েছি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর মত এত কষ্ট কখনো অনুভব করিনি। আজও যখন তার থেতলে যাওয়া মাথার ও মুখ অবয়বের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন নিজেকে সামলানো কষ্টকর হয়ে পড়ে।

আমরা শুধু এ কথাই বলতে পারি, রফিক ভাই আমরা তোমাকে ভুলে যাইনি। তোমার প্রতি ফোটা রক্তের মূল্য আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। তোমার রক্ত বৃথা যায়নি, প্রতি ফোটা রক্ত আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিকে ইসলামী আন্দোলনের উর্বর ঘাটিতে পরিণত করেছে। যারা তোমাকে হত্যা করেছিল তারা আজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত সূর্যের আলো দেখতে পায়না। ই,বি মাটি তাদের জন্য আজ হারাম হয়ে গিয়েছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও আজ তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
তুমিতো সুখে আছো। দুঃখ সাগরে আমাদের ভাসিয়ে তুমি চির শান্তির জগতের হুরদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছো। তুমি হেসে হেসে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে।

লেখক ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ঝিনাইদহ জেলা।

www.pathagar.com

শহীদ রফিক জেহাদী প্রেরণার উৎস

মোহাম্মদ সামছুল হক

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, শাহ জালাল-শাহ মাখদুমের পূণ্যভূমি, অসংখ্য শহীদানের শোণিত রঞ্জিত এ বাংলায় সৃষ্টি কর্তার ঐশী বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে-শাহাদাতের তালিকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম সদস্য হিসেবে নাম লেখায় রফিক। আওয়ামী দুঃশাসনের শেষ পর্যায়ে জাসদ ছাত্রলীগের হায়েনারা নির্মমভাবে তাঁকে 'শহীদ' করে বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিহিত মদনডাঙ্গা গ্রামে। দৈনিক পত্রিকায় রফিকের শাহাদাতের সংবাদ পড়ে বার বার প্রতিধ্বনিত হয় দয়াময় রবের সেই অমিয় বাণী-"আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লার রাহে, অতঃপর মারে ও মরে.....।" আল্লাহর জমিনে তাঁর দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অকুতোভয় দুঃসাহসী বীরসেনানী রফিক কখনো ইসলামী আন্দোলনের বিপদসঙ্কুল ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি। হক ও বাতিলের সংঘাতে অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে সে ছিল নির্ভীক। আল্লাহ্র উপর অবিচল বিশ্বাস রেখে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সে মোকাবেলা করেছে জালিম ও তাগুতি শক্তির। ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তিগুলো যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আন্দোলনের দুর্গ গুড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে তখনই রফিক হযরত ওমর, আলী ও খালিদের মত ঈমানী হুঙ্কার দিয়ে আগ্রাসীদের টুটি চেঁপে ধরেছে। অমিত তেজস্বী রফিক ছিল শয়তানী

www.pathagar.com

শক্তির আতঙ্ক। দ্বীনী সংগ্রামের অকুতোভয় এ যুবক শাহাদাতের তামান্নায় সদা উন্মুখ হয়ে থাকতো। বিচার দিবসের মালিক তার এ কামনা কবুল করেছেন এবং এটাই তার পরম পাওনা। শহীদদের ব্যাপারে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, "আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করোনা। বরং তারা নিজেদের পালন কর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।" শহীদ রফিক কতই না সৌভাগ্যবান। সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনম্র শহীদ রফিকের মায়াবী মুখখানি আমাকে সব সময় শহীদের কাফেলায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে ডাকে শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমার রক্ত টগবগিয়ে উঠে।

কি অপরাধ ছিল রফিকের? কেন অমানুষেরা খুন করল তাকে? সে তো তাদের কোন ক্ষতি করেনি! রফিক চেয়েছিল একটি শোষণ ও দূর্নীতি মুক্ত, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গড়ে উঠা একটি সুখী বাংলাদেশ। সে চেয়েছিল এমন একটি দেশ যে দেশে থাকবে না জুলুম-নিপীড়ন, হত্যা-ধর্ষণ। থাকবে না নির্যাতিত নিপীড়িত নারী-পুরুষের বুকফাটা আর্তনাদ। ধর্ষিতা বোনের করুন চিৎকারে কেঁপে উঠবেনা বাংলার আকাশ-বাতাস এই ছিল তার একান্ত কামনা। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করাই ছিল তার নিরন্তর প্রচেষ্টা। রফিকের স্বপ্ন ছিল এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রের যার গোড়াপত্তন করেছিলেন বিশ্ব রসূল (সা.) আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র নগরী মদিনায়। এ সব চাওয়া, এ সব কামনাই কি ছিল রফিকের অপরাধ? তাওহীদের প্রতি আহ্বান, একামতে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়াটাই কি তার অপরাধ? যার জন্য পাষণ্ডরা তাকে পৈচাশিকভাবে খুন করেছে?

গোটা বিশ্বেই আজ ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদের উপর আঘাত আসছে। অভিশপ্ত জাতি ইহুদীদের খপ্পরে পড়ে অবিশ্বাসীরা একযোগে আঘাত হেনে ইসলামের বুলন্দ আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে। ইসলামের দুশমনরা আজ তাওহীদের ঝান্ডাকে পদানত করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। কিন্তু খোদার অপার দয়ায় প্রচন্ড ঘাত প্রতিঘাত এবং তীব্র বাঁধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামী আন্দোলন এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। কার সাধ্য আছে রুখে দেয় এ দুর্বার গতি? আধুনিক ফেরাউনেরা যত লম্পঝম্পই করুক না কেন তারা কখণই তওহীদের প্রদীপ নিভিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় পাগলপারা লক্ষ রফিকের দেশ বাংলাদেশেও তাগুতি শক্তি ইহুদীদের দোসররা বসে নেই। তারা একের পর এক সত্যাশ্রয়ী, সত্য প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন রত নবী প্রেমিকদের শহীদ করে চলেছে। অপরদিকে তারা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও কাল্পনিক কিস্সা কাহিনী প্রচার করে চরিত্র হননের মাধ্যমে নবী প্রেমিকদের মাঝে মতনৈক্য সৃষ্টি করে দূর্বল করে দিতে চায়। কিন্ত "হে ঈমানদারগণ! যখন কোনো দলের সঙ্গে তোমাদের মুকাবিলা হয়, তখন তোমরা সঠিক পথে থেকো এবং আল্লাহকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করো। আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে বিবাদ করো না। তাহলে তোমাদের মধ্যে দূর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের অবস্থার অবনতি ঘটবে। সবর বা ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন" খোদার এ বাণী যাদের অন্তরকে সদা আলোকিত করছে তাদের মাঝে ফাঁটল সৃষ্টি করে দুর্বল করে দেওয়া কি এতই সহজ? অবিশ্বাসী পাপীদের মনে রাখা উচিত বিন্দু মাত্র বিচলিত বা ভীত নয় ইসলামের তরে জীবনোৎসর্গীকৃত এ দেশের দুঃসাহসী নবী প্রেমিকেরা। "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।" যাদেরকে বিশ্বের মালিক অভয় দিচ্ছেন তাদেরকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। যাদেরকে জীবন-মৃত্যুর মালিক বিজয়ের গ্যারান্টি দিচ্ছেন তাদেরকে পরাজয়ের ভয় দেখানো নিরেট বোকামী ছাড়া কিছু নয়। বরং পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি তাদেরকে অচিরেই গ্রাস করবে। তখন তারা লজ্জায়, অনুশোচনায়, হিসাব নিকাশ ও জাহান্নামের আযাবের ভয়ে বলবে-"হায় আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।"

আমরা রাষ্ট্রের শান্তি প্রিয় নাগরিক হিসেবে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি অচিরেই রফিকের খুনীদের ফাঁসিতে ঝুলানো হউক। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ, দেশ গড়ার দক্ষ কর্মী রফিকের খুনীরা মুক্ত বিহঙ্গের মত নির্বিঘ্নে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াবে তা জাতি বরদাশত করবে না।

রফিকের সাথে প্রথম দেখা হয় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত খুলনায় এক 'শিক্ষা শিবির' এ। সাতক্ষীরা জেলার প্রতিনিধি হিসেবে সে এবং আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে 'শিক্ষা শিবির' এ অংশগ্রহণ করি। আমার বাড়ী সাতক্ষীরা জেলায় এ তথ্য জানার পর সে প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আমার সাথে দেখা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে। পরবর্তীতে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিনয়ী, ভদ্র, সুদর্শন সচ্চরিত্রবান রফিকের সাথে ইসলামী আন্দোলনে বন্ধুর পথের বাঁকে বাঁকে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমার আম্মাও খোদার পথের এ সৈনিককে সন্তানের মতই জানতেন। সে আমাদের বাড়ীতে আসলে মা তাকে নিজ সন্তানের মতই আদর-মমতা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। রফিকের শাহাদাতের সংবাদ শুনে মা যেন পুত্র শোকে ভেঙ্গে পড়েন। শোকে মুহ্যমান ক্রন্দনরত মাকে শান্তনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাইনি। রফিকের জন্য আজো মায়ের হৃদয় ব্যকুল হয়ে উঠে। আন্দোলনের সহকর্মী উদ্যমী রফিকের কথা ভুলতে পারিনি। জেহাদী জজবায় উজ্জীবিত শহীদ রফিকের জন্য বার বার অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠে। যত দিন সূর্য আলো দিবে ততদিন শহীদ রফিক ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

লেখক ঃ এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

www.pathagar.com

অনুভূতির দিগন্তে শহীদ রফিকুল ইসলাম ।।

মোঃ মফিজুল ইসলাম

সাগরের অথৈ জলরাশির সমান্তরালে সিক্ত সৈকতে আমরা ক'জন হাটছিলাম। প্রতি মুহূর্তে বাতাসের আঘাতে সাগরের বিস্তৃর্ণ বিছানায় সৃষ্ট ঢেউগুলো একটির পর একটি মাথা উচিয়ে আছাড় খেয়ে যায় সৈকতে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। সেই অশান্ত সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে বিরামহীন এক জীবনের মায়াবী হাতছানি অনুভব করছিলাম।

সুদূর দিগন্তে যেখানে আকাশ এবং পৃথিবী মিলন মোহনা তৈরী করছে সেইদিকে তাকিয়ে স্রষ্টার সুন্দর সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করেছি কিভাবে সাগরের বুকে ঢেউয়ের দোল খেলায়। উপলব্ধি করেছি এক জীবন স্পন্দন। সেখানে আমার এক সাথীকে দেখলাম ঢেউয়ের সাথে পাঞ্জা লড়তে। সে এক অভাবিত দৃশ্য। এক বুক পানিতে নেমে আমার সাথী তার বলিষ্ঠ সিনা উচিয়ে প্রতিকূল গতির দুরন্ত ঢেউ গুলোকে ফিরাচ্ছেন। একটির পর একটি করে ঢেউয়ের মিছিল আসছে। সাথীর গায়ের প্রতিরোধ শক্তিতে দেখলাম কখনো ঢেউয়ের বৃহদাকার পাহাড়গুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কখনো সাথীর মাথার উপর দিয়ে অনেকগুলো ঢেউ গড়িয়ে আসছে। মুহূর্তে ঢেউয়ের নীচে, মুহূর্তে বিভক্ত ঢেউয়ের মাঝ খানে। খুব কাছ থেকে দেখছি সেদিন সাথীকে। সংগ্রাম মুখর পরিবেশে। সে মুহূর্তে আমার মনে এই অনুভূতি প্রকাশিত হলো বাস্তবতার স্বরূপে। সংগ্রামী জীবন উর্মী মুখর সাগরের তীরে দাড়িয়ে লোভাতুর দৃষ্টির পাখা মেলে নিছক দৃশ্য দেখতে পারে না।

www.pathagar.com

সংগ্রামী জীবন জানে উদ্দাম ঢেউয়ের মিছিলে নেমে সংগ্রাম করতে। জানে ঢেউয়ের উত্তাল তরঙ্গে যে জীবন প্রবাহ বয়ে যায় তারই সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়ে নিতে। সংগ্রামী জীবনের এই বলিষ্ট উপলব্ধি সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মিছিলের মাঝে সেদিন আমার সামনে নতুন রূপে নতুন নিরিখে তুলে ধরে ছিলেন ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলনের তরুন সিপাহসালার আমার প্রিয় সাথী শহীদ রফিকুল ইসলাম। তাঁর সংগ্রামী জীবনকে এর আগে এতো পরিস্কার ভাবে বুঝে উঠতে পারিনি কখনো। সেদিন উর্মি মুখর সাগর তীরে আমি দর্শক আর শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন সংগ্রাম মুখর ভূমিকায়। তার জীবনের সাথে আমাদের জীবনের বিস্তর ব্যবধান তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেদিন আমার বাস্তব অনুভূতির দিগন্তে।

শহীদ রফিকুলের আদর্শ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ় ঈমান বলিষ্ট দৃপ্ত প্রত্যয় এবং আত্মশাসনের মাধ্যমে বস্তু স্বর্বস্বতার অনেক উর্ধ্বে আরোহন করেছিলেন। সম্ভাবনা ভরা এক উজ্জল ভবিষ্যত তাঁকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছিল কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজের লক্ষ্য ঠিক করে যুব সমাজকেও ডাক দিয়ে বলেন কুরআনের ডাকে সেই পথে তীব্র গতিতে ছুটে চল। জীবনের সমস্ত ভোগ বিলাস আর সম্ভাবনার হাত ছানিতে অবজ্ঞা করে শহীদ রফিকুল ইসলাম ঢেলে দিলেন শরীরের সর্বশেষ রক্ত বিন্দু। তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন নিজের মায়াবী উপভোগ্য জীবনকে। কি সুন্দর মিল। ইতিহাসের কি অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি আদর্শের জন্য নিজের স্বর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তাঁর বক্তব্য ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে গেলেন।

তার বিশ্বাস ছিল পৌঢ়দের দ্বারা বিপ্লব হবে না, আলী হায়দার, তারেক, মুহম্মদ বিন কাশিম, আর কুতাইবার মত জোয়ানরাই ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে এই সুন্দর বসুন্দরায়। একটি অট্টালিকা তৈরীর জন্য শত শত ইটকে গুড়ো হতে হয়। মাটির নীচে চাপা পড়তে হয়। তার পরই সুষ্ঠ পরিকল্পনার এবং বিশেষ নিড় নকশার ভিত্তিতে গড়ে উঠে ইমারাত। মানবতাকে জাহিলিয়াতের গহীন অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হলে, ইনসাফ সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের সুমহান সমাজ কায়েম করতে হলে এক দল মানুষকে সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং কুরবানীর ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আপোষহীন সংগ্রামে এরই অগনিত নজির দেখি আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আবু জর গিফারী (রাঃ) কে দেখি কাবা গৃহের চত্বরে দাঁড়িয়ে কাফেরদের সামনে উদার কণ্ঠে তৌহিদের দাওয়াত তুলে ধরতে, কাফেররা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তাদের আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে বার বার তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলেন। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার কড়াইয়ের উপর দেখি বিলাল (রাঃ) কে, তার কণ্ঠে শুনি তৌহিদের অমীয় বাণী আহাদ আহাদ। আমরা দেখি খাব্বাবের গলিত চর্বির ধারায় জ্বলন্ত অঙ্গার বার বার নিভিতে। এমনি ধরনের অগনিত শহীদের রক্ত পিরামিডের পরই সেদিন ইসলামী সমাজের ইমারাত গড়ে উঠেছিল। এ যুগেও যদি এইরূপ ত্যাগ এবং কুরবানী পেশ করা হয় তা হলেই সেই

www.pathagar.com

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। এই ছিল শহীদ রফিকুল ইসলামের দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি মনে করতেন বিশ্বের সমস্ত বাতিল শক্তি আজ আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারেনা। হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবো নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। হ্যা পরিশেষে তার জীবনে তাই বাস্তবায়িত হল।

সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার লাঙ্গল দাড়ীয়া গ্রামের মা বাবার অপরিমেয় আদরে লালিত সেই যুবক শহীদ রফিকুল ইসলাম সরস ধানের শীষের মত শ্যামল, সেই শিশু কিশোর তরুণের মুখে ছড়িয়ে ছিল প্রতিভার অত্যুজ্জল দীপ্তি। আগামীর সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিশীল এই যুবক সবাইকে ডিঙ্গিয়ে একেবারে সবার সামনে চলে গেলেন। তার সফলতায় কোন ছেদ পড়েনি। সবশেষে তিনি ঈর্ষান্বিত শহীদি মর্যাদা লাভ করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন অনেক উর্ধে সুউচ্চ মঞ্জিলে দূর দিগন্তে সীমাহীন সীমানায়। হে শহীদ তুমি সাথী ছিলে দুনিয়ায় একই কামরায় কাটিয়েছি অনেক রাত দিন। তুমি আমায় সাথী হিসেবে গ্রহণ করো আখেরাতে জান্নাতের আঙ্গিনায়।

শহীদ রফিক তুমি দুনিয়ায় নেই কিন্তু তোমার আরদ্ধ সংগ্রামের পতাকা রয়েছে আজো সে পতাকা অবনত হবে না কোন দিন। তোমার সংগ্রামী কাফেলার অযুত সাথী সে পতাকা বয়ে নিয়ে যাবে সাফল্যের তোরন দ্বারে মনজিলে মাকসুদে।

তোমার শাহাদাত সবাইকে আবেগাপ্লুত করেছে। সেই আবেগের জোয়ারে আমি নিজেও ভাসছি। আজ স্মরণিকা প্রকাশ হবে-। তোমাকে কেন যেন আজ আমার খুব বেশী মনে পড়ছে। শহীদ রফিক .....।

আজ কবি ফররুখ আহম্মদের একটি ছন্দময় পংতি মনের কোনে উদিত হয়-

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দিগানি।

লেখক ঃ সাবেক অফিস সম্পাদক, ই.বি.।

www.pathagar.com

স্মৃতির গগনে অতুজ্জ্বল শহীদ রফিকুল ইসলাম

মোঃ আকতার হোসাইন

যে শাহাদতের ঘটনা আজও আমার হৃদয়কে আন্দোলিত করে, বেদনার শেল হানে, না পাওয়ার বেদনায় মন কেঁদে উঠে, আমার হাসিকে ভুলিয়ে দেয় তা হলো আমার একান্ত প্রিয় নেতা, প্রিয় ভাই শহীদ রফিকুল ইসলামের শাহাদতের ঘটনা। প্রিয় রফিক আজ আমাদের মাঝে নেই। চলে গেছে দূরে বহু দূরে মানজিলে মাকছুদ জান্নাতের পথ ধরে আল্লাহর এই গোলাম স্বীয় মাহবুবের একান্ত সান্নিধ্যে। পিতামাতা, ভাই বোনদের কলিজার টুকরা আদরের টুনু আর কোন দিন ফিরে আসবেনা কোলাহলময় নশ্বর জগতে। নারায়ে তাকবীরের শ্লোগানে মুখরিত করবেনা ইবির রক্তভেজা এই শহীদি ক্যাম্পাস।

শহীদ রফিক ছিলেন আমার একান্ত আপন, একান্ত প্রিয়জন ও আমাকে প্রচন্ড ভালবাসতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আমার এক বছরের জুনিয়র হলেও সাংগঠনিক দিক দিয়ে ছিল আমার অনেক উপরে। জুনিয়র সিনিয়রের কোন পার্থক্য ভেদ না করে প্রিয় নেতা হিসেবে প্রশ্নহীন ভাবে আমি তার আনুগত্য করতাম। আমাকে সব সময় ভাল পরামর্শ দিত। সহযোগীতা করত, বিপদে পড়লে এগিয়ে আসত। আমার ভাল ফলাফলের পিছনে তার অবদান অনেক বেশি। সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি পড়ালেখার প্রতি প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করত। তার চরিত্র, আদর্শ, সাংগঠনিক যোগ্যতা, সুন্দর ব্যবহার, মধুময় বাক্যলাপ সব কিছু ছিল অনুকরনীয়। প্রচুর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

www.pathagar.com

ছিলেন তিনি।

প্রথম সাক্ষাতেই মানুষকে আপন করে ফেলতেন। তার অমায়িক ব্যবহার প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা সবাইকে মুগ্ধ করত। মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন তিনি। অসাধারণ গুণাবলীর কারণেই অল্প দিনের মধ্যেই ক্যাম্পাস পরিবারের আপন জনে পরিণত হন তিনি। এরপর ক্যাম্পাসের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তার হাস্যজ্বল ব্যবহার, শিশু, বালক, যুবক, আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলকে আপন করে নিত মুহূর্তের মধ্যে। এলাকার হৃদয়ের মানুষে পরিণত হন তিনি। বিশেষ করে লোজিং বাড়ীগুলো আপন পরিবারে পরিণত করে ফেলেন। সকলের সুখ দুঃখের ভাগীদার ছিলেন কেউ সমস্যায় পড়লে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যেতেন সহযোগীতার জন্য। ঋণ করে সেই টাকা দিয়ে মানুষের ঋণ পরিশোধ করতেন, শাহাদতের পরে জানা গেছে তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা। শাহাদতের পরে এলাকার হাজারো মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ, অশ্রুসিক্ত দুনয়ন তারই প্রমান বহন করে। ঝিনাইদহের অগ্রণী চত্বরের বাধভাঙ্গা মানুষের জোয়ার আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল "মরেও অমর তুমি, তুমি সকলের প্রেরণা" মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সেদিন। নিজের সন্তানকে হারিয়ে যেন কেউ এমন বেদনা পায়নি। রফিক বন্দনা এখন মানুষের মুখে মুখে সে বন্দনায় যেন শরীক হন আল্লাহর ফিরিশতাকুল এটাই একান্ত কামনা।

অন্যায় ও অপকর্মের কোন প্রশ্রয় দিতেন না আল্লাহর এই প্রিয় মুজাহিদ, অন্যায়ের প্রতিবাদে ছিলেন সদা মুখর। এক্ষেত্রে একান্ত আপনজনকেও তিনি ছাড় দিতেন না। মহান রবের নির্দেশিত এই মহৎ কর্মটিই তার শাহাদতের পথকে সহজ করে দেয়। সুযোগ করে দেয় মহান সৌভাগ্যের। আপোষহীন নীতির কারণেই সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন তিনি। ইসলাম বিরোধী অপশক্তির জন্য ছিল যেটা গাত্রদাহের কারণ।

সংগঠনের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে রফিক ভাই ছিলেন এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে কোন প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও দায়িত্বশীলদের নির্দেশ হাসিমুখে মাথা পেতে মেনে নিতেন। বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্যের মত "না" কথাটি ছিল তার জন্য বেমানান। আবার অধঃস্তন সকল দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সাথে ব্যবহার ছিল ইনসাফভিত্তিক। সাংগঠনিক কাজকে গুরুত্ব দিতেন সকল কাজের উপরে। অনেকের মত হিকমত অবলম্বনকারীদের দলে তিনি ছিলেন না। লেখাপড়ার অজুহাতে সাংগঠনিক কাজে তিলমাত্র ফাঁকি দিতেননা। আসলেই আমার মনে হত দুনিয়াবী ডিগ্রি অর্জনের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। সেদিন বুঝতে পারিনি দুনিয়ার কোন অনার্স, মাষ্টার্সের ডিগ্রি তার কাম্য ছিলনা। তাইতো সে সর্বোচ্চ সম্মান, সর্বোচ্চ মূল্যের খোদাপ্রদত্ত আখেরাতের সর্বোচ্চ ডিগ্রি "শহীদ" গ্রহণ করে বিদায় নিয়েছেন।

লড়াইয়ের ময়দানের একজন অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক ছিলেন আমার প্রিয় রাহবার

www.pathagar.com

শহীদ রফিক। সকল লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অগ্রসেনা। শাহাদাতের সুতীব্র আকাংখা মৃত্যুর ভয়কে তার কাছে তুচ্ছ ও নগণ্য করে দিয়েছিল। লড়াইয়ের ময়দানে অগ্রসেনানীর ভূমিকা নিয়ে শাহাদতের অমীয় পেয়ালা পান করার জন্য সর্বদা উন্মুখ থাকতেন তিনি। তার কণ্ঠে ধ্বনীত হতো

"আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিও

"যেই মিছিলের নেতা, আমির হামজা, খোবায়েব, খাব্বাব....।

আওয়ামী দুঃশাসনের সেই বিভিষিকাময় দিনগুলিতে আমি তাকে দেখেছি সিংহদীল, বীর সেনানী, শেরে খোদা হযরত আলীর (রাঃ)-র মতো দশ হাত দূরে দাড়িয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসের জবাব দিতে। মুহুর্ত যতই কঠিন হোক আমি কোন সময় তাকে চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখিনি। কঠিন পরিস্থিতিতেও হাসি মুখে সকলকে সাহস দিতেন, প্রেরণা যোগাতেন। ঈমানের রসদ ছিল তার জন্য উত্তম রসদ। আর এই ঈমানী রসদ দিয়ে রফিক সহ রফিকের সাথীরা ইবি ক্যাম্পাসের এক ইঞ্চি জায়গাও খোদাদ্রোহী শক্তির করতলগত হতে দেয়নি। প্রত্যয় ছিল একটাই" শির দেগা, নেহি দেগা আমামা।

কোন অপরাধ ছিল না আমার এ প্রিয় ভাইটির। অপরাধ ছিল হানজালা, খাব্বাব, সাইয়েদ কুতুব আর হাসানুল বান্নার উত্তরসূরী হিসেবে মানুষের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা, ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আহবান করা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। কিন্তু জামাল নাসেরের উত্তর সূরী ইসলামের দুশমনরা তা সহ্য করতে পারিনি। যাদের দন্তনখর প্রতিনিয়ত সিক্ত হয় মানুষের তাজা রক্তে। চাঁদাবাজী আর নেশার পেয়ালায় যাদের প্রাত্যহিক জীবন। কেন ওরা কাপুরুষের মত হামলা করে আঘাতের পর আঘাত হেনে নিভিয়ে দিল রফিকের জীবন প্রদীপকে? রফিকতো ওদের পাকা ধানে মই দেয়নি। রফিকের প্রদত্ত রক্তে যাদের জীবন গতি পেয়েছিল। হাসপাতালে যাদের পাশে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছে।

উদ্দেশ্য ইবির ক্যাম্পাসে শিবিরকে উৎখাত করে রামরাজত্ব কায়েম করা। অবৈধ চাঁদাবাজি আর দখলদারীর পথকে সম্প্রসারিত করা। কিন্তু কুরআনের দুশমনদের স্বপ্নসাধ পূর্ণ হয়নি। এক রফিকের শাহাদাতের অনুপ্রেরণায় জন্ম নিয়েছে হাজারো রফিক। ইবি ক্যাম্পাস আজ ইসলামী আন্দোলনের জন্য অবারিত। রফিকের স্বপ্ন সাধ পুরন করতে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। "ইসলাম জিন্দা হোতি হায় হার কারবালা কি বাদ"।

আমি আমার প্রিয় নেতা শহীদ রফিককে স্বপ্নে দেখেছি শুভ্রসাদা পোষাক পরিহিত। ওতো জান্নাতী লেবাস, জান্নাতী পোষাক, রফিক জান্নাতী। তাই রফিকের সাথীরা সেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, তৈরী হও, শহীদি রক্তে অবগাহন করে জান্নাতী লেবাস পরিধান কর। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে শামিল হও এই শহীদি কাফেলায়, মুক্তির মোহনায়, রফিক তোমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কত মধুময়, আবেগময় সে আহবান।

www.pathagar.com

৫ জন শহীদের রক্তস্নাত ক্যাম্পাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আমান উদ্দীন মু. মুজাহিদ

এক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামটি এ জাতির আবেগ অনুভূতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর রক্তঝরা আন্দোলনের ফসল এ পিদ্যাপীঠ ইতোমধ্যেই এর গৌরবের দীর্ঘ ২৩ বৎসর অতিক্রম করেছে। হাটি হাটি পা পা করে কন্টকার্কিন পথ মাড়িয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির নামের সাথে শুধুমাত্র ইসলাম শব্দটি থাকার কারণে ব্রাহ্মন্যবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ইসলামদ্রোহী শক্তির হাজারো ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে তাকে ক্রমশ অগ্রসর হতে হয়েছে। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন মানুষের আশা আকাংখা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে এ বিদ্যাপীঠের সার্বিক পাঠ্যক্রমের আলোকে এই ছিলো মূলতঃ জনতার প্রত্যাশা। বাংলাদেশের মুক্তিকামী ছাত্রজনতার হৃদয়ের স্পন্দন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে তার মুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছাতে বদ্ধ পরিকর। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ অবধি এ কাফেলা এক্ষেত্রে আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস স্বাক্ষী ইসলাম বিরোধী শক্তির হাজারো ষড়যন্ত্রকে নিশ্চিন্ন করে কালেমার পতাকাকে বরাবরেই উড্ডীন রেখেছে এ কাফেলার জানবাজ কমীরা। যার জন্য শুরু থেকেই আজ অবধি ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষ তথা খোদাদ্রোহী শক্তির একমাত্র টার্গেট বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। স্বৈরাচারী

www.pathagar.com

এরশাদ সরকারের তৎকালীন শাসনামলে বামপন্থী নাস্তিক ভি.সি সিরাজুল ইসলামের ইসলামবিরোধী অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহিস্কার হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন সভাপতি নাজমুল হক সাঈদী ও সেক্রেটারী ইউসুফ ভাই আর জেল-জুলুম নির্যাতনের স্বীকার হন ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা। ১৯৮৯ সালের ৩রা মার্চ ভিসি সিরাজুল ইসলামের আওয়ামী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা নারকীয় সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে শতাধিক রুম ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। চিরকালের জন্য পঙ্গুত্বকে বরণ করেন অনেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকার গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরের পেছনেও রয়েছে ইসলামদ্রোহী শক্তির গভীর ষড়যন্ত্র। কুষ্টিয়ায় অস্থায়ী ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এ কাফেলার নেতা কর্মীরা দ্বীনের কাজ শুরু করেন অসাধারণ হিম্মত ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে কুষ্টিয়া শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এ কাফেলার মজবুত ঘাটিতে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের পূর্বে ইসলামী ছাত্রশিবির নামক এ শহীদি সংগঠনের সাথে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহের সাধারণ মানুষের খুব বেশী পরিচিতি ছিলেন না। এলাকায় শিবিরের যেমন কোন দায়িত্বশীল সাংগঠনিক প্রোগাম করতে গেলে সাধারণ মানুষ উৎসুক্য দৃষ্টিতে দেখতে আসতো। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত দিয়ে যখন বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও কর্মীদেরকে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়েছিলো খুব অল্প দিনেই। এ কাফেলার জানবাজ নেতা কর্মীরা এলাকার সাধারণ মানুষের আপন জনে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৯১ সালের ৪ঠা এপ্রিল পবিত্র রমজান মাসে রক্তাক্ত করা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সেক্রেটারী রফিক ভাইকে (বর্তমানে আমেরিকায় কর্মরত) ১৯৯১ সালের ৩১শে আগষ্ট খোদাদ্রোহী শক্তির মারাত্মক হামলার শিকার হন শিবির নেতা আছাদুজ্জামান, আবু সাঈদ মাহফুজ ও গাজী মহসীন। পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে এ কাফেলার অগ্রাযাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা করা হলো বার বার। সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে হামলা করে রক্তাক্ত করা হলো শিবির নেতা আবু সাঈদ মাহফুজ ও আসাদুজ্জামানকে। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা নিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল, তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ক্যাম্পাস পরিবারের মধ্যমনি জা.ক.ম. আব্দুল হাই, গাজী মুহসীন, আদম, জাকির, কল্লোল, সাইদুজ্জামান, ছানাউল্লাহ, বি,এ, রউফ, হাক্কানী, সেলিম, আল মামুন, সহ ক্যাম্পাসে ভূমিকার ক্ষেত্রে যারা আপোষহীন ছিলেন তাদের উপর মিথ্যা মামলা চাপানো হলো।

পরিস্থিতি এমন হলো দিনের বেলায় পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে নেতা কর্মীদের আহত করা হতো আর রাতের আধারে পুলিশি হয়রানী। সব মিলিয়ে এ কাফেলার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার সব প্রকার অপচেষ্টা করা সত্বেও এ দ্বীনি সংগঠন তার মুল লক্ষ্য পানে এগিয়ে গেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ইসলামী ছাত্রশিবিরের দুর্ভেদ্য ঘাটিতে পরিণত হয়েছে। মুলত তিল তিল করে গড়ে তোলা এ কাফেলার প্রতি সাধারণ জন মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার

www.pathagar.com

কারণে শুরু থেকেই এ বিদ্যাপীঠ মুক্তিকামী ছাত্রজনতার হৃদয়ের স্পন্দন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রজনতার প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনি চরিত্র ধ্বংসের জন্য ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে রক্তের নেশায় মেতে উঠে। ক্যাম্পাসের সবুজ জমিন শহীদি রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বারবার। শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন, আমিনুর রহমান, আল মামুন, মুহসীন কবির ও রফিকুল ইসলামের মতো মেধাবী ছাত্রদের শাহাদাতের নজরানা পেশ, অসংখ্য ভাইয়ের বুলেট বিদ্ধ দেহ নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনা হাত, পা চক্ষু হারানোর বেদনা সহ ক্যাম্পাসের সবুজ জমিনের উপর শহীদি রক্তের ছোপ আজো অতীতের বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া নারকীয় তান্ডবতার নৃশংস ঘটনার নীরব স্বাক্ষী।

দুই

১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুল ক্যাম্পাসে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী দিবসেই রামপন্থী কতিপয় শিক্ষকের উস্কানীতে ছাত্রদল সহ তথাকথিত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর পরিকল্পিত সন্ত্রাস শুরু করে। মুলতঃ প্রথম থেকেই ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করে রাখা হবে এ ছিলো ইসলামদ্রোহী শক্তির মুল পরিকল্পনা। তৎকালীন সরকারের চাপিয়ে দেয়া সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশের মাধ্যমে শহীদি কাফেলার বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুল হাই ভাই, সেক্রেটারী সহ ক্যাম্পাসে মুল ভূমিকা পালনকারী দায়িত্বশীলদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো মিথ্যা মামলা। একদিকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় সবে মাত্র তার যাত্রা শুরু করেছে এক সবুজ মরুউদ্যানে অন্যদিকে ক্যাম্পাসের বাইরে অজানা অচেনা অজ পাড়াগাঁর সাধারণ জন মানুষ। চাপিয়ে দেয়া মিথ্যা মামলার জন্য পুলিশী হয়রানীর তীব্রতা এতই প্রকট ছিলো যে প্রতিদিন জরুরী বৈঠক বসে ক্যাম্পাসের জন্য নতুন দায়িত্বশীল ঘোষণা করা হতো। যিনি আজকের দায়িত্বশীল ঘোষিত হলেন পুলিশী হয়রানীর তীব্রতার কারণে তাকে আগামী কাল দায়িত্বশীল হিসেবে ময়দানে রাখা যেতো না। কয়েক ডজন মিথ্যা মামলার হুলিয়া মাথায় নিয়ে এ কাফেলার রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে ক্যাম্পাসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালিন বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুল হাই ভাই। যাকে গ্রেফতার করার জন্য নগদ ১০ হাজার টাকাও পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সব মিলিয়ে শাসক গোষ্ঠীর ন্যাক্কারজনক ভূমিকার পাশাপাশি তথাকথিত ছাত্র ঐক্যের পরিকল্পিত সন্ত্রাসের কারণে দেশের তৌহিদী মানুষের আবেগ ও ভালবাসার ক্যাম্পাস রক্তাক্ত জনপদে পরিণত হয়। ২৫শে নভেম্বর ৯২ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্ববর্তী হরিনারায়নপুরের পাঞ্জেরী ছাত্রাবাস জ্বালিয়ে দিয়ে পেশাদার খুনীরা কুপিয়ে কুপিয়ে অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সদ্য ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়া সাইফুল ইসলাম মামুন ভাইকে। ১৬ই নভেম্বর ৯২ তারিখে ১ম বর্ষের ছাত্র হিসেবে প্রথম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেন ২৫শে নভেম্বর ৯২ তারিখে নিজেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করলেন। মাত্র ১০ দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন তাঁর। এ কয়টি দিনে তিনি ইহকাল ও পরকালের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সার্টিফিকেট শাহাদাৎ লাভ করলেন। সেদিনই গাড়াগঞ্জে খোদাদ্রোহী জালিমরা মঞ্জু ভাই ও ওয়ালীউল্লাহ ভায়ের হাত-পা, মাথা পায়ের রগ রামদা দিয়ে কেটে কেটে জবাই করারও চেষ্টা করলো কিন্তু তাদের ভাগ্যে শাহাদাৎ নসীব হলোনা। আজো পার্শ্ববর্তী এলাকায় দ্বীনের কাজের জন্য সব সময় পেরেশানী যার তিনি হচ্ছেন অর্ধ পঙ্গু মঞ্জু ভাই। রামদা আর কুড়ালের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত মোয়াজ্জেম ভাইকে দেখলে হযরত খাব্বাব (রাঃ) এর কথা মনে পড়ে। ৫৫টি সেলাই ছিলো তার নিথর দেহে। এভাবে কত রক্ত ঝরিয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ক্যাম্পাস দ্বীনের জন্য পাগলপারা সে সব পুর্বসুরী ভাইয়েরা। ১৯৯৩/৯৪ সালের পুরো ভাগ জুড়েই ছিলো এ কাফেলার উপর জেল, জুলুম নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। কারাগারকে আপন নিবাস হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিবির নেতা গাজী মুহসীন, সানাউল্লাহ, আব্দুল হান্নান, সেলিম আল মামুন শাহীন, রবিউল আজিজ প্রমুখ নেতা কর্মীরা। ইতিহাসের গতিধারায় তারা ছিলেন আমাদের অগ্রজ আমাদের প্রেরণা। ক্যাম্পাস জীবনের প্রতি বাঁকে বাঁকে তাদের চলার কদম খুঁজে পেয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে ঢুকলে গভীর মমতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জিজ্ঞেস করতেন আমাদের সে সব অগ্রজদের কথা যা ক্যাম্পাস জীবনে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে -

তিন

১৯৯৫ সাল তৎকালীন ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের অন্তিম মুহূর্তকাল হেতু ক্যাম্পাসে অনেকটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করে। যদিও সেশনের শুরুতে একটা পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা দাঁত ভাঙ্গা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছ। সন্ত্রাসীদের শেষ চিহ্ন মুছা অবধি সেই দুঃসাহসিক প্রতিরোধে ক্যাম্পাস থেকে পলায়ন করে হাতে গোনা ক'জন সন্ত্রাসী। যে সব সন্ত্রাসীদের বিষাক্ত নখরে ক্যাম্পাস প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হতো এ কাফেলার মজলুম কর্মীরা সেদিন শাহাদাতের নেশায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলে। ক্যাম্পাসের সবুজ জামিন রক্তে রঞ্জিত হয়। মজলুম ছাত্রজনতার হৃদয়ের স্পন্দন ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর এ মিথ্যা মামলার বেসাতী চলতে থাকে। অবশেষে ২০০২ সালের নভেম্বরে মাননীয় আদালত শিবির নেতা কর্মীদের বেকসুর খালাস দিয়ে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। মিথ্যার ধ্বংশস্তুপের উপর সত্যের পতাকা আবার ও উড্ডীন হলো। সহাস্য বদনে সত্যের জয়গান গেয়ে গেয়ে মুক্তিকামী ছাত্রজনতার সম্মুখ সারির মিছিলে এসে শামিল হলেন সদ্য বেকসুর খালাস পাওয়া পড়াশুনা ও সাংগঠনিক কাজের মধ্যে ভারসাম্যের নজীর

www.pathagar.com

স্থাপনকারী সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি গোল্ড মেডেলিস্ট এ.ডি.এম. ইউনুস। ক্যাম্পাস পরিবারের একান্ত কাছের মানুষ আরেকজন সাবেক সভাপতি আছাদুজ্জামান। বেকসুর খালাস পেলেন ওয়াহিদুজ্জামান, সানাউল্লাহ, নজরুল ইসলাম, শাহীন ভাই প্রমুখ। মুলতঃ ১৯৯৫ সালের জুন থেকে ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক থাকার কারণে ইসলামী ছাত্রশিবির তার গঠনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীসহ পুরো ক্যাম্পাস পরিবারে একটা অদ্বিতীয় অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়। ক্যাম্পাসের ছাত্রজনতার একক প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্রসংগঠন হিসেবে ইসলামী ছাত্রশিবির তার অবস্থানকে আরো সুসংহত করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্ববর্তী এলাকায় সাংগঠনিক কাজের গণভিত্তি রচিত হয়। এলাকার আবাল, বৃদ্ধবণিতা ইসলামী ছাত্রশিবিরের জন্য নিজের শেষ সম্বলটুকুনও বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল স্কুল কলেজে ইসলামী ছাত্রশিবিরের একক অবস্থান ঘাপটি মেরে থাকা খোদাদ্রোহী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এ কাফেলার একক অবস্থান যখন আরো সুসংহত হচ্ছিলো বস্তুবাদী আদর্শের ধ্বজাধারী ধর্মনিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির লেজুড়বৃত্তি ছাত্রলীগ এলাকার নিষিদ্ধ ঘোষিত সর্বহারা সন্ত্রাসীদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে তৎকালীন আওয়ামী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মদদে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পাসে খুনের নেশায় মেতে উঠে। ২৫শে সেপ্টেম্বর ৯৬ মাগরিবের নামাজ পড়ে মেইনগেট থেকে কর্মীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ক্যাম্পাস পরিবারের প্রিয় মানুষ আছাদুজ্জামান ভাই যখন হলে ফিরছিলেন পূর্বে থেকেই ওৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা অতর্কিত আক্রমন চালায়। রামদার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয় প্রিয়নেতা আছাদুজ্জামান ভাই এর পুরো শরীর। মারাত্মকভাবে আহত হয় রফিক ভাই, আবু জাহের, মিজানুর রহমান ভাই সহ প্রমুখ নেতা কর্মী। পরদিন ২৬শে সেপ্টেম্বর রচিত হয় এদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে হক ও বাতিলের চিরাচরিত দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরতম অধ্যায়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী ছাত্রলীগের হায়েনারা নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসীদের সহযোগীতায় হল ও ক্যাম্পাস দখলের ব্যর্থ অভিলাষে নৃশংসভাবে খুন করে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিবির নেতা আমিনুর রহমানকে। বুলেটের আঘাতে বুক, চোখ, মুখ ঝাঝরা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রায় ১৮০ জন নিরপরাধ শিবির নেতা কর্মী। শহীদ আমিন ভাইয়ের বুকে, নিম্নাংশে ও পায়ে ২০টি গুলিবিদ্ধ হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শিবির নেতা শফিক ভাইয়ের ডান পা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মারাত্মক ভাবে পুরো শরীর বুটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শিবির নেতা আবুল কালাম মজুমদার, জামিনুর রহমান, হেদায়েত উল্লাহ, ইব্রাহিম সরওয়ার, আবুল কালাম আজাদ, তাজুল ইসলাম, মাহবুব বিল্লাহ, আবু তাহের, নেসার উদ্দীন, মোশারফ, হান্নান, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল মালেক প্রমুখ নেতা কর্মী।

www.pathagar.com

হায়েনারা চিরদিনের জন্য কেড়ে নেয় শিবির নেতা মামুনুর রশিদের একটি চোখ। বুলেটের আঘাতে মামুন ভায়ের বাম চোখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। বিশ শতকের বদর ময়দান ২৬শে সেপ্টেম্বরের ভয়াল নৃশংসতার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। ১৯৯৮ সালের ৩১শে অক্টোবর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রচিত হলো ইতিহাসের আরেক কালো অধ্যায়। আওয়ামী ছাত্রলীগ শতাধিক বহিরাগত দাগী সন্ত্রাসী সহ ক্যাম্পাসে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যোগ সাযশে একদিকে আওয়ামী পুলিশ বাহিনী অন্যদিকে পুর্ব থেকেই রক্তের নেশায় মেতে থাকা ছাত্রলীগ হায়েনারা নিরপরাধ শিবির কর্মীদের উপর যৌথ গুলিবর্ষন শুরু করে। মুহূর্তেই ক্যাম্পাস আঙ্গিনা শাহাদাতের রক্তে রঞ্জিত হয়। বুলেটের আঘাতে বুক ঝাঝড়া হয়ে যায় শিবির নেতা আল মামুন ও মহসীন কবীরের। শত চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি এ দুজন নিরাপরাধ শিবির নেতাকে। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহসীন কবির ও আলমামুনকে চির শান্তির জান্নাতের বাসিন্দা হিসেবে তুলে নিলেন। মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাতের পথে ছিলেন শিবির নেতা নাজিমুদ্দীন, এমদাদ উল্লাহ। ক্যাম্পাস আবারও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শহীদের সাথীরা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান নেয়ার পর সেখানেও ছাত্রলীগের হায়েনারা দফায় দফায় হামলা করে। শাহাদাতের নেশায় উজ্জীবিত শহীদের সাথীদের প্রবল প্রতিরোধে সন্ত্রাসীরা পালাতে বাধ্য হয়। ২০০০ সালের ৬ই আগস্ট প্রকাশ্য দিবালোকে শিবির নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে আওয়ামী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শিবির নেতা মোঃ উল্লাহ নুরুল আমিন ও জাহাঙ্গীর হোসাইন সহ আরো অনেকে। আওয়ামী দুশাসনের পুরো সময়টাই ছিলো হত্যা, সন্ত্রাস, নির্যাতন ও জেল জুলুমের স্টীম রোলার।

চার

শহীদ রফিকুল ইসলাম। আমাদের সকলের প্রিয় রফিক ভাই। হক ও বাতিলের চিরাচরিত দ্বন্দ্বের মাঝে যিনি ছিলেন আপোষহীন, সত্যের সেনানী। আওয়ামী দু'শাসনের পুরো সময়টাই তাঁর সাথে কাটিয়েছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তস্নাত ক্যাম্পাসে। ১৯৯৪/৯৫ শিক্ষাবর্ষে দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজে ভর্তি হলেন রফিক ভাই। ভর্তির সময় তিনি যশোরের শার্শা থানার শহীদি কাফেলার যিম্মাদার ছিলেন। শাহাদাতের সময় ২০০১ ৮জুলাই তার আর মাত্র ৩টি কোর্স পরীক্ষা বাকী ছিল আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা জীবন শেষ করার। মহান রব তাঁকে মাস্টার্সের সার্টিফিকেটের পরিবর্তে আসমান ও জমিনের সবচেয়ে মর্যাদাবান সার্টিফিকেট শাহাদাত দিয়ে তাঁর কাছে তুলে নিলেন। শহীদ রফিকের সাথে ক্যাম্পাস জীবনের প্রথম দিন থেকেই আমার পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়। অফিস বিভাগের দায়িত্ব পালন করার সুবাধে তৎকালিন বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

সভাপতি এ.ডি.এম. ইউনুস ভাই একদিন ডেকে বললেন দাওয়াহ বিভাগে একজন সদস্য প্রার্থী এসেছেন নাম রফিকুল ইসলাম। আমি খুজে রফিক ভাইকে নিয়ে গেলাম। পরবর্তীতে ইউনুস ভাই রফিক ভাইকে গাড়াগঞ্জের জনশক্তি হিসেবে কাজ করতে বলেন। খুব অল্প দিনেই শহীদ রফিক ভাই গাড়াগঞ্জের সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজনে পরিণত হলেন। অনেকবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে গিয়ে সত্যিই অভিভূত হয়েছি এলাকার মুরুব্বী ও যুবকদের সাথে তার মধুর সম্পর্ক দেখে। গাড়াগঞ্জ থেকে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত দিয়ে যখন শহীদ রফিক ভাইকে মদনডাঙ্গা শাখার সভাপতি করা হয় খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এলাকায় সংগঠনকে তৃনমুল পর্যায়ে সম্প্রসারণ করেছিলেন। এলাকার সুধীরা নতুন প্রাণ খুঁজে পেল। সংগঠনের সার্বিক ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার হলো। বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের BASE AREA হিসেবে মদনডাঙ্গা শাখাকে বেছে নিতে আমাদের বেগ পেতে হলোনা শুধুমাত্র শহীদ রফিকের অহর্নিশ প্রচেষ্টার কারনে। এদিকে আওয়ামী দুঃশাসনের তখন মাঝামাঝি পর্যায়। প্রতিনিয়ত সংঘাত, সংঘর্ষের আশংকা। আওয়ামী ছাত্রলীগের হায়েনারা প্রতিদিন ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে। শতাধিক বহিরাগত দাগী সন্ত্রাসীর ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন খুনী সন্ত্রাসীদের সাথে শলা পরামর্শে ব্যস্ত দিন রাত। সপ্তাহে কয়েকবার ক্যাম্পাসে আচমকা গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটছে। গুলিবিদ্ধ হচ্ছেন শিবির নেতা কর্মীরা। শহীদের তপ্ত তাজা খুনে ক্যাম্পাসের সবুজ জমিন রঞ্জিত হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য শহীদ রফিকের আপোষহীন ভূমিকা ক্যাম্পাসে জনশক্তির প্রাণে প্রেরণার সঞ্চার করতো। দায়িত্বশীলরা খুঁজে পেতেন নির্ভরতার ঠিকানা। ক্যাম্পাস পরিবারের কাছে শহীদ রফিক পরিচিত ছিলেন বাতিলের সাথে আপোষহীন সেনানী হিসেবে। তার ক্যাম্পাস জীবনের ইতিহাসে যত সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে তার সব গুলোতে সম্মুখ সারিতে থেকে অকুতোভয় সেনানীর মত ভূমিকা রেখেছেন শহীদ রফিক। শহীদ রফিকের ক্যাম্পাস জীবন পুরোটাই আমার স্মৃতিপটে কিলবিল করছে। লিখতে বসে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা লিখি। সাদ্দাম হল সভাপতি থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাস পরিস্থিতির ব্যাপারে ভয়ানক ইনফরমেশন আসছিল তখন শহীদ রফিককে একান্ত কাছের সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলাম। শহীদ রফিকের অসম্ভব দৃঢ়তা, আমানতদারী, অনঢ় মনোবল, পার্থিব অভিলাষ মুক্ত অনাড়ম্বর জীবন জনশক্তি ও দায়িত্বশীলদের বরাবরই মুগ্ধ করতো। সদস্যপ্রার্থী থাকাকালীন একদিন ডায়েরী দেখে পড়াশুনার ব্যাপারেই শুধু পরামর্শ দিয়েছিলাম। প্রায়ই বলতেন মুজাহিদ ভাই ইসলামী আন্দোলনের এ মিশনই আমার জীবনের চুড়ান্ত ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ারের নেশায় পাগলপারা হয়ে যারা সংগঠনের গঠনমূলক কাজে এবং এলাকায় জন মানুষের মাঝে সময় ব্যয় করতেন না তাদের ব্যাপারে বরাবরই তিনি সোচ্চার ছিলেন। সম্মুখ সমরে থেকে শহীদ রফিক শাহাদাতের

www.pathagar.com

তামান্না পোষণ করতেন। তাইতো মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে সবার উর্ধ্বে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ Carreer Build up করে আমিন, মামুন, আল মামুন, মহসীনের পথ ধরে সুদুরের গম্বুজে পৌঁছে গেলেন চির শান্তির জান্নাতে।

পাঁচ

২০০১ সালের ১৪ই জানুয়ারী সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হলাম। শহীদি কাফেলার মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বললেন। ৯ই জুন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মাগরিবের আজানের জন্য মুয়াজজিন তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। ঠিক এ মুহূর্তে C.D.C. তে প্রবেশকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক জিয়া হল সভাপতি নুরুর রহমান ভাই জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে বললেন আমাদের প্রিয় রফিক ভাই শাহাদাৎ বরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি------রাজিউন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ভ হয়ে গেলাম। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। কিছুই হিসাব মিলাতে পারছিলাম না। রাত ১১টার কোচে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কলাবাগান ফোন করে নামাজে জানাজাসহ সার্বিক খোঁজ খবর নিলাম। পরদিন সকাল ৯টায় অগ্রণী চত্বরে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে সিদ্ধান্ত হলো। ভোর ৪টায় ঝিনাইদহের আল হেরাতে পৌঁছলাম। শহীদের সাথীদের কান্নার রোলে ঝিনাইদহের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সাবেক সেক্রেটারী আহসানুল কবীর মুক্ত ভাইকে পেয়ে তাঁর কাছ থেকে ঘটনা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। এদিকে মাত্র কিছুদিন পূর্বে ক্যাম্পাসে সংঘটিত এক তুচ্ছ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলাম। হলের সামনে পরিকল্পিত ভাবে জড়ো হয়ে জাসদ ছাত্রলীগের কতিপয় সন্ত্রাসী একের পর এক সিগারেট খেয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছিলো। এক পর্যায়ে হলের সামনে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে কয়জন সন্ত্রাসী আহত হয়। কর্তৃপক্ষ হল বন্ধের ন্যাক্কারজনক সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্রদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। অথচ হল বন্ধের মত কোন পরিস্থিতি তৈরী হয়নি। মাস্টার্স সমাপনী পরীক্ষা চলছিল। আর মাত্র দুটি পরীক্ষা বাকী। অগত্য আবার ঢাকা চলে আসতে হচ্ছে। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে জনশক্তিরা দায়িত্বশীলসহ ঝিনেদায় আল হেরাতে অবস্থান নিলো। দীর্ঘ ৭ বৎসরের অতি চেনা মুখ যাদের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক সে সব দ্বীনি ভাইদেরকে ফেলে ঢাকায় আসতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। ঢাকায় আসার মাত্র সপ্তাহ খানেক পর শহীদ রফিকের শাহাদাতের সংবাদ শুনে শহীদের সাথীদের সাথে মিলিত হলাম ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে। ঝিনাইদহের অগ্রণী চত্বরে নামাজে জানাযার পর শোকাহত সাথীদের নিয়ে শহীদ রফিকের নিজবাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসর ডঃ এ.এইচ.এম. ইয়াহ ইয়ার রহমান কার্যকরী পরিষদ সদস্য শাহাদাৎ হোসাইন ভাই, এমাজ উদ্দীন মন্ডল ভাই ও আমি একই

www.pathagar.com

মাইক্রোতে ছিলাম। যাত্রাপথে শহীদের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ হচ্ছিলো। মাত্র ৩টি পরীক্ষা শেষ করলে যার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হতো, যাকে নিয়ে বাবা মার এত প্রত্যাশা, আজ তাকে এভাবে লাশ হয়ে মায়ের কোলে ফিরতে হচ্ছে। এসব কথা বারবার মনে পড়ছিলো, কিভাবে শহীদ রফিকের বাবা মার কাছে সান্তনা দেয়া হবে। শহীদের বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। আব্বা, আম্মা ভাইবোন, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনসহ শহীদের সাথীদের কান্নার রোলে যে দৃশ্যের অবতারণা হলো তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। শহীদের আব্বা বার বার বলছিলেন, আমার ছেলের রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে তোমরা যদি দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে পারো তাহলেই আমি শান্তনা খুঁজে পাবো। তোমরা শহীদ রফিকের উত্তরসুরী হিসেবে তার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করে কলেমার পতাকাকে ইবির ক্যাম্পাসে চিরকাল উড্ডীন রাখবে তাহলেই আমার রফিকের শাহাদাৎ সার্থক হবে। শহীদের সাথীরা বজ্র কঠোর শপথে বলিয়ান হয়ে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে শাহাদাতের তামান্নাকে আরো শাণিত করলো। বাতিলের শেষ চিহ্ন মুছা অবধি আমরা নীরব হবো না, নিথর হবোনা এ ছিলো শহীদের উত্তরসুরীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। নতুন শপথে নতুন ক্যাম্পাস গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শহীদের সাথীদের নিয়ে আমরা ফিরে আসলাম। যে স্বপ্নীল ক্যাম্পাসের স্বপ্ন দেখতেন শহীদ রফিক তা বিনির্মানের দায়িত্ব এ কাফেলার অন্তর্ভূক্ত আমাদের সবার। শহীদের উত্তরসুরী হিসেবে আদালতে আখেরাতে শহীদ রফিক, আমিন, মামুন, আল মামুন ও মহসীনের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব কি আমরা ঠিক ঠিক দিতে পারবো? এ আত্ম সমালোচনায় জাগ্রত হওয়ার সময় এসেছে আজ। মনে রাখতে হবে এ শহীদি কাফেলার রক্ত পিচ্ছিল পথের দায়িত্ব পালন করে জান্নাতে যাওয়া যত সহজ তার চেয়ে শত গুন বেশী সহজ জাহান্নামে যাবার। ক্যারিয়ার গঠনের নেশায় যারা শহীদের রেখে যাওয়া যিম্মাদারী পালনে চরম উদাসীন ছিলেন তাদেরকেও আদালতে আখেরাতে শহীদদের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। মহান রব যেন তার দ্বীনের কঠিন যিম্মাদারী যথাযথ ভাবে পালনের তৌফিক দেন এই শুধু কামনা থাকবে আমাদের সবার।

ছয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিকত্ব ধ্বংশের সুগভীর ষড়যন্ত্র আজো থেমে নেই। এ বিদ্যাপীঠ তার নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে স্বগৌরবে পরিচালিত হোক তা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষ ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি কখনো চায়নি। যদিও পরিস্থিতির পরিবর্তনে ঘাপটি মেরে থাকা সে সব কুচক্রী মহল এখন অনেকটা নিষ্ক্রিয়। অতীতের শাসক গোষ্ঠীর বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও বামপন্থী মহল বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পিত হত্যা, সন্ত্রাস ও কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্টের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তাদের নোংরা ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকার ক্যাম্পাসের একক বৃহত্তম ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী

www.pathagar.com

ছাত্রশিবির। ১৯৯২ সালের ২৫শে নভেম্বর থেকে ২০০১ সালের ৮ই জুন পর্যন্ত পাঁচজন মেধাবী শিবির নেতা হত্যা ও প্রায় ৫ শতাধিক নেতা কর্মী আহত হয়েছেন। পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন প্রায় ৩০ জন ভাই। এ সকল দুঃখজনক ঘটনার তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আজো পর্যন্ত একটি কমিটিরও রিপোর্ট প্রকাশ করেননি। উপরন্তু বিভিন্ন সহিংস ঘটনার যারা নায়ক তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে চাকুরী দিয়ে পুরুস্কৃত করেছেন। আজ সময়ের দাবী অতীতের বিভিন্ন নৃশংস ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করে খুনীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ। আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যারা ক্যাম্পাস থেকে লাশ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে গেছেন তাদের জন্যে কি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছুই করার নেই।? সারা জীবনের জন্যে যারা পঙ্গুত্বকে বরণ করে নিয়েছেন তাদের করুন চাহনী কি কর্তৃপক্ষের মন গলেনা? ৫ জন মেধাবী ছাত্রের বাবা মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনের কর্ণকুহুরে কী পৌছাবে কোন দিন? কে দেবে এসব প্রশ্নের জবাব? দেশবাসী আশা করছে বর্তমান সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৫ জন শহীদের খুনীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতিকে অভিশাপ মুক্ত করবেন।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি, সাদ্দাম হোসেন হল, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ই.বি.।

www.pathagar.com

ইসলামের বন্ধু হয়েই জীবন দিলেন যিনি

মোঃ মাহফুজুর রহমান
অর্থনীতি মাষ্টার্স

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে উৎকৃষ্টতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাদেরকে নিক্ষেপ করেছেন-নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম স্থানে। এরূপ নিকৃষ্টতম স্থান থেকে কেবল তারাই স্বীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, এবং তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন-"এবং যারা পরস্পরকে হকের ও সবরের দাওয়াত দেয়।"

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদাতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীকে বানিয়েছেন পরীক্ষাগৃহ হিসাবে। যার ফল লাভ করা যাবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। এ পরীক্ষাগারে মানুষকে অনেক কিছু দিয়েই পরীক্ষা করা হবে। যেমন-ভয়ভীতি, ক্ষুধা-দরিদ্র, জান-মাল ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির দ্বারা। এ সব ব্যাপারে যারা ধৈর্য্য ধারণ করবে তাদের জন্যই রয়েছে অনাবিল জান্নাতের সুসংবাদ।

সেই প্রত্যাশিত, বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত জান্নাত পেতে হলে অবশ্যই তাদেরকে (মানুষকে) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন এভাবে; "মানুষ কি মনে করেছে তারা ঈমান এনেছে এ কথা বললেই ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।"

পার্থিব জগতের পরীক্ষাগুলোতে যেমন কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা রয়েছে, ১ম, ২য়, কিংবা ৩য় বিভাগ রয়েছে, রয়েছে স্টার, স্কলারশীপ কিংবা বোর্ড স্ট্যান্ডের

www.pathagar.com

মর্যাদা, বিপরীত পক্ষে রয়েছে-ফেল, বহিস্কার কিংবা আরো অনেক কিছু এবং একই সাথে রয়েছে তদনুরূপ ফলাফল।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার অমোঘ এ বিধানের দ্বারা গৃহিত পরীক্ষা সমূহেরও নিশ্চিত ফলাফল রয়েছে।

যাদের পরীক্ষা যত বেশী কঠিন হবে; তাদের পুরস্কার বা ফলাফলও তত মূল্যবান হবে। ইতিবাচক ফলাফলের কারণে প্রাপ্ত গ্রেড অনুযায়ী পরকালীন প্রাপ্তির বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে। যা জান্নাতুল আদ্‌ন থেকে জান্নাতুল ফিরদাউস পর্যন্ত সীমায়িত হবে।

বিপরীত পক্ষে ও অর্থাৎ অকৃতকার্যদের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতি নেতিবাচক রয়েছে যা জাহান্নাম হতে হাবিয়াহ পর্যন্ত সীমায়িত।

এরূপ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়/পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত হয়েছেন আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা যাদের মধ্যে রয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ক্ষণজন্মা প্রতিভা আমাদের প্রিয় নেতা শহীদ রফিকুল ইসলাম।

রফিক শব্দের অর্থ বন্ধু, অন্তরংগ বন্ধু বা সাথী। আর ইসলাম অর্থ তো ইসলাম। ইসলামের বন্ধু। নাম এবং কাজের কি অভূতপূর্ব মিলন, কি চমৎকার সামঞ্জস্য। তাই তো কিনা 'ইসলামের' বন্ধুর জন্য রফিক (বন্ধু) হয়ে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস উৎসর্গ করেছেন। ত্যাগ এবং কুরবানীর নজরানা পেশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী ও সদা তৎপর। নিজের শত সমস্যাকে উপেক্ষা করে অন্যদের সমস্যা সমাধানে ছিলেন নিরন্তর নিয়োজিত।

একজন ছাত্র হিসাবে প্রত্যেকেরই সুপ্ত কামনা-বাসনা থাকে ভাল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেকে ভর্তি করা। যেমন বুয়েট, বি.আই.টি মেডিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে। কিন্তু যোগ্যতা না থাকায় অনেকে দরখাস্তই করতে পারে না। আবার প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় অনেকেই ঝরে যায়। আবার যারা ভর্তি হতে পারে তাদের সকলেই ভাল রেজাল্ট করতে পারে না বা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয় না। অধিকন্তু; প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেও সবাই উচ্চতর শিক্ষার জন্য 'স্কলারশীপ' পায়না।

অনুরূপভাবে-আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করার যোগ্যতা সকলের থাকেনা। আবার যাদের যোগ্যতা থাকে তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর ধরণ একই রকম হয়না। ফলে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাদের প্রাপ্তির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হবে এটাই স্বভাবিক। আর তাইতো আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা 'স্কলার শীপ' পেয়েছেন তারা অনন্ত রিযিক লাভ করেছেন এবং মুক্ত বিহঙ্গের মত সবুজ পাখির ডানায় ভর করে শ্রেষ্ঠতম জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছেন এ ডাল থেকে ও ডালে।

শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাই, প্রিয়তম প্রভুর 'স্কলারশীপ' নিয়ে জান্নাতে গিয়েছেন। আল্লাহপাক কেন অন্যদেরকে কবুল না করে তাঁকে কবুল করলেন? এ কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

(ক) তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলী পালনে একনিষ্ঠ, বিনয়ী ও অনমনীয়। আশিদ্দায়ু আলাল কুফফার ওয়া রুহামায়ু বাইনাহুম'। তাইতো মুনাফিক, ফাসিক ও তাগুতী শক্তির প্রধান টার্গেট হয়ে পড়েন প্রিয় ভাই রফিকুল ইসলাম। অন্যদিকে তাঁর সাথীরা তার বিরহে আজো কাতর এবং শোকে মুহ্যমান। তাইতো দেখি রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের শাহাদাতের পর অনেকেই আর 'জিয়াউর রহমান হলে' যায়না তার শোককে সহ্য করতে পারেনা বলে।

(খ) প্রিয় ভাই রফিকুল ইসলাম ছিলেন ঃ "আল মুসলিমু মান সালেমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহী ওয়া ইয়াদিহী এ হাদীসটির মূর্ত-প্রতীক। আমার ক্ষুদ্র সাংগঠনিক জীবনে তাকে কখনো এমন দেখিনি যে, তাঁর আচার আচরণ, চাল-চলন, কিংবা কথাবার্তায় মুনাফিক, ফাসিক ও কাজে ফাঁকি দেয় এরূপ ভিন্ন অন্য কেউ কখনো কষ্ট পেয়েছে। সত্য কথা অকপটে বলার মত হিম্মত আমাদের মধ্যে শুধু তাঁরই ছিল। তাইতো-কোন প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি কিংবা-দায়িত্বশীলদের সংশোধনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন যেমন কঠোর তেমনি আনুগত্য পরায়ন। তিনি বলতেন দায়িত্বশীল কিংবা কর্তৃপক্ষের সামান্য ভুল কিংবা অদূরদর্শিতা গোটা সংগঠন কিংবা প্রশাসনের অপমৃত্যু ডেকে আনবে।" তিনি বলতেনঃ "মাথা যদি পচে, তাহলে আর দেহ থেকে লাভ কি?"

(গ) তিনি ছিলেন শিশু সুলভ সরলতায় ও প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর একজন প্রচন্ড সম্মোহীন ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। আর সে জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা-শেখপাড়া, আনন্দনগর, মদনডাংগা, রতি ডাংগা, শান্তিডাংগা, মধুপুর পূর্ব ও পশ্চিম আব্দালপুর, ছোট বোয়ালিয়া, বড় বোয়ালিয়া প্রভৃতি গ্রাম থেকে ছুটে আসতো ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। তিনি তাদেরকে নিয়ে অনাবিল আনন্দে সময় কাটাতেন এবং উপহার দিতেন-কার্ড, ষ্টীকার, রুটিন ও বাগানের ফুল। তিনি পকেটে বাদাম, লজেন্স, চাটনি ইত্যাদি 'স্বল্পমূল্যের কিন্তু শিশু কিশোরদের মনভুলানো উপকরণাদী নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলোতে যেতেন। মৌমাছিরা মৌচাক যেমন ঘিরে রাখে, তেমনি প্রিয় ভাই রফিকুল ইসলামকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জটলা করে ঘিরে রাখতো। ফলে 'ছোট একটি পাড়া বা মহল্লা পার হতে অনেক বেশী সময় লাগতো। তাইতো দেখি তাঁর শাহাদাতের সংবাদ শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যুবক, বৃদ্ধ এমন কি এলাকার মাতৃতুল্য মা বোনেরাও কারবালার শোকের মত শোকাহত হয়ে কান্নার রোল তুলেছিল যা আজও কানে বাজে।

ঘ) তিনি ছিলেন দুঃখী মানুষের প্রিয়জন ও গরীবের সহায়। কে তার ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারছেনা, কে ব্যবসার পুঁজির অভাবে চা কিংবা পানের দোকান চালাতে পারছেনা, কার পারিবারিক কি সমস্যা আছে, কে শারীরীকভাবে অসুস্থ্য, কার শীতের কাপড় নেই, কে পরীক্ষার ফিস দিতে কিংবা বই কিনতে পারছেন এ সকল চিন্তায় এবং তার সমাধানে তিনি ছিলেন সদা-মশগুল। তাইতো আল্লাহপাক তাঁকে কবুল করেছেন এজন্য যাতে তিনি (আল্লাহ) তার প্রিয় গোলামকে উত্তম প্রতিদানে ভুষিত করতে পারেন।

www.pathagar.com

৬) তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। প্রতিটি কাজে প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করতেন। সুতরাং তিনি আল্লাহ তার হয়ে যাওয়া। তাইতো আল্লাহ তায়ালা তাঁর হয়ে গেছেন এবং দুনিয়ার সবকিছু তার জন্য নিরবে অশ্রু বিসর্জন করছে। তাঁর রেখে যাওয়া কাজগুলো অনাগত কাল ধরে প্রেরণার রসদ যোগাবে ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য।

এ ক্ষুদ্র পরিসরে প্রিয় ভাই রফিকুল ইসলামের বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবনের কোন একটি দিক ও আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা কায়মনো বাক্যে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি- হে আল্লাহ তুমি আমার প্রিয় ভাইটিকে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ মেহমানখানায় তোমার অতিথি হিসেবে কবুল করো। সেই সাথে আমাদের মত গুনাহগারদেরকে তোমার পথে আমৃত্যু টিকে থাকার তৌফিক দান করো এবং শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের মতই আমাদেরকেও তোমার পথে শাহাদাৎ বরণ করার পরমতম সৌভাগ্য নসীব করো। আমীন।

লেখক ঃ শিক্ষা সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ই.বি.।

www.pathagar.com

আমাদের রফিক ভাই

আমিনুল ইসলাম মুকুল

৭ই জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমূহ আকস্মিকভাবে বন্ধ করে দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিকেল পাঁচটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ হলো। আমরা ভার্সিটি গাড়ী যোগে ঝিনাইদহ আল-হেরা ইসলামিক ইনষ্টিটিউটে উঠলাম। শহীদ রফিক ভাই আমাদের সাথে ছিলেন। রাত্রে ই.বি সভাপতি রাসেল ভাই জরুরী সদস্য বৈঠক করে আমার একান্ত প্রিয় ভাই শহীদ রফিক এবং স্বপন কে শৃংখলা বিভাগের দায়িত্ব দিল। শহীদ রফিক ভাই একান্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি তার দায়িত্ব পালন করে গেলেন। রাতে আমরা ইশার নামাজ আদায় করে না খেয়ে শুয়ে গেলাম। কারণ তখনও রান্না হয়নি। শহীদ রফিক আমার বাম পার্শ্বে শুইলেন। রফিক ভাইর বাম পার্শ্বে শুইলেন আমার আরেক ক্লাস ফ্রেন্ড রায়হান আলী, রাত্রি প্রায় দুইটার সময় খাদ্য বিভাগের পরিচালক এম.এ. জলিল ভাই আমাদের খাওয়ার জন্য ডাকলেন। রফিক ভাই সহ আমরা সকলেই খেতে বসলাম। খাবার হিসেবে পেলাম শুধু খিচুরী। তখন আমার প্রিয় ভাই শহীদ রফিক বলেছিলেন "আমরাতো এতক্ষণ এখানে ঘুমিয়েছিলাম আর যারা খাদ্য নিয়ে আসছেন ওনারা জেগে রান্না করেছেন, পলিথিনে রেডি করেছেন, তারপর আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন সুতরাং ওনাদের প্রতি রাগ করছেন কেন, ওনারা সাধ্যমত চেষ্টা করেছে।" রাত দুইটার খাবার খেয়ে যখন আবার আল হেরার সেই "আমর ইবনুল আস" নামক মসজিদের মুজাইক করা ফ্লোরে শুইতে

www.pathagar.com

গেলাম তখন আমার ঠাণ্ডা লাগছিল। রফিক ভাইকে বললাম। রফিক ভাই একটা কার্পেটের ব্যবস্থা করলে ভাল হতো। তিনি কার্পেট নিয়ে আসলেন, দুইজন ভাই কার্পেটটি এমন ভাবে বিছালেন যে রফিক ভাইর জায়গাটা খালিই রয়ে গেল। তিনি বললে "আরে ভাই অসুবিধা নাই আপনারা শুয়ে পড়েন তো"। শহিদ রফিক ভাই শেষে কার্পেট ছাড়াই কাটালেন কারণ তিনি তো পরের রাত্রি থেকেই কার্পেট বিহীন এক অন্ধকার কবরে চলে যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম রফিক ভাই আপনার কি একটা লুঙ্গি আছে? কারণ আমার শীত করছিল। তিনি তার লুঙ্গিটা দিলেন। আমি বুকের উপর দিয়ে রাত্রিটা কাটালাম। তখন তো আমি জানতাম না যে এই লুঙ্গি আমার রফিক ভাইয়ের আর পরা হবে না। শহীদ রফিক ভাইয়ের সেই লুঙ্গিটা এখনো আমার ব্যাগে রয়েছে। কিন্তু আমার সেই প্রিয় ভাইটি কেন আমার কাছে লুঙ্গিটা চায় না। তিনি আর কোন দিন লুঙ্গি চাবেন না। তিনি তো জান্নাতী পোশাক পড়ে জান্নাতের বাগানে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভোরের আজানে আমাদের ঘুম ভেংগে গেলো, আমরা এক সাথেই ফজরের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করলাম, শরীরটা ক্লান্ত থাকার কারণে আমরা ফজরের পরে আবার ঘুমালাম। শহীদ রফিক ভাই কখন যে, আমার পাশ থেকে উঠে চলে গেছে তা আমি টের পাইনি। শুনলাম সমস্যা সমাধানের প্রসেসিং করতে রাসেল ভাইর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়েছেন। সেখানে কামাল ভাইর মেসে শিবির এবং জামায়াতের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে বিকাল ৪টায় সমঝোতা বেঠকে ই.বি সেক্রেটারী মোস্তাফিজ ভাই এবং রফিক ভাই যাবেন। কিন্তু এর পূর্বেই রফিক ভাই সহ আমাদের ৭/৮ জন ভাই জুমার নামাজ শেষে মদন ডাঙ্গা কামাল মেসে যখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনটি মোটর সাইকেল যোগে জাসদ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ মদদে মেসটি ঘিরে ফেলে। তাৎক্ষণিক ভাবে মেস ছেড়ে দিয়ে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত হলে সবাই চলে গেলেও আমার প্রিয় রফিক একটু পিছনে পড়েছিলেন, কারণ ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বশীল হিসেবে তিনি সবার পরে যাবেন এটাই স্বাভাবিক, হায়েনারা আমার প্রিয় ভাই শহীদ রফিককে ধরে ফেলে, পরে হায়েনারা নির্মম ভাবে চাপাতি এবং চাইনিজ কুড়াল দিয়ে উপর্যুপরি মাথায় আঘাত করে। হায়েনারা এতেও ক্ষান্ত হয়নি, তারা লোহার হাতুড়ী দিয়ে আমার প্রিয় ভাই শহীদ রফিকের মাথায় এতো জোরে আঘাত করে যে তার মাথার স্পাইরাল কড ছিড়ে যায়। দ্রুত হায়েনারা পালিয়ে যায় কিন্তু ততঃক্ষণে আমার প্রিয় ভাই শহীদ রফিক জান্নাতে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত নার্সরা জানালেন দ্রুত রক্ত দিতে হবে। আমি একটি ব্লাড ব্যাগ আনলাম, জিল্লু ভাই রক্ত দিলেন। ততঃক্ষণে ডাক্তার এসে রাসেল ভাইকে লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে বললেন This patient is out of treatment" এবং বিষয়টা বুঝতে পারলাম। ডাক্তাররা রফিক ভাইকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। রাসেল ভাই আমাকে বললেন ঢাকায়

www.pathagar.com

টেলিফোন করে রফিক ভাইর বড় ভাই মালেক ভাইকে দ্রুত আসতে বলেন। আমি টেলিফোন করলাম। কিন্তু ততঃক্ষণে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে। ইতিমধ্যে অপারেশন থিয়েটারে থেকে সংবাদ আসলো আমাদের প্রিয় ভাই রফিক শাহাদত বরণ করেছেন ইন্না---। সে দিনটি ছিল ৮ই জুন বিলেক ৪.০৪ মিঃ শুক্রবার)

রাত্রি ১১.৩০ টার দিকে আঃ মালেক ভাই ঢাকা থেকে আসলেন সরাসরি কফিনের কাছে। মালেক ভাই আমাকে দেখে বললেন মুকুল তোমার সাথে তো আমার রফিকের আলাদা একটা সম্পর্ক ছিল। আজ তোমাকে দেখছি কিন্তু আমার রফিক কই! সে দিন আমি কোন জবাব দিতে পারি নাই। মালেকভাই আরো বললেন আমি আমার রফিকের জন্য ২টা শার্ট পিচ এবং ১টা পেন্ট নিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার রফিক আজ সাদা কাপড় পরিহিত কেন? সেদিন আমরা এর কোন জবাব দিতে পারিনি। শহীদ রফিক কফিনের সাথে আমি তার গ্রামের বাড়ী সাতক্ষীরার লাঙ্গল দড়িয়া গ্রামে তাঁর আব্বার সাথে কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম আমি রফিক ভাইয়ের সহপাঠি। সে দিন তিনি বলেছিলেন 'আমার রফিক কোথায়! সে দিন আমরা এর কোন জবাব দিতে পারি নাই। কারণ আমার প্রিয় শহীদ রফিক ভাই তো অনেক আগেই তাঁর আসল ঠিকানা জান্নাতে চলে গিয়েছেন।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, শেখ মুজিবর রহমান হল ই.বি.।

www.pathagar.com

যে খুন যোগায় প্রেরণা

মোঃ আব্দুল হক

ফুল তার সুগন্ধি বিলিয়ে চলে, নদী তার দুকূলের তীরগর্ভকে উর্বর করে তোলে আর একজন শহীদের খুন ঝরে যে মাটিতে সে মাটি পরিণত হয়-দ্বীনের মজবুত ঘাঁটিতে।

শহীদের যত খুন ঝরবে
সব খুন মিশবে এ মাটিতে,
পরিণত করে দেবে দেশটা
আমাদের মজবুত ঘাঁটিতে॥

শহীদ রফিক এমনই এক জীবন্ত শহীদ যার খুন ঘোষণা করবে বাংলার এ জমিনে ইসলামী বিপ্লবের ইশতেহার, যে খুন আমাদের প্রেরণার উৎস।

শহীদ রফিক ভাই ছিলেন আমার দায়িত্বশীল। আমার সুযোগ হয়েছে তাঁকে অনেক বেশী কাছ থেকে দেখার। তাঁর মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি লক্ষ্যনীয় গুণাবলীর সমাহার। অতি বাস্তব যে কথাটি সেটি হল-মানুষ যখন মানুষের মাঝে বর্তমান থাকে তখন একজনমানুষ আরেকজন মানুষের মূল্যায়ন করতে পারেনা। মানুষের মাঝ থেকে হারিয়ে গেলেই কেবল অনুভূত হয় তার অভাব, গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তা। শহীদ রফিক আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে।

শহীদ রফিক ভাই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ক্রীড়া সম্পাদক। আমি ছিলাম তাঁর সহযোগী। আজ আমি তাঁর গর্বিত উত্তরসূরী। রফিক ভাই ছিলেন একজন যোগ্য এবং পরিচ্ছন্ন সংগঠক। প্রকৃত সত্য কথা হল আমাকে যখন সহকারী ক্রীড়া

www.pathagar.com

সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন ছিল আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা আর আমার যখন পরীক্ষা শেষ হয় তখন রফিক ভাইয়ের শুরু হয় মাষ্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা। আর সে জন্যই আমি পারিনি বিভাগীয় সার্বিক অবস্থা ভালভাবে জানতে। কিন্তু হায়েনাদের নির্মম আঘাতে রফিক ভাই তার পরীক্ষা শেষ হবার পূর্বেই শাহাদাত বরণ করলে তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি বিভাগীয় কাজ গোছাতে কারণ তার বিভাগীয় রিপোর্ট ছিল আয়নার মতই স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার।

রফিক ভাই দায়িত্বপালন করেছেন ক্যাম্পাসের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে যখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র দেশ ছিল আওয়ামী দুঃশাসনের যাতাকলে অতিষ্ট। কন কনে শীতের রাতে খোলা আকাশের নীচে রাত্রিযাপন, বনে-জঙ্গলে মশা-পোকা-কীট-পতঙ্গের সাথে একত্রে বসবাসসহ দ্বীনের জন্য কঠিন সিদ্ধান্তও হাসিমুখে দেখেছি বাস্তবায়ন করতে। যুদ্ধের ময়দানে বাতিলের রক্তচক্ষু আর শত্রু বাহিনীর সাথে গোলাগুলির মাঝেও দেখিনি তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

রফিক ভাই সাংগঠনিক হিসাব-নিকাশে ছিলেন অত্যন্ত বেশী সচেতন। সাংগঠনিক খরচের সমস্ত হিসাব-নিকাশ, ভাউচার মাসের প্রথমে সবার আগেই তিনি বুঝে দিতেন বায়তুলমাল সম্পাদকের কাছে।

রফিক ভাই নৈতিক প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। আমরা সদস্য বৈঠকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি নৈতিক এবং সাংগঠনিক স্বার্থের প্রশ্নে তাঁর অবস্থান থাকত অনড়, সুদৃঢ়।

স্পষ্টবাদীতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটি গুন। শিক্ষক, দায়িত্বশীলসহ কাউকে তিনি ছাড় দিয়ে কথা বলার বান্দা ছিলেন না।

নিমিষেই অপরিচিতকে আপন করে নেয়ার অসম্ভব চৌম্বিক আকর্ষণ ছিল তাঁর চরিত্রে। বিশেষ করে এলাকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। শত্রু-মিত্র, ছোট-বড় সকলের কাছেই তিনি ছিলেন প্রিয়।

শহীদ রফিক আবার ছিলেন বড় বেশী উদার, বড় মনের মানুষ। আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে তৎকালীন সময়ে ছাত্রলীগের সাথে আমাদের সব সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকত। কিন্তু দেখেছি স্বাভাবিক পরিবেশসহ অনেক abnormal পরিবেশেও বিরোধী শক্তির নেতা-কর্মীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলতে।

রসিকতা ছিল তাঁর চরিত্রের অলংকার। তাঁর কৌতুকপূর্ণ কথা-বার্তা আর স্বভাবসূলভ হাসি তাঁকে বেশী জনপ্রিয় করে তুলেছিল। রফিক ভাই নেই এ রকম প্রোগ্রামগুলো নিস্তেজ এবং নিরসই মনে হত। সাদ্দাম হলের সামনে খোড়া চাচার দোকান, ক্যাম্পাসের অনুষদ ভবনের নীচের করিডোরে আমাদের টেন্টে রফিক ভাই না থাকলে নিষ্প্রাণ মনে হতো। শুধুমাত্র রফিক ভাইয়ের কারণেই জিয়া হল থাকত সর্বদা আনন্দময় এবং কোলাহল মুখর। রফিক ভাইয়ের কৌতুক পূর্ণ ডায়লগ সকলের মুখে মুখে থাকত। তাঁর ডায়লগগুলি বেশ মার্কেট পেত। সংগঠনের প্রয়োজনে রাত নেই, দিন নেই যে কোন

www.pathagar.com

মুহূর্তে তিনি ছুটে আসতেন ময়দানে। রফিক ভাইয়ের উপস্থিতি জনশক্তির মনে সাহস বৃদ্ধির কারণ হত। পরীক্ষাসহ সকল কিছুর উর্ধে তিনি প্রাধান্য দিতেন ময়দানের পরিস্থিতিকে, ময়দানের চাহিদাকে। সাংগঠনিক কাজে "না" শব্দ উচ্চারণ করতে শুনিনি কখনও।

অত্যন্ত সাধারণ এবং সরল-সোজা-সহজ জীবন-যাপন ছিল তার চরিত্রের অন্যতম দিক। বাড়ী থেকে টাকা কম আসায় খুব হিসেব-নিকেশ করে চলতেন, কিন্তু তাঁর অভাব কাউকে বুঝতে না দেয়া ছিল তাঁর একটি মহৎ গুণ।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা আর সৌন্দর্য প্রিয়তা রফিক ভাইকে করে তুলেছিল আরো আকর্ষণীয়। জিয়া হলের ২১১ নম্বর রুমটির সামনে ফুল গাছের টব সংরক্ষণই তার প্রকৃষ্ট প্রমান। প্রতিদিন ফুল গাছগুলির খোজ-খবর নেয়া, পানি দেয়া, আদর যত্ন করা ছিল তাঁর প্রতিদিনের রুটিনের কাজ।

সহযোদ্ধাদের পিছনে ফেলে সামনে চলা ছিল তাঁর নীতি বিরুদ্ধ কাজ। তাঁকে কখনো আমরা দেখিনি মিছিলের সামনে। অস্বাভাবিক পরিবেশ ছাড়াও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও তিনি-সবাইকে গোছায়ে সামনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি আসতেন সবার পিছনে পিছনে। শাহাদতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি এ ভাবেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন দ্বীনের স্বার্থে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

এ ভাবে আমরা যারা তাঁর উত্তরসুরী তারা হাজারো স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে আজও বেঁচে আছি। তিনি আমাদের নেতা, তিনি আমাদের দ্বীনের পথে চলার প্রেরণার উৎস। আজো যখন আমরা রফিক ভাই পূর্বে দায়িত্বশীল ছিলেন সে সব এলাকায় যাই তখন এলাকার শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ-মহিলা, দোকানদার, ভ্যান-শ্রমিক অনেকেই রফিক ভাইয়ের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কেঁদে ফেলে, চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু বিসর্জন করে। যারা রফিক ভাইকে শহীদ করে দিল এদের কারোর সাথে তো রফিক ভাইয়ের ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা ছিল না, ছিল না কোন বৈষয়িক দেনা-পাওনার বিষয়। আমার জানা মতে ঘাতকদের একজন এক সময় যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিল তখন রফিক ভাইই তো নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে এর জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

ওরা ঘাতক। ওরা রফিক ভাইকে শহীদ করে দিয়েছে। আমাদের কোন দুঃখ নেই, আমরা নই ব্যাথিত। কারণ শাহাদত মু'মিন জীবনের কাম্য। শহীদ হয়ে আমাদের ভাই রফিক সফল হয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) ঘোষণা অনুযায়ী তিনি এখন সবুজ পাখীর আকৃতিতে আল্লাহর জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ, খুশীর সংবাদ, আমাদের প্রেরণার সংবাদ।

কিন্তু আমাদের দুঃখ, আমাদের ব্যাথা, আমাদের ক্ষোভ, আমাদের ক্রোধ, আমাদের জিহাদ, আমাদের ঘৃণা, আমাদের বিদ্রোহ ঐ ঘাতকদের বিরুদ্ধে এই কারণে যে ওরা শুধু রফিক নামের একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেনি, ওরা হত্যা করেছে একটি আন্দোলনকে,

www.pathagar.com

একটি সংগঠনকে, একটি প্রতিষ্ঠানকে, একটি জাতিকে, একটি সভ্যতাকে আমাদের দুঃখ, আমাদের বেদনা এই কারণে যে, দায়িত্বশীল রফিক, সাহসী রফিক, দ্বীনের জন্য পাগলপারা রফিক, মানুষের সুখে দুঃখে সাড়াদানকারী রফিক, দুস্থ-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো রফিক, পথ হারা দিক ভ্রান্ত মানুষকে আল্লাহর পথে আহবানকারী রফিক, নিজের ক্ষতি করে অপরের উপকারকারী রফিক, আল্লাহর পথে শত কষ্ট হজমকারী রফিক, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-রাত-দিনের যে কোন মুহূর্তে দ্বীনের প্রয়োজনে ছুটে আসা রফিক, সহযোদ্ধাদের মাঝে প্রাণ সঞ্চারকারী রফিক তো আর ইসলামী আন্দোলনে প্রতিদিন শামিল হয় না। জন্মে না প্রতিদিন। আর রফিক ভাইয়ের বক্তব্যেও আমরা তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই-"সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে আজীবন সত্যের পথেই লড়াই করে যাব।"

আজ শহীদ রফিক ভাইয়ের মত পরিশ্রমী, নৈতিক প্রশ্নে আপোষহীন সাংগঠনিক স্বার্থে সবকিছুকে বিসর্জন দেয়া, সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার মত লোকের ইসলামী আন্দোলনে বড় বেশী প্রয়োজন। আর আমরা গানে গানে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই-

"আমাদের সেই লোকের প্রয়োজন যার জামার কোনা কাটায় বেঁধে আটকে গেলেও যাবে ছুটে দ্বীনের কাজে, ভাববে জামা নিস্প্রয়োজন, আমাদের সেই লোকের প্রয়োজন।"

রফিক হত্যার বদলা আমাদেরকে নিতেই হবে। শহীদ রফিক ভাই যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন দিলেন সে আদর্শিক আন্দোলনের গতিকে আরো গতিশীল করার মাধ্যমে শহীদের রেখে যাওয়া কাজকে আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমে ঘাতকদের গতিকে রুদ্ধ করার মাধ্যমে। আল্লাহ আমাদের ভাই শহীদ রফিক ভাইয়ের শাহাদতের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করে বাংলার এ জমীনকে দ্বীনের মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত করার তৌফিক দিন। আমীন।

লেখক ঃ সমাজকল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ই.বি.।

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় শহীদ রফিকুল ইসলাম

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

শহীদি ঈদগাহ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১১৪তম এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম শহীদ হচ্ছেন রফিকুল ইসলাম। তিনি ছিলেন সংগঠনের সদস্য এবং দাওয়া এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের মাষ্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আর মাত্র ৪টি কোর্সের পরীক্ষা বাকী ছিল। কিন্তু উক্ত পরীক্ষা শেষ করতে না করতেই জাসদ ছাত্রলীগ ক্ষমতাসীন সরকারের মদদপুষ্ট ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের পরোক্ষ সহযোগিতায় গত ৮ই জুন ২০০১ ইং রোজ শুক্রবার যখন আমার ভাইটি সবেমাত্র জুমার নামাজ সমাপনান্তে দুপুরের খাবার গ্রহণ শেষ করেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে হয়েনার দল অতর্কিতভাবে ভারি অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চাইনিজ কুড়াল ও হাতুড়ি নিয়ে কাপুরুষের ন্যায় শহীদ রফিকুল ইসলামের উপর ঝাপিয়ে পড়ে মদনভাঙ্গার কামাল ছাত্রাবাসে। তাদের উপর্যুপরি আঘাতের পর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আমার ভাই শহীদ রফিকুল ইসলাম।

সন্ত্রাসীচক্র রফিক ভাইকে মৃত ভেবে পালিয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই আমাদের ভাইরা এসে দেখে মুমূর্ষ অবস্থায় রফিক ভাই মাটিতে পড়ে আছেন। কালক্ষেপন না করে সাথে সাথে তাঁকে ঝিনাইদহে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে শহীদ হিসেবে কবুল করবেন তাকে কি আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব?

বিকেল সাড়ে তিনটার সময় ডাক্তার নাসির উদ্দিন, যিনি আমি যখন ৬ই আগস্ট

www.pathagar.com

২০০০ইং রোজ রবিবার ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় গুলিবিদ্ধ হই তখন তাঁর সু-চিকিৎসায় আমি সুস্থতা লাভ করি। তিনি রফিক ভাইকে বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে বলে উঠলেন-He reached at the eleventh hour সেখানে আমি ও তৎকালিন ই.বি সভাপতি রাসেল ভাইসহ আরো অনেকেই উপস্তিত ছিলাম। ডাক্তার সাহেব তাৎক্ষনিকভাবে নার্সদেরকে নির্দেশ দিলেন রফিক ভাইকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে।

আমরা রাসেল ভাইয়ের নেতৃত্বে দু'হাত তুলে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট মুনাজাত করতে লাগলাম, যার হাতে রয়েছে জীবন-মৃত্যুর চাবি-কাঠি। মুনাজাতের এক পর্যায়ে বিকেল ৪ টার সময় কর্তব্যরত ডাক্তার ঘোষণা করেন যে রফিক ভাই আর জীবিত নেই, তিনি শাহাদৎ বরণ করেছেন। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেউন"। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে হাসপাতালের আঙ্গিনায় এক হৃদয় বিদারক ঘটনার অবতারণা ঘটে। শহীদ রফিকুল ইসলামের সাথীদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠে। জিল্লু ভাই ও মাসুদ ভাইসহ কয়েকজন ভাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

আজ রফিক ভাই আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার রেখে যাওয়া স্মৃতি প্রতিটি মুহূর্ত হৃদয়ে নাড়া দেয়। কেননা তিনি ছিলেন আমাদের ক্যাম্পাসের সদা হাস্যোজ্জল একজন ব্যক্তিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী এবং সংগঠনের সুধী ও শুভাকাংখী সকলেরই হৃদয়ে তিনি স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। যার প্রমাণ শাহাদতের পর তার জানাযায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সহ সর্বস্তারের মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন।

শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে আমার নিবিড়ভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিল, যখন আমি জিয়া হলের সভাপতি হলাম আর তিনি ছিলেন জিয়া হলের ২য় তলার ২১১নং কক্ষের অবস্থানরত একজন ছাত্র এবং সংগঠনের 'যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক"। শাহাদাতের পর আমরা তাঁর অবস্থানরত ব্লকের নাম রেখেছিলাম "শহীদ রফিকুল ইসলাম ব্লক"। তিনি জিয়া হলে যতদিন ছিলেন মনে হচ্ছে যেন ততদিন জিয়া হল ছিল একটি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হল। আর তাঁর শাহাদতের পরদিন থেকে জিয়া হল যেন একটি নির্জীব তথা প্রাণহীন হলে রূপান্তরিত হয়েছিল। দ্বীনের এ অকুতভয় সৈনিকের কথা জিয়া হলে প্রতিটি প্রোগ্রামে আজও আলোচিত হয়।

তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেকগুলো ঘটনা আমার স্মৃতির পাতায় বারবার দোল খাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছিনা যেটি আমাদের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। আমি সংগঠনের কর্মী থাকাবস্থায় যখন ই.বি সংলগ্ন জনি মেসে অবস্থান করছিলাম, তখন মাসুম বিল্লাহ ভাই আমাকে সাকসেস গাইড বিক্রির দায়িত্ব দিলেন। রফিক ভাই ছিলেন তখন সংগঠনের সদস্য প্রার্থী, তিনি একদিন আমার নিকট এসে একটি গাইড বাকীতে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি বললাম ভাই ই.বি সভাপতির অনুমতি ছাড়া বাকীতে বিক্রি করা নিষেধ।

www.pathagar.com

তিনি একথা শুনে আর দ্বিতীয় বাক্য খরচ না করে হাসি মুখে তৎকালীন সভাপতি আসাদ ভাইয়ের নিকট গিয়ে অনুমোদন নিয়ে এসে আমার নিকট একটি চিরকুট দিলেন। তারপর আমি তাকে একটি গাইড দিলাম।

আমি তার এ দায়িত্বশীল সুলভ আচরণ ও সংগঠনের System এর প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধাবোধ দেখলাম এতে অবাক হলাম। কারণ আমি ছিলাম কর্মী, আর তিনি ছিলেন সদস্য প্রার্থী, তিনি আমার কাছ থেকে গাইডটি নিয়েও সভাপতির সাথে দেখা করতে পারতেন। যেটি অন্যান্যরা সচরাচর করে থাকেন। কিন্তু তিনি তা না করে সংগঠনের System ও সিদ্ধান্তের প্রতি আকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছেন।

শহীদ রফিকুল ইসলাম এখন একটি সু-পরিচিত ও সুপ্রিয় নাম যেটি আজ শুধুই স্মৃতি। তাঁর কোন অপরাধ ছিল না। মহান আল্লাহর ঘোষনাঃ "তাদের এছাড়া আর কোন অপরাধ ছিলনা তারা স্বপ্রশংসিত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" (সূরা বুরূজ-৮)

শহীদ রফিকের শাহাদাতের শোককে শক্তিতে পরিণত করে শাহাদতের তামান্নায় উজ্জিবীত হয়ে ইসলামী বিপ্লব সাধনই এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককেই তাঁর দ্বীনের জন্য আমরণ কবুল করুন।

লেখক ঃ সাবেক সভাপতি, শহীদ জিয়াউর রহমান হল।

www.pathagar.com

গর্বময় বেদনার ডায়েরী থেকে

আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা

রফিক ভাই সংক্রান্ত কোন আলোচনায় আমি অংশগ্রহন করিনা কারণ একটা অস্বাভাবিকতা আমাকে গ্রাস করে। স্বাভাবিক হতে সময় লাগে বেশ। শুধু আমি নই রফিক ভাই সম্পর্কে কোন কথা আসলেই অত্যন্ত নিরস ভাবে থামিয়ে দেন নুরুর রহমান ভাই। বারবার অনুরোধ সত্ত্বে ও স্মরনীকার লেখা দেয়না, শওকাত ভাই নুরুল ভাই । প্রায় অর্ধশত বার চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারিনি। স্মরনিকা প্রিন্টের আগ মুহূর্তে হানিফ ভাই ও নয়ন ভাই (স্মরনিকার কম্পোজ করতে গিয়ে যারা বার বার আবেগে আপ্লুত হচ্ছিল) এর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

এক

কি লিখব শহীদ রফিক ভাই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বছরের রক্ত পিচ্ছিল পথের সাথী । এক সাথে স্বপ্ন দেখতাম আমরা আগামী সকালটা সুন্দর হবেই, একজন স্বপ্ন দেখতে দেখতেই চলে গেলেন ওপারের সুন্দর ভুবনে। আর এখনও স্বপ্ন বুকে নিয়ে প্রতিদিনের সূর্যোদয় হয় আমার।

দিনের বেশীর ভাগ সময় একসাথে থাকতাম আমরা। বন্ধুত্বে,সংলাপ ,ভ্রাতৃত্বে আমরা সবাই ছিলাম একটা পরিবারের মতো। তাইতো রফিক ভাইয়ের মৃত্যুর পর মিঠু ভাই আর হলে আসেনা। রফিক ভাইয়ের লাগানো ফুল গাছের দিকে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে মুর্শেদ।

রফিক ভাইয়ের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশী ধাক্কাটা লেগেছে জিয়াহলে। হলের সর্বত্র

www.pathagar.com

যেন একটা শুন্যতার। রফিক ভায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে হল খুললে ছাত্র শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী দের কান্নার শব্দে ভারী হয়ে উঠল হলের শান্ত পরিবেশ। হলের ডাইনিং ম্যানেজার এবং ক্যাম্পাসে জড়িত দোকানদাররাও আহাজারি করেছিল।

দুই

হলের পরিবেশটা যেন কেমন হয়ে গেছে। সবাই বলতো জিয়া হলের আনন্দের উৎস রফিক ভাই আর সবুজ ভাই। তাদের সেই ২৬শে মার্চের বক্তৃতা আনন্দের খোরাক রফিক ভায়ের মৃত্যুর পর সবুজ ভায়ের বক্তৃতা আর শোনা যায় না। সবুজ ভাই যাবার আগে আমরা সবাই ধরলাম বক্তৃতা শোনানোর জন্য সবুজ ভাই বক্তৃতা শেষ করতে পারলো না, শেষে দেখি সবার চোখে পানি। আজ ও কারেন্ট চলে যায়, খেলা ধুলা হয়। রফিক ভাইয়ের সেই বক্তৃতা আর শুনিনা।

ইচ্ছা করেই রফিক ভাইয়ের কফিনের সাথে যায়নি।যে রফিক ভাইকে পেয়েছি বাতিলের বিরুদ্ধে বুক আগলে দিতে সত্যের সেই সেনানী একটি বাক্সে বন্দি লাশ। কি ভাবে মানি এটা। অনেক রাত্রে কফিনের পাশে বসলাম। অনেক রাত দুজনে গল্প করতে করতে ঘুমিয়েছি। আজ একজন চিরনিদ্রায় শায়িত আর একজন অশ্রুসিক্ত ।

বেশ কিছুদিন থেকে স্বপ্ন দেখছিলাম। তাই ইচ্ছা করছিলাম যাব একবার যেখানে। শুয়ে আছে প্রিয় রফিক ভাই । গিয়ে দাঁড়ালাম কবরের পার্শে। মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম স্বাভাবিকতা বুকের ভিতর গর্জে উঠা ঝড় নিজেকে এলোমেলো করে ফেলছিল। যখন স্বাভাবিকতা ফিরে পেলাম তখন দেখলাম অশ্রুসিক্ত রেজা ভাই আমার হাত ধরে টানছে।

তিন

সবচেয়ে বড় সত্যি আজ রফিক ভাই নেই আমাদের মাঝে। মনকে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করি। শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রেরণা। এই রক্তেই তো উর্বর হবে সবুজ জমিন, প্রতিষ্ঠিত হবে কোরআনের রাজ। সব কথা তখন রুদ্ধ হয়ে আসে, যখন মধ্য রাত্রে ঘুমভেঙ্গে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে। যখন ক্যাম্পাসে খুনিদের খবর শুনি তখনই বুকের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গীরিটি জেগে উঠে নিজের অজান্তে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠে হাত। ইচ্ছা হয় সন্ত্রাসীদের শেষ নিশানা টুকু মিটিয়ে দিই। তারপর একসময় স্বাভাবিকতা ফিরে পাই। নিজেকে তখন খুব অসহায় মনে হয়। আব্দুল হক ভাই শওকাত ভাই এর দিকে তাকালেও মনে হয় তাদের অবস্থা ও আমার মতই। ভুলে থাকার চেষ্টা করি সব কিছু, কিন্তু বুকের ভিতর যার বসবাস তাকে কি করে ভুলিয়ে রাখি? সেতো মনে রাখেই। মনে মনে।

লেখক ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, শহীদ জিয়াউর রহমান হল, ই.বি.।

www.pathagar.com

যেমন দেখেছি রফিক কে

মোঃ তৌফিকুল ইসলাম (মামুন)

প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। এই বিরাট সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। এই সবুজ শ্যামল সুন্দর পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন প্রাণগুলোকে অবশ্যই মৃত্যুর কাছে পরাজিত হতে হবে। কিন্তু শহীদ রফিকুল ইসলামের মত সম্ভাবনাময়ী মানুষের অকাল মৃত্যু কারো কাছেই কাংখিত নয়। এমন কিছু "মৃত্যুহীন প্রাণ" যারা কখনও পরাজিত হয়না। তারা যেন মৃত্যুতেই জয়ী। শহীদ রফিক তেমনিই একজন।

বিশ্ববিদ্যালয় তখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি। ছুটির প্রারম্ভ থেকে বাড়ী অবস্থান করছিলাম। ৯ই জুন শনিবার-২০০১, পড়ন্ত বিকালে একটি ওষুধের দোকানে বসে ছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল ওষুধের দোকানের টেবিলে ছড়িয়ে থাকা খুলনার স্থানীয় দৈনিক পূর্বাঞ্চলের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামটি। শিরোনামটি ছিল সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় ই.বি ছাত্রনেতা খুন। রিপোর্টটি কিছু অংশ পড়তেই আৎকে উঠলাম এবং হৃদয়ে কম্পন শুরু হল। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না আমার বিশ্ববিদ্যালয় হল জীবনের রুমমেট রফিক ভাই আর ইহধামে নেই, তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়ে আল্লাহর দিদার লাভ করেছেন।

রফিক ভাইয়ের সাথে পরিচয়ের তারিখ ক্ষণ আমার ঠিক মনে নেই তবে এতটুকু মনে আছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। রফিক ভাই আর আমি একই সেশনের (১৯৯৪-৯৫) অনার্স ছাত্র

www.pathagar.com

ছিলাম। পরিচয়ের পর থেকেই তাঁর সাথে অতি অল্প সময়ে দুইজনের মাঝে বিরাট আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। তার ফলস্বরূপ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের প্রথম সারির নেতা হওয়া সত্ত্বেও আমার মত সমর্থকের তার রুমে বসবাসের সুযোগ মিলেছিল। সেটা ছিল আমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বড় পাওয়া। রফিকভাইয়ের মত সর্বগুণে গুণান্বিত ও ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষের ক্ষণকাল একান্ত সাহচর্য্য পেয়ে আমি নিতান্তই ভাগ্যবান। আমি আর রফিক ভাই জিয়া হলের ২১১ নম্বর কক্ষে থাকতাম। দুইজনে একই সেশনের ছাত্র এবং হলের একই রুমের বাসিন্দা হওয়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে একটু বেশীই জানি।

শহীদ রফিক ছিলেন সদা হাস্যজ্জ্বোল, মিশুক। তাঁর অমায়িক ব্যবহার সিনিয়র, জুনিয়ার সকল ছাত্র-ছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের সাথে তার সুসম্পর্ক তৈরী করেছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও হলে একাকী হেঁটেছেন এমন দৃশ্য বিরল। বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় তাঁর সরব উপস্থিতি ও প্রাণ খোলা অট্টহাসি এখনো আমার কানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বাজে।

অতিথি পরায়নতায় রফিকভাই ছিলেন সকলের শীর্ষে। রুমে পরিচিত ও অপরিচিত যে কেউ আসলেই তার অতিথি পরায়নতায় বিমুগ্ধ হত। অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা দূর্বল থাকা সত্ত্বেও খরচের অন্য খাত কমিয়ে অতিথিদের প্রায়ই আপ্যায়ন করাতেন। আমাকে মাঝে মাঝে তার অতিথি পরায়নতা বিস্মিত করত। আমার ক্লাসমেট ও বন্ধুরা রুমে আসলে আমি আপ্যায়ন না করালেও রফিক ভাই তাদের আপ্যায়ন করতে ভুল করতেন না। মাঝে মাঝে আমার বন্ধুরা আমাকে রুমে না পেয়ে রফিক ভাইয়ের অতিথিপরায়নতায় মুগ্ধ হয়ে তার সাথে দীর্ঘক্ষণ গল্প করত এবং পরবর্তীতে আমার কাছে রফিকভাইয়ের প্রশংসা করত।

রফিকভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয় আশে পাশের এলাকায় ছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয়। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নানাধরনের লোকজন নানামুখী সমস্যা নিয়ে তার কাছে আসত। আমার কাছে মনে হত তিনি সমস্যা সমাধানের জাতক। তাঁর জনপ্রিয়তা আমাকে মাঝে মধ্যে বিড়ম্বিত করত, তিনি প্রায়ই নানামুখী কাজে বাইরে থাকতেন তখন লোকজন একের পর এক তাঁর খোঁজে আসত, আমি কিছুটা বিরক্তই হতাম। রুমে ফিরে আসলে আমি তাকে প্রায়ই বলতাম-আপনি এই এলাকায় ইলেকশ্ন করবেন নাকি?

জনসেবায় ও দুঃখী মানুষের অতি নিকট জন ছিলেন শহীদ রফিকভাই, দিনরাত বলে কোন কথা নেই, কারো দুঃখের ও বিপদের কথা শুনতে পারলেই ছুটে যেতেন সেখানে। কার ঔষধ কেনার সমস্যা কে হাসপাতালে আছে কোন দরিদ্র ছাত্রটি টাকার অভাবে পরীক্ষার ফরম পূরন করতে পারছে না এসব ছিল তার সার্বক্ষনিক ডায়রীভুক্ত ও সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ। তিনি নিয়মিত রক্ত দান করতেন।

www.pathagar.com

বিবিধ ছাত্র সমস্যার-সমাধানে রফিক ভাই ছিলেন অগ্রদূত। তিনি প্রায়ই অনেককে বলতেন সবার আগে ছাত্রত্ব, তার পর অন্য কিছু। তিনি তাঁর বন্ধুদের ও জুনিয়ারদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে পরামর্শ, বিভিন্নমুখী সুবিধা ও অকৃপণ হস্তে নোট দিয়ে সাহায্য করতেন। হলে ছাত্রদের মধ্যমনি হওয়ার কারণে তার কাছেই ছাত্ররা নানামুখী সমস্যার কথা বলত এবং তিনি তড়িৎ সমস্যার সমাধান করার চেষ্ট করতেন। আমি নিজেই তার জ্বলন্ত সাক্ষী- আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একটি সড়ক দূর্ঘটনায় পতিত হয় দূর্ঘটনার ধকল পুরোপুরি কাটিয়ে উঠার পূর্বেই (১৯৯৯ সনের আগস্ট মাস) তৃতীয় বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা এসে পড়ে। আমি যখন আবাসন খুঁজতে ব্যস্ত, উনি জানতে পেরেই তড়িঘড়ি করে তাঁর রুমেই আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের রুমে প্রতিদিনই দু'একজন গেষ্ট রাত যাপন করত ও রুমে তিনজনের নির্ধারিত সিট হলেও অনেকেই তাঁর বদান্যতায় পরীক্ষার সময় মাসের-মাস রুমে থাকত। জালাল, শামীম ও মঈন উদ্দীন তো আমাদের রুমমেট বনে গিয়েছিল।

লেনদেন ও আমানত দারিতায় রফিকভাই ছিলেন বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক। প্রয়োজনে তিনি যদি কখনো কারও কাছ থেকে টাকা বা অন্য কিছু নিলে যথাসময়ে দেয়া ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। তিনি আমার কাছ থেকে কখনো একটাকা নিলেও তা পরিশোধ করে দিতেন যা সচরচার বর্তমান মনুষ্য সমাজে দেখা যায়না। তাঁর আমানতদারিতার গুণে তিনি মোহনা, সুন্দরবন সঞ্চয়ী সমিতি, সাতক্ষীরা ছাত্র কল্যাণ সমিতিসহ বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কোষাধ্যক্ষের পদ তাঁকে অলংকৃত করেছিল।

রফিক ভাই ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন অগ্রগামী সৈনিক। ইসলামী আন্দোলন ও শরীয়তের ব্যাপারে তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী ও দৃঢ়চেতা। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও অন্যায়কে বিলুপ্ত করার জন্য নিজের রক্ত দিতে কার্পণ্য করেননি কখনো। ১৯৯৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী বাকশালীদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে তিনি আহত হয়েছিলেন। বাতিলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে তিনি ছিলেন সিপাহসালার। রফিক যে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কিংবদন্তী ছিলেন তার দীপ্ত উচ্চারণ পাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ম ব্যাচের সমাপনী এ্যালবাম "স্বপ্নীল ক্যাম্পাসে" তাঁর ২৫টি শব্দের অভিব্যক্তিতে তিনি লিখেছেন– "সত্য ও সুন্দরের পক্ষে আমি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সারাক্ষণ, ভবিষ্যতেও থাকবো। ইনশাআল্লাহ"।

রফিকভাই আজ আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, মহান প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে। পাপ পংকিল এই নশ্বর পৃথিবীতে তোমার মত মানুষের সান্নিধ্যলাভ আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ স্বত্ত্বা দিয়ে তোমাকে অনুভব করব আজীবন, আমৃত্যু। তোমার জীবন আমার কাছে আদর্শের, এক আশ্চর্য প্রতীক, এক জীবন্ত বিস্ময় ও প্রেরণার উৎস। আমার হৃদয়ে চির ভাস্কর হয়ে থাকবে তোমার ক্ষণকালের সান্নিধ্য।

লেখক ঃ শহীদ রফিকের রুমমেট।

www.pathagar.com

শহীদ রফিক
এক অনন্য প্রেরণা

মুহাম্মদ আজিজুল হক

শহীদ ঃ সাক্ষ্যদাতা, প্রায়োগিক অর্থে-আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার্থে অথবা সত্য-সুন্দরের পথে সাক্ষ্য দানের সর্বোৎকৃষ্ট পরাকাষ্ঠা, সবচেয়ে প্রিয় "জীবন" কে উৎসর্গ করে সাক্ষ্য হিসেবে নিজেকেই পেশকারী। পরম সফলতা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে, অনন্তকাল নিষ্কন্টক করতে এক পসরা সীমাবদ্ধ সাময়িক, মরিচিকা-রঙীন ফানুস ইহ-লৌকিক সুখের প্রলোভন উপেক্ষা করে নিজের সকল মেধা-মনন-সময় আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিতে গিয়ে পরিশেষে আত্মত্যাগ করাই আম্বিয়া কেরাম, যুগে যুগে দ্বীনের নিশান বরদার, নকীব, দায়ী ইলাল্লাহদের পরম আকাঙক্ষার বস্তু শাহাদাত। সাংগঠনিক শৃঙ্খলায় অবিচল সদা হাস্যোজ্বল, কর্মঠ, নিরহংকারী, সচ্চরিত্রবান শহীদ রফিক ভাইও লালন করতেন শাহাদাতের তামান্না। সোনা পুড়িয়ে পরখ করে মানুষকে সজ্জিত করে, আল্লাহ দ্বীনের নকীবদেরকে জীবন বিকানোর সম্মুখীন করে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যম বাছাই করে শহীদদের দ্বার। আল্লাহর অমোঘ ঘোষণা য়াত্তাখিজা মিনকুম শুহাদা "আল্লাহ তোমাদের থেকে কিছু শহীদ গ্রহণ করতে চান।" (ইমরানঃ ১৪০) উদ্দেশ্য - লিয়ামাহহিসাল্লাহুল্লাজিনা আমানু ইমানদারদেরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান (ইমরান ঃ ১৪১)

'৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে এক সাথে সদস্য শপথ হয়। সেখান থেকে তিনি আমার পরিচিত। তাঁর দায়িত্বাধীন মদনডাঙ্গায় আমার ইবির সাংগঠনিক কাজ শুরু। তার সাংগঠনিক কাজের পেরেশানী কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এক সাথী বৈঠকের আগে সামান্য কিছু টাকার ভাউচার

www.pathagar.com

জমা দিতে দেরী হওয়ায় তিনি আমার লজিং এ পৌছে বলেন-"আপনার তো এ বিষয়টাতে সচেতনতার পরিচয় দেয়া দরকার ছিল নইলে Report Incomplete থেকে যাবে, তাঁর ভাষা কত মোলায়েম ও অনুভূতি স্পর্শী। তাঁর দায়িত্ববোধের কাছে আমার মুখ থেকে কোন সদুত্তর বের হয়নি। ৯৮ সালে; এক জরুরী সদস্য বৈঠকের দাওয়াত দেয়া সম্ভব হয়নি রফিক ভাইকে। বৈঠক চলছে, মাঝে রফিক ভাইকে প্রয়োজন মুষলধারে বৃষ্টি, শ্রিরামপুর উঃ পাড়ায় যেতে রাস্তা কর্দমাক্ত, দায়িত্ব পেয়ে আনতে গেলাম।

আমার সাথে ক্যাম্পাসে আসলেন। একটা ছাতা মুষলধারে বৃষ্টি, কর্দমাক্ত রাস্তা, মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। এক বৈঠকে কাঁচের কোল মাদরাসার কর্মীদের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন আমরা তাঁদের জন্য কি করছি? করিডোরে তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। অপরদের খোঁজ নেয়া, অচেনাকে চেনা, ও সাংগঠনিক কাজে তিনি সদা ব্যস্ত থাকতেন। ক্যাম্পাসের ভিতরে-বাইরে তাঁর পরিচিতি ছিল ব্যাপক। আপামর ছাত্র-জনতার মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর শাহাদতে সাধারণ মানুষেরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কেঁদেছে। হৃদয়াবেগ মাখা সকলকে জয়ী উপস্থাপনা বাতিলের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাড়ায় পরিশেষে তাঁকে শহীদ করা হয়। পাষন্ডেরা, অবুঝেরা জানেনা তাঁর শহীদী রক্তের প্রতিটা কণা বীজ সম যা ইসলামী আন্দোলনের কাঙ্খিত মহীরুহের গোড়া সিঞ্জিত হয়ে শত শত ভাইয়ের শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে শহীদী জজবায় ক্ষেত্র করছে উর্বর থেকে উর্বরতর। আল্লামা ইকবালের ভাষায়।

'হার হান্নেসে রং পন্থার কি ঘসনে বাদ মুসলিম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালা কি বাদ।

অর্থাৎ ঃ ঘর্ষণে মেহেদী রক্তিম হয়; শহীদী রক্তে ময়দান উর্বর হয়। জিহাদের মাধ্যমে মুসলমান জিন্দা হয়।

আল্লাহ বলেন ঃ অলা তাহছাবান্নাল্লাজিনা কুতিলুফি ছাবিলিল্লাহ.... য়ুরাখাকুন। আল্লাহর কাছ থেকে শহীদেরা রিযিক পাবেন (ইমরান ঃ ১৬৯)। '৮৮ সালে এক মুজাহিদের লাশ ৩ দিন পর বালির নীচ হতে উঠাতে কোদালের কোপ লাগিলে তাজা রক্ত সবেগে ছিটতে থাকে। ২০০১ সালে তোরাবোরায় মুজাহিদদের লাশ আনতে গিয়ে মার্কিন সৈন্যরা মাটির নীচ হতে লাশ উঠাতে গিয়ে দেখেন তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে অত্যাশ্চার্যান্বিত হন, শহীদ হিসেবে তারা সম্মান করে পুনরায় কবরে রাখেন (মাসিক রহমত)। শহীদ রফিক ভাইয়ের লাশ থেকেও তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

শহীদ রফিক ভাইয়ের সদা তৎপর সাংগঠনিক জীবন আমাকে প্রতিনিয়ত দায়িত্বপালনে কড়া নাড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়। রফিক ভাই স্মরণিকাতে যে কথা বলে গিয়েছেন সে তো মরণজয়ী শ্লোগান "আমি বাতিলের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ছিলাম-এখনও আছি ভবিষ্যতেও থাকবো ইনশাল্লাহ। সেই রফিক ভাইয়ের এক শাহাদত শত শত ভাইয়ের প্রাণে দ্বীন কায়েমের কাজে উজ্জীবিত করেছে, সর্বাত্মকভাবে নিজেদেরকে পেশ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। আল্লাহর কাছে তাই মিনতি তিনি যেন আমাদেরকে সেই কাজ আঞ্জাম দিতে দিতে নিষ্কন্টক হিসাব বিহীন সর্বোচ্চ মর্যাদার মৃত্যু শাহাদাত দান করেন। আমীন।

www.pathagar.com

একজন স্বপ্নবানের স্বপ্ন পুরণ

কাজী মারুফ কারখী

৮ই জুন '০১ ভোর ৪.৪০ মিঃ মুয়াজ্জিনের আস্‌সালাতু খয়রুম মিনান নাউম আহবানে ঘুম থেকে উঠলাম। এরপর ওযুসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে শ্রীরামপুর দক্ষিণপাড়া মসজিদে সালাতুল ফজর আদায় করলাম। নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গত দু'দিন ধরে ক্যাম্পাসে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার কথা চিন্তা করতে করতে মিষ্টি ভাইদের বাড়ীতে গিয়ে পৌছলাম এরপর কুরআন তেলাওয়াত করতে বসলাম, এই অবস্থায় সিরাজ চাচার ছেলে লিটন গিয়ে খবর দিল রফিক ভাই আমাকে ডাকছেন। খবর পেয়ে মিষ্টি ভাই সহ দ্রুত কামাল মেসে এসে উপস্থিত হলাম, এসে দেখলাম রফিক ভাই সহ বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল ভাই। ভোরেই ঝিনেদা থেকে এখানে এসেছেন, আমার সাথে রফিক ভাই হাঁসি মুখে ছালাম দিয়ে বললেন কি মারুফ ভাই ভাল আছেন তো রাতে কোন সমস্যা হয়নি।

এর পর রফিক ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম এত সকালে কি উদ্দেশ্যে এখানে আসলেন। বললেন গত ৬তাং ঘটনার ব্যাপারে সমঝোতা করার প্রস্তাব এসেছে সে কাজেই এখানে আসা হয়েছে এখান থেকে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করে বিকালে বৈঠক হবে। এরপর বিকালের বৈঠকের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ প্রয়োজনীয় যোগাযোগের জন্য তৈয়ব চাচাকে পাঠানো হল। এদিকে মদনডাঙ্গা চাষীকল্যাণ মসজিদে আমাদের সুধী ও জনশক্তি সমাবেশ আহবান করা হলো সেখানে রফিক ভাই এক তেজদ্বীপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন খোদাদ্রোহী অপশক্তি ই.বি-র ক্যাম্পাস থেকে নারায়ে তাকবীরের উচ্চকিত শ্লোগানকে মিটিয়ে ফেলতে চায়

www.pathagar.com

এজন্য তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনাদের সচেতন হতে হবে। এবং বাতিলের এ সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় নিজেদের জীবনের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু ঢেলে দিয়ে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ক্যাম্পাস জীবনের এই শেষ পর্যায় পিতা মাতার আহবান, কর্ম জীবনের হাতছানী এক্ষেত্রে জীবন দেয়ার দরকার হলে আমাকে সর্ব প্রথম পাবেন ইনশাল্লাহ। এ পর্যায়ে রফিক ভাইকে যথেষ্ঠ আবেগ আপ্লুত মনে হচ্ছিল। ক্যাম্পাসের দীর্ঘ সাত বছরের জীবনে রফিক ভাইয়ের সাথে অনেক মিশার সুযোগ হয়েছে অনেক বক্তব্য শুনেছি কিন্তু ঐ দিনের বক্তব্য শুনে আমার মনে হচ্ছিল বাতিলের অবস্থান সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে চূড়ান্ত রকম সতর্ক করতে চাচ্ছেন। জুমার নামাজের কিছু পূর্বে প্রোগ্রাম শেষ হল।

এরপর দ্রুত মেসে এসে গোসল শেষ করে জুমার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে আমরা আবার চাষী কল্যাণ মসজিদে গেলাম নামাজের ইমামতি করার জন্য রফিক ভাইকে কয়েকজন অনুরোধ করলাম কিন্তু অনেকটা জোর করে আমাকে পাঠালেন বললেন আপনি এলাকার দায়িত্বশীল নামায আপনাকেই পড়াতে হবে। নামায শেষ করে প্রত্যেকে যার যার মত মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আমিও বেরিয়ে যাব এমন সময় পিছনে ফিরে দেখলাম রফিক ভাই নামাজের হালাতে বসে বসে ধীরস্থির মনে কি যেন ভাবছেন। আমি উনার কাছে গিয়ে বললাম রফিক ভাই মেসে চলেন বেলা তো অনেক হলো দুপুরের রান্না হয়েছে কিছু খাওয়া দাওয়া করা যাক। উনি বললেন আপনারা যান আমি আসছি। এরপর আমরা চলে আসার প্রায় ১৫ মিঃ পর রফিক ভাই আসলেন। ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। রফিক ভাই এসে আমাদের সাথে যোগ দিলেন। উনারা সবাই খাবার গ্রহণ করছিলেন আর আমি পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করছিলাম। খাবার গ্রহণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তখন অনেকটা হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে আসল সোহেল রানা নামের আমাদের এক স্কুল কর্মী এসে বলল জাসদের লোকেরা আপনাদের উপর আক্রমনের জন্য ছুটে আসছে। দ্রুত সবাই রুম থেকে বের হলাম বেরিয়েই দেখি শত্রুরা আমাদের মেসের সামনে চলে আসছে সবাইকে দ্রুত পিছনে সরে যাবার জন্য বলা হলো। সবাই পিছনে সরে যেতে পারলেও রফিক যেতে পারেনি। আমি মেসের পশ্চিমে এগিয়ে এসেছিলাম জাসদের অবস্থান সম্পর্কে ভাল ভাবে দেখার জন্য। পিছনে ফিরে দেখলাম মেসের সামনে কেউ নেই মনে করলাম সবাই মনে হয় পিছনে বাড়ীর আড়ালে গিয়েছে সেজন্য আমি সরে গেলাম কিছুদুর কয়েকজন পেলাম কিন্তু কে কোথায় কিভাবে অবস্থান করছে সেটা বুঝতেই পারলাম না। এরই মধ্যে মেসের দিক থেকে অনেকটা চিল্লাচিল্লির আওয়াজ শুনতে পেলাম শুনেই ভাবতে লাগলাম আমাদের কেউ আক্রান্ত হল কিনা; মুহূর্তের মধ্যে আমরা মেসের দিকে ফিরে এলাম। এসে দেখলাম এক মর্মান্তিক দৃশ্য জাসদের নর পিশাচদের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত রফিক ভাই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, দ্রুত উঠিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। হাসপাতালে পৌছার পর ডাক্তার প্রাণপন চেষ্টা চালালেন, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে আল্লাহর পথে জীবন দিতে শপথবদ্ধ শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জিবিত আমাদের প্রাণ প্রিয় রফিক ভাই দুনিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করে ওপারে সুন্দর ভূবনে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

যে স্মৃতি চির অম্লান

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ তুষার

প্রত্যেক মানুষ মরণশীল একথা যেমন সঠিক তেমনি সন্দেহাতীতও বটে। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু ও অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে একটা কথা আছে। বহু স্বপ্ন আর আশা আকাঙ্খা নিয়ে মাস্টার্স প্রথম পর্ব পরীক্ষা সবে মাত্র শেষ করলেন শহীদ রফিক ভাই। দরিদ্র পিতার তিন ছেলের মধ্যে সব চাইতে নির্ভরশীল ও আশার প্রদীপ ছিলেন টুনু ভাই। বাবা মায়ের আদরের ধন টুনু আর কয়েক দিন পরেই আম, কাঁঠাল খেতে বাড়ীতে আসবে। বাড়ীর খোজ খবর নিবে। ছোট বোনদের জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য নিয়ে যাবে এই প্রত্যাশায় প্রহর গুনছে মা-বোন। রফিক ভাই ছিলেন সদা দায়িত্ববান ব্যক্তি। তিনি দায়িত্বকে কখনো উপেক্ষা করতে পারতেন না। ২০০১ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা চলছে তখন আমাকে বললেন, তুষার আমি ইচ্ছা করলে বাড়ীতে যেয়ে বেড়িয়ে আসতে পারি। আমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে আগামী শুক্রবার ৮ই জুন। বাড়ীতে যেয়ে জাহেদা ও সাজেদার বিয়ের বিষয়টা পাকাপাকি করতে হবে। আমি সেদিন বলেছিলাম ঠিক আছে। রফিক ভাই ছিলেন দরিদ্র পিতার সন্তান তাই স্বাভাবিক কারনে একটা চাকুরী খুবই দরকার ছিল। তাই মুসলিম এইড-এ দরখাস্ত জমা দিয়ে ছিলেন বুক ভরা আশা নিয়ে যাতে করে একটি চাকরী হলে গরীব পরিবারের কিছুটা অর্থনৈতিক সাশ্রয় হবে। এই জন্য তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে যখন ৬ই জুন সাদ্দাম হল গেটে জাসদ ছাত্রলীগের সাথে একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল

www.pathagar.com

তখন দেখা গেল রফিক ভাই আর একটি বারের জন্যও বললেন না চাকরীর জন্য কাগজ পত্র প্রস্তুত করতে হবে, বোনদের বিয়ের বিষয়ে কথা বলার জন্য বাড়ীতে যেতে হবে। এমন একটি কথাও আর উচ্চারণ করলেন না। সারাক্ষণ বিষয়টাকে সুন্দর ভাবে মিমাংসা করে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সদা উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। একবার শেখপাড়া যাওয়া আর একবার বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করা। যার প্রমান মেলে ৭ই জুন ২০০১ সালের রাতের সদস্য বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ই জুনের বাস্তবতা। বৃহস্পতিবারের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরী নির্দেশ অনুযায়ী আমরা হল ছেড়ে ঝিনাইদহের আল-হেরা একাডেমিতে অবস্থান করি। ঐ রাতে খাবারের দায়িত্ব ছিল আঃ জলিল ভাই-র। রাতের খাবার প্রস্তুত হতে দেরী হওয়ায় আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পর রাত আনুমানিক ১ টা ৪০ মিনিটের দিকে ডাকা হলো। সবাইকে প্যাকেটে করে খাবার দেয়া হলো। রফিক ভাই অর্ধেক খাবার খেলেন আর বাকী অর্ধেক আমাকে দিয়ে আমার খালি প্যাকেটটা বাইরে ফেলে দিলেন। শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করার জন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন যে কারণে মনে হয় দুনিয়ার খাবার তিনি বেশি খেতে পারেন নি। যেমনটি রাসুল (সাঃ) এর সাহাবী উমায়ের (রাঃ) বেহেস্তের বর্ণনা শুনে হাতের সব খেজুর না খেয়ে বাকী অংশ ফেলে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন সব খেজুর খেয়ে শেষ করতে গেলে জান্নাতে যেতে দেরী হবে তাই বাঁকীগুলো ফেলে দিয়ে ছিলেন। আজও সেই প্রমান পাওয়া গেল রফিক ভাই থেকে।

তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি আমিত্বের ভাব। সদা হাস্যোজ্জল চেহারা। শিশুসুলভ আচরণ, আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিদ্ধহস্ত। তবে ব্যক্তিত্বকে অক্ষুন্ন রেখে। সদস্য বৈঠকে যখন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন তখন তিনি বিষয়টাকে এমন সুন্দরভাবে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতেন– যা সহজে একবাক্যে সবাই মেনে নিতেন। তাঁর যুক্তির কাছে অন্যের উপস্থাপনা টিকতে পারতনা তাই কেউ কেউ তাকে যুক্তিবাদী বলতেন।

যার পজেটিভ দিকগুলো লিখে লিখে যদি শেষ করি সবুজ পাতার খাতাগুলো আর নদীর পানি কালি গুলো শেষ হয়ে যাবে তবুও শেষ করতে পারবো না তাঁর স্মৃতিকে। হাজারো স্মৃতি মনে পড়েযায় জীবনের বিভিন্ন মোহনায়। আর কোন দিন পাবনা এমনি তরুন আদর্শবান নেতাকে। আবার যদি শোক গাঁথা লিখতে লিখতে জীবন শেষ করে দেই তবুও ফিরে পাবো না তাকে, তবে স্মরণ করতে চাই কি ভাবে হারালাম আমার প্রিয় নেতাকে।

৭ই জুন রাতের সদস্য বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাদ ফজর মদন ডাঙ্গা কামাল মেসে এসেছিলেন বিষয়টাকে মিমাংসা করার জন্য কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি এভাবে চিরন্তন মিমাংসা হয়ে যাবে বাতিলেরা চিরতরের জন্য বিদায় করে দিবে আমাদের প্রিয় নেতাকে। সারাদিন কর্ম চঞ্চল খোদার সিপাহী সৈনিক যখন জুমআর নামায আদায় করে খোদায়ী দান দু' মুঠো অন্ন গ্রহণ করছেন এমনি সময়ে হায়েনার দল এসে চতুর্দিক থেকে এ্যাটাক

www.pathagar.com

করে বসলো রফিক ভাইকে। তাদের হাতে থাকা রড্, হাতুড়ি দিয়ে মাথাটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল পাপিষ্টরা। রফিক ভাইকে যখন নির্দয়ভাবে হাতুড়ি পিটা করছিল তখন পাশে দরজার আড়ালে কামাল ভাই-র মেয়ের বুক ফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস কম্পমান হয়েছিল। থর থর করে কাপতে ছিল খোদার আরশ। কিন্তু পাপিষ্টদের হৃদয়ে কোন দয়ার সঞ্চার হয়নি। কি নিষ্ঠুর ছিল তারা। মানুষ হয়ে মানুষকে এভাবে হত্যা করতে পারে? রফিক ভাইর সাথে তাদের অর্থনৈতিক কোন লেনদেন ছিল না। ব্যবহারে কোন খারাপ করেনি তবু কেন তারা তাকে হত্যা করল?

এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তা'য়ালা এখন থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সুস্পষ্ট ভাবে দিয়েছিলেন যা আজ বাস্তবে রূপ পাচ্ছে 'তাদের কোন অপরাধ নেই। তাদের অপরাধ একটিই তারা মহা পরাক্রমশালী রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে'। এই একটি মাত্র অপরাধে তারা রফিক ভাইকে হত্যা করেছে– "ঈমানদারগণ সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে, আর কাফিররা সংগ্রাম করে শয়তানের পথে, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত বড়ই দূর্বল।"

শয়তানের বিরুদ্ধে যারা নিজের জান ও মাল দিয়ে সংগ্রাম করে এবং সর্বশেষ নিজেই সাক্ষী হয়ে যায় দ্বীনের হেফাযত ও খেদমতকারী হিসেবে। তখন তাকে বলা হয় শহীদ। আর যারা শহীদ বেশে চলে যাবে এই ধরা ধাম থেকে তাদের জন্য বলা হচ্ছে– "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত্যু বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।"

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যুগে যুগে এভাবে জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছেন নিঃস্বার্থভাবে কত মর্দে মুমিন, ঝরে গেছে কত ফুটন্ত গোলাপ। রঙে লাল করে গেছে এই বাংলার সবুজ প্রকৃতিকে, সুবাস দিয়ে গেছে নিতে পারেনি কিছুই। আজ গোলাপ শুন্য কানন খাঁ, খাঁ করছে– ভ্রমর ঘুরছে শুধু শুধু কোথাও পাচ্ছে না সেই ফুটন্ত গোলাপটিকে। যে মালি এক দিন এই কাননকে সৃষ্টি করে ছিলেন গোলাপ পাওয়ার আশায় সে গোলাপ পাওয়া মাত্র উঠিয়ে নিলেন নিজের স্বহস্তে তৈরী বেহেশত নামক কাননকে সাজাবার জন্য।

হে আল্লাহ তুমি তোমার কাননকে আরো সুন্দর করে সুশোভামন্ডিত করো এমনিভাবে ফুটন্ত গোলাপগুলো নিয়ে তবে একটি বারের জন্য হলেও আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজ দাও গো প্রভূ।

লেখক ঃ সহকারী শিক্ষা সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ই.বি.।

www.pathagar.com

শত স্মৃতিতে ভাস্বর শহীদ রফিক আমার প্রেরণার উৎস

মোঃ আব্দুল মান্নান

১৯৯৩ সালে শিবিরের একটি T.C তে রফিক ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। সদা হাস্যোজ্বল সদালাপী রফিক ভাই তিনদিনেই সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান। এরপর দীর্ঘদিন তার সাথে সাক্ষাৎ ছিলনা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তাকে পেয়েছিলাম নিজের অত্যন্ত আপন জন হিসেবে। আর এজন্য যখনই বাড়ী থেকে আসতাম তখনই উনি আমার রুমে এসে খোঁজ খবর নিতেন। আর প্রায়ই সময় মান উন্নয়নের জন্য আমাকে উৎসাহিত করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে যতদিন রফিক ভাইকে পেয়েছি, দেখেছি তার অধিকাংশ সময়গুলো কেটেছে যুদ্ধ ও সংগ্রামের মাঝে। কেননা তখন আওয়ামী যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল দেশের ১২ কোটি তৌহিদি জনতার হৃদয়ের স্পন্দন ইঃ বিঃ এর কালেমার আস্তাবাহী সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। দিনের বেলায় কাম্পাসে মুকাবিলা ও রাত্রীবেলা হল পাহারাদারীতে রফিক ভাইয়ের তত্ত্বাবধায়ন জনশক্তিকে উৎসাহিত করত।

কিন্তু সাদ্দাম হলের সামনে বিড়ি খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামান্য সংঘর্ষ হয় আওয়ামী মদদপুষ্ট জাসদের সাথে। পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে হলগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়। হল ছেড়ে যাবার সময় পথে সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় রফিক ভাইয়ের সাথে বাসের গেটে দাড়িয়ে গেলাম। ঝিনাইদহতে যেয়ে রাত্রী যাপন করলাম। রাত্রে শহরে কিছু কাজ শেষ করার জন্য রফিক ভাইয়ের

www.pathagar.com

থেকে ১ ঘন্টার ছুটি নিয়েছিলাম এবং ফিরে এসে উনার পাশেই ঘুমিয়েছিলাম। এটাই ছিল তার সাথে আসার শেষ ছুটি এবং ঘুম।

পরের দিন শুক্রবার সম্ভাব্য গ্যাঞ্জাম এড়ানোর জন্য মুহতারাম রাসেল ভাইয়ের সাথে রফিক ভাইসহ আরো কয়েকজন ভাই গেলেন সমঝোতা বৈঠকের জন্য। বিকাল ৩টায় ছিল সমঝোতা বৈঠক। সেজন্য আমরা যারা ঝিনাইদহতে ছিলাম বলা হলো ৩ টার মধ্যে মদনডাঙ্গায় যেতে হবে। সেজন্য জুমার নামাজ শেষ করে দ্রুত খেয়ে নিলাম। মনটা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল মদনডাঙ্গায় যাওয়ার জন্য। বাকীদের খাইতে দেরী হবে ভেবে আমি ও চন্দন ভাই দুজনে আগে চলে আসলাম। বাজারে নামতেই শিবির কর্মী সুইট ভাই বললেন কিছু শুনেছেন কি না? না, বলতেই উনি বললেন রফিক ভাই মারাত্মক আহত আপনাদের এখানে দাড়ানো মোটেও নিরাপদ নয়। মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। দ্রুত গাড়ীতে উঠলাম ঝিনাইদহে যাবার জন্য। আর সারাপথ দুজনে দোয়া করছিলাম হে আল্লাহ তুমি যে কোন কিছুর বিনিময়ে রফিক ভাইকে বাঁচিয়ে রেখো। কিন্তু আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকে তো নিজের কাছেই টেনে নেন।

ঝিনাইদহ হাসপাতালে পৌঁছিয়ে সকলের কান্নাকাটি দেখে আর কিছু বুঝতে বাকি রইলনা। ছুটে যেয়ে দেখলাম আমার প্রিয় ভাইটির মাথাটি থেতলে দেওয়া হয়েছে। আঘাতে মুখও মাথার এক পার্শ্ব অতিরিক্ত ফুলে গেছে। বার বার মনে হচ্ছিল কি অপরাধ ছিল আমার রফিক ভাইয়ের?

খুনী তুমি যখন প্রচন্ড অসুস্থ ছিলে তখন তোমার চিকিৎসাও রক্ত দেওয়া কি ছিল তার অপরাধ?

মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে বৃহস্পতিবার তোমার চাকুরীর দরখাস্ত ঢাকা পৌঁছে ছিল, কিন্তু শুক্রবারে তুমি চলে গেলে জান্নাতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি থেকে ছুটি নিয়ে তুমি বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাগ নিয়ে গেলে কিন্তু তুমি ছুটে গেলে মায়ের কোলে শত শত সাথীদের কাধে চড়ে।

রফিক ভাই, তুমি চলে যাওয়ার পর শহীদী কাফেলার কেন্দ্রীয় সভাপতি যেদিন আমাকে সদস্য শপথ দিয়েছিলেন সেদিন শুধু তোমাকেই স্মরণ করেছি, কেননা আমার সদস্য শপথ হয়তো তোমাকেই বেশি আনন্দ দিত। তুমিই ছিলে আমার প্রেরণার উৎস।

পরিশেষে বলতে চাই শত স্মৃতি ঘটনার জন্ম দিয়ে তুমি চলে গেছো প্রভুর সান্নিধ্যে কিন্তু তোমার রক্তের বিনিময়ে আমরা বাতিলের সাথে আপোষ করিনি। আজ অবধি তারা কাম্পাসে ঢুকতে পারেনি। তোমাদের পাঁচজনের রক্তের বিনিময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় আজীবন কালিমার পতাকা উড়বেই ইনশাআল্লাহ। আমরা নীরব হবোনা নিথর হবোনা যতদিন না শহীদ রফিকের রক্ত ঝরা এদেশে দ্বীনের রাজ কায়েমহবে। হে প্রভু? তুমি তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করো -- ।

www.pathagar.com

ব্যাথাতুর সেই মুহূর্ত

মোঃ ইমদাদুল্লাহ
আল হাদীস বিভাগ, ৯৬-৯৭ইং

সেদিন ছিল শুক্রবার। কতইনা সুন্দর দিন! বড় পবিত্র দিন। পবিত্র রমজান মাসতো আর সারা বছর পাওয়া যায় না। যে মাসে মুমিনের গোনাহ গুলি মাফকরে দেয়া হয়। তাই আল্লাহ তাআলা সপ্তাহের একদিনকে মুমিনের গোনাহ মাফের জন্য বিশেষ ভাবে নির্বাচন করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে শুক্রবার। বড় পবিত্র দিন। মাগফেরাতের দিন। রফিক ভাই সেদিন সকালে আমাদের মাঝ থেকেই চলে আসলেন মদন ডাঙ্গা। কত হাসিমাখা সেই মুখ। তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে, আমিই জান্নাতী বাগানের খোদার প্রিয়তম ফুল হব? আজই কি খোদা আমাকে পরম সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন? গত রাতে আল হেরা একাডেমীতে আমি, সাদ্দাম হল সভাপতি স্বপন ভাই ও জিয়া হলের রানা ভাই বসেছিলাম। রানা ভাই স্বপন ভাইকে বললেন আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি শহরে যাব। স্বপন ভাই তাকে অল্প সময় বেধে দেয়াতে রানা ভাই বললেন আমার যে আরো সময় লাগবে। স্বপন ভাই বললেন এর চেয়ে বেশী সময়তো আপনাকে দিতে পারছিনা। ইতিমধ্যে রফিক ভাই উপস্থিত। স্বপন ভাই রফিক ভাইকে বললেন রানা ভাই ছুটি চাচ্ছে। তখন রফিক ভাইও বললেন বেশী সময় দেয়া যাবে না। তখন রানা ভাই বললেন আমি যদি তাদের মত করি যারা হয়ত একটু সময়ের ছুটি নিয়ে অনেক সময় পরে আসে। রফিক ভাই তখন রানা ভাইকে বললেন, তোমার হিসাব তোমাকেই দিতে হবে। কেউ যদি এরকম করে তাহলে তার

www.pathagar.com

জন্য সেই দায়ী হবে। তুমিকি সেই অন্যায়টি করতে চাচ্ছ? তাদের কথা এভাবে তোমার বলাটিও অন্যায়। সেদিনও দেখলাম এই হাসিমাখা মুখটি নীতির প্রতি কত অটল। কতইনা সক্রিয়। দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসে রফিক ভাইয়ের পাশে থেকে অনেকের মত আমিও রফিক ভাইকে ভালভাবে জেনেছি। দেখেছি তার স্বভাব, তার আচার আচরণ।

আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছি নেতৃবৃন্দের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রাসেল ভাই সহ উর্ধ্বতন কয়েকজন নেতৃবৃন্দ চলে গেছেন মদন ডাঙ্গা। হয়তবা আমাদেরকেও মদন ডাঙ্গায় যাওয়া লাগতে পারে। কিন্তু না! সেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আর থাকতে হলনা। মুহূর্তের ভেতর আকাশ ভারী হয়ে গেল। সমস্ত কিছু যেন হঠাৎ আতকে উঠল। জুমার নামায পর আমরা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের পাশেই এক হোটেলে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম। ইতি মধ্যে কে যেন সংবাদ দিল রফিক ভাই.....। ঠিক এতটুকুই শুনলাম। ভাল বুঝতেও পারলামনা। দৌড়ে চলে গেলেন মাসুদ ভাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়তুলমাল সম্পাদক আঃ জলিল ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই কি হয়েছে? জলিল ভাই বললেন, ওকিছুনা আসলে দ্বীনের মুজাহিদরা মনে হয় এরকমই। আপন প্রিয়জনের মুমূর্ষ আহতের সংবাদ শোনার পরেও তার দায়িত্বের প্রতি তিনি অটল। জলিল ভাইয়ের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল আসলেই হয়তবা তেমন কিছু নয়। তার ভেতর ধৈর্য্যের এতই দৃঢ়তা যেন অন্যান্যদের বুঝে নেবার সাধ্যই নেই। কিন্তু তবুও মন মানছিলনা। মনে হল হয়তবা বড় কিছু ঘটে গেছে। মুখের ভেতর খাবার আর নিতেই পারলামনা। অমনি হাত ধুয়ে দৌড়িয়ে বের হলাম। শুধু জলিল ভাইকে বললাম আমি চলে গেলাম। দৌড়ে গেলাম হাসপাতালের দিকে। সামনে এগুতেই দেখলাম ভয়াবহ এক দৃশ্য! বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রাসেল ভাই রক্তাক্ত, সাথে শওকত ভাইও রক্তাক্ত। রফিক ভাই অচেতন অবস্থায় শায়িত। রক্তে ভেসে গেছে শরীর। দেখেই যেন অবাক হয়ে গেলাম। অস্থির হয়ে পড়লাম। কারা রফিক ভাইকে এভাবে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মাথাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল? কি অপরাধ ছিল রফিক ভাইয়ের? কারা এত নিষ্ঠুর? কারা এত পাষান? অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। রফিক ভাইয়ের এ রকম অচেতন অবস্থা দেখে নিজেকে আর স্বাভাবিক রাখতে পারলাম না। দুচোখের বাধ ভাঙ্গা পানি যেন শ্রোতের মত গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। রফিক ভাইকে দ্রুত হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা সেই ও.টি. রুমের গেটে সবাই দাড়িয়ে রইলাম। রাসেল ভাই সবাইকে বললেন, আপনারা দোয়া পড়তে থাকেন। আমরা সবাই দোয়া পড়তে লাগলাম। অধীর আগ্রহে দাড়িয়ে রইলাম বাহিরে। হে আল্লাহ রফিক ভাইকে এত তাড়াতাড়িই আমাদের মাঝ থেকে উঠিয়ে নিও না। তুমি রফিক ভাইকে সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দাও। হঠাৎ ও.টি. রুম থেকে ডাক পড়ল, আহত ব্যক্তির অভিভাবক কে? তখন ঝিনেদা জেলা সভাপতি মুস্তাফিজ ভাই ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সেক্রেটারী মুক্ত ভাই ও.টি. রুমে প্রবেশ করলেন।

www.pathagar.com

আমরা সবাই মূহ্যমান। সবাই মাটির দিকে তাকিয়ে শুধু দোয়া পড়ছি। ইতিমধ্যে রাসেল ভাই বললেন আমরা আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি। এবলেই হাত উঠালেন। আমরা সবাই হাত উঠালাম। আর সবাই সাথে সাথে খোদার কাছে কান্নায় এভাবে ভেঙ্গে পড়লেন যেন তাদের কান্নায় খোদার আরশ কাপছে। সবার বুক ভরা কান্নায় মনে হল সারা দুনিয়া যেন আজ রফিক ভাইয়ের সুস্থতার জন্য কান্নায় ফেটে পড়ছে। রাসেল ভাই দোয়া করলেন হে খোদা তুমি রফিক ভাইকে সুস্থ করে দাও। হে খোদা তুমি রফিক ভাইকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু না! রফিক ভাই যে তখন খোদার বড়ই প্রিয় পাত্র হয়ে গেছেন তাতো আর আমাদের জানা ছিলনা। খোদার সেই প্রিয়তম ফুলটি যে খোদা পছন্দ করেই গ্রহন করেছেন তাতো আর আগে বুঝি নাই। ইতিমধ্যে মুস্তাফিজ ভাই ও.টি. রুম থেকে বেরিয়ে এসে কান্না ভেজা মৃদুকণ্ঠে বললেন সবাই মসজিদে চলেন। তখন কারো বুঝে নেয়ার আর বাকী রইলনা। মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। সবার বুক ভরা কান্না যেন ফেটে পড়ল চতুর্দিকে। চারিদিকে শুধু কান্নার আওয়াজ। সমস্ত হাসপাতাল যেন শোকের ছায়ায় বধির হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল যেন পুরো পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসছে। সত্যের সেই দীপ্তমান সূর্যটি যেন অস্ত হয়ে গেল। সবাই মসজিদে আসতে আসতেই আবেগাপ্লুত শওকাত ভাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। ধরাধরি করে মসজিদের বারান্দায় সোয়াতে সোয়াতেই আরো সংজ্ঞা হারালেন মাসুদ ভাই, জিল্লু ভাই, নজরুল ভাই সহ আরো কয়েকজন। কেন এত কান্না? কেন এত ভালবাসা? কিসের জন্য আজ এরা সংজ্ঞা হারা? তখন আমার মনে পড়ল কোরানের সেই অমীয় বাণী- "আর তার সাথে যারা রয়েছে তারা (দ্বীনকে) অস্বীকার কারীদের উপর বড়ই কঠোর কিন্তু তাদের নিজেদের প্রতি একে অপরে পরস্পর রহম দিল।"

চারিদিকে শুধু কান্না আর কান্না। হাসপাতালে হাজারো মানুষ জমে গেছে। সবারই একই কথা, যাকে মেরেছে সে বুঝি কতইনা ভাল মানুষ ছিল। তাকে হারিয়ে তার সাথীরা আজ পাগল পারা। আর যারা মেরেছে তারা কতইনা নিষ্ঠুর। আমি সহ আমার সাথীরা কয়েকজন সংজ্ঞা হারা ভাইদের সেবা শুশ্রুষা শুরু করে দিলাম। তাদের জ্ঞান ফিরলেই তারা আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। তাদেরকে কি বলেই বা শান্তনা দেব। শান্তনার এমন কোন বাণী কি আছে যা শোনালে তারা দুঃখ ভুলে যাবে? এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রাসেল ভাই পাশেই এক সুপারি গাছের সাথে হেলান দিয়ে পাথরের মত দাড়িয়ে প্রিয়জন হারা বেদনায় নিরবে শুধু কাঁদছেন। তার চোখে পানি বের হওয়া ছাড়া আর কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু বুক ভরা ব্যাথা নিয়ে অসহায়ের মত শুধুই অশ্রু বিসর্জন দিতেছেন। যে সমস্ত ভাইয়েরা কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে একটু শান্তনা দেবার জন্য ধরে নিয়ে আসি রাসেল ভাইয়ের কাছে একটু শান্তনা দেয়ার জন্য। কিন্তু তাতে কি হবে? রাসেল ভাইয়ের কি আর এমন ভাষা আছে যাতে তাদেরকে শান্ত করবে? তাদেরকে রাসেল ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসার সাথে সাথে

www.pathagar.com

রাসেল ভাই তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনিও যেন নির্বাক অসহায়ের মত দাড়িয়ে থাকেন। শান্তনা তো দুরের কথা তার চোখ দিয়ে যেন আরো প্রবল গতিতে ঝর্ণার মতপানি ঝরতে থাকে। কি দিয়েইবা শান্তনা দেবেন তিনি। তবুও নিজেকে সংবরণ করে সবাইকে বুকে জড়িয়ে শুধু একথাই বলতেন– রফিক ভাইতো শহীদ হয়েছেন। আল্লাহর প্রিয় ফুলটি আল্লাহ গ্রহণ করে নিয়েছেন। আমরা আমাদের শোককে শক্তিতে পরিনত করে আল্লাহর পথে নতুন উদ্দমে ঝাপিয়ে পড়ব।

কিছুক্ষন পর শহীদের মিছিল শুরু হল। সারা ঝিনেদা শহর যেন ব্যাথাতুর নীরব নিস্তব্ধ এক জনাকীর্ণ এলাকায় পরিনত হয়ে গেছে। শহীদের সেই শ্লোগান যেন ইথারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে– শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না, আল কোরানের শত্রুরা হুশিয়ার সাবধান। কিছুক্ষন পর আমি, শরীফুল ইসলাম সুমন ভাই সহ কয়েকজন শহীদের লাশকে নিয়ে গেলাম ময়না তদন্ত করানোর জন্য। ইতিমধ্যে মাইকে ঘোষনা হচ্ছে শহীদের জানাযা আগামী কাল সকাল নয়টায় ঝিনেদা অগ্রণী চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে।

ঠিক পরদিন সকাল আট ঘটিকার দিকে আলহেরা একাডেমী থেকে শহীদের কফিন নিয়ে রওনা হলাম ঝিনেদার অগ্রণী চত্বরের দিকে। কিন্তু সেদিন একটি বিষয় যেন আমাকে আসলেই প্রকৃত সত্যকে সাক্ষ্য হিসেবে প্রমান করে দিয়ে গেল। আর তা হচ্ছে শহীদেরা আসলেই জীবিত। অর্থাৎ কফিন যখন নিয়ে রওনা হলাম তখন রফিক ভাইয়ের শরীর থেকে তাজা রক্ত টপ্ টপ্ করে পড়তেছিল পিচ ঢালা কালো পথের উপর। রাস্তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফোটায় ফোটায় রক্ত যেন পড়তেই লাগল। আমি সার্বক্ষনিক ভাবে রফিক ভাইয়ের কফিনের সাথেই ছিলাম। আমি সেদিনই বাস্তবতায় প্রমানিত হলাম শহীদেরা আসলেই জীবিত। জানাযা অনুষ্ঠিত হল। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি এবং শহীদ রফিক ভাইয়ের একান্ত সাথী নজরুল ইসলাম ভাই। উপস্থিত ছিলেন শিবিরের কেন্দ্রীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক, শহীদের সাথীরা এবং ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ ও রফিক ভাইয়ের শুভাকাঙ্ক্ষি সহ হাজারো মানুষ। জানাযা উত্তর শহীদের কফিন নিয়ে রওনা হলাম শহীদের নীজ গ্রাম সাতক্ষীরার আশাশুনীর লাঙ্গল দাড়িয়া গ্রামের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী ছুটছে সেই সুদুর পথ পানে। যখন সাতক্ষীরা শহর থেকে তাঁর গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম বিভিন্ন গ্রামের মানুষেরা সবাই রাস্তায় রাস্তায় দাড়িয়ে আছে শহীদের লাশ দেখার অপেক্ষায়। আমি বড় অভিভূত হলাম, সারা সাতক্ষীরা যেন রফিক ভাইয়ের শাহাদাতের শোকে মুহ্যমান! আমি সারা রাস্তা আমাদের গাড়ীর দরজাতেই দাড়িয়ে ছিলাম। রাস্তার দুধার দিয়ে অধীর আগ্রহে মানুষেরা দাড়িয়ে আছে শহীদের লাশ দেখার জন্য। আমরা তো শুধু যাচ্ছিই আর যাচ্ছি। কফিনের গাড়ীটি ছিল আমাদের পেছনে। আমি দরজায় দাড়িয়ে শুধু তাদের ইশারা করে বুঝিয়ে দেই শহীদের গাড়ী পেছনে আসছে। এভাবে রফিক ভাইয়ের

www.pathagar.com

বাড়ীতে পৌঁছতেই মাইকে আওয়াজ আসছে প্রতিবাদ সমাবেশের। গ্রামবাসীরা এই জালিম সরকারের পৈশাচিক হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে শহীদের বাড়ী উপস্থিত হলাম। প্রথমেই রফিক ভাইয়ের আব্বার সাথে দেখা হল। আল্লাহ আকবার! তিনি যেন দ্বীনের জন্য পাগল পারা আরেক মুজাহিদ। অত্র অঞ্চলের আলেমে দ্বীন। তার চেহারায় যেন সামান্যতমও মলিনতার ছাপ নেই। কত ধৈর্য্যশীল, কতদৃঢ় গর্বিত পিতা। মনে হল সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত আরেক প্রাণ পুরুষ। আমরা সালাম দিয়ে মুছাফাহা করার সাথে সাথেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? আমরা হতবাক যে তিনি ঈমানের বলে কতইনা বলিয়ান। হাসিমুখে আমাদের সাথে কথা বলছেন। তার পরেও পুত্রের বিদায়ের শোক তাকেও ব্যথিত করেছে। আমাদের সাথে হেসে হেসে কথা বলছেন কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখলাম তার দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি পড়ছে তবুও যেন তিনি কথা বলছেন আর হাসছেন। আসলেই মহৎ হৃদয়ের অধিকারী।

শহীদ পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে চলে যাই শহীদের কবরের পাশে। কবরটি ছোট্ট একটি বাঁশ বাগানের পাশেই খনন করা হয়েছে। বেশ ছায়া ঢাকা একটি নিবিড় স্থানে। শহীদের কবর দেখার পর আমি পাশেই এক গাছের শিকড়ের উপর বসলাম। তখন আমার চোখে ধরা পড়ল রফিক ভাইয়ের গ্রামটি, কতইনা নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মন্ডিত। চারিদিকে চিংড়ি চাষের ঘের। শুধু পানি আর পানি। প্রতিটি ক্ষেতের চতুর্দিকে আইল বাধা। আইল রাস্তা ধরে এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। শহীদের জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য দুর দুরান্ত থেকে মানুষগুলি যেন সারিবদ্ধভাবে ছুটে আসছে পানির পাড়ের ঐ আইল বাধা রাস্তা দিয়ে। আসছে ছোট বড় যুবক বৃদ্ধ। তখন মনে হল রফিক ভাই বুঝি খুবই প্রিয় ছিল এই ব্যাথাতুর হৃদয়গুলির। আমি শুধু অবাক হয়ে এ দৃশ্যগুলি দেখতেছিলাম। তখন আমার মনে আরো জাগল রফিক ভাইয়ের ফেলে যাওয়া স্মৃতিগুলি। এই পানির কিনারায় আমি যে গাছটির শিকড়ের উপর বসে আছি নাজানি রফিক ভাই এখানে কতবার বসেছেন। বসেছেন হয়তবা বন্ধুদের নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে। কতইনা নৈসর্গিক এই দৃশ্য! পূর্ণ চাঁদিমা রাতের ঝিক্ মিক্ করা বারিধারার সেই অপরূপা নৈসর্গিক চন্দ্রালোকের প্রতিফলন হয়তবা রফিক ভাইকে কতইনা আশির্বাদ করেছে। কি উন্মুক্ত জায়গা। চাঁদিমা রাতে বুঝি শুধু চারিদিকে রূপারমত ঝিক্ মিক্ করত পানির ঢেউ। আর এজন্যই বুঝি রফিক ভাইয়ের হৃদয়টি এত প্রশস্ত ছিল। এ উদার ছিল। ছিল এত খোলামেলা। ছিলনা অহংকারের বিন্দুমাত্র লেশ। সন্ধার পূর্ব মূহুর্তে শহীদের পঞ্চম এবং সর্বশেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হল। জানাযায় ইমামতি করলেন শহীদের গর্বিত পিতা আলেমে দ্বীন মাওলানা সাইদুর রহমান।

তারপর খোদার সেই প্রিয় বান্দাকে পূর্ণ বিশ্রামের জন্য চিরনিদ্রায় শায়িত করলাম তার চিরন্তন ঠিকানায়।

(মিনহা খালাকনাকুম, ওয়াফিহা নুয়ীদুকুম, ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারতান উখরা।)

www.pathagar.com

যে কথা হৃদয়ে বাঁজে

মুহা. রেজাউল হক

ইসলাম যুগে যুগে শহীদদের রক্ত সিক্ত জমিনে বিকশিত হয়েছে সজীব পত্র-পল্লবে, নয়া জামানার তরুনের রক্ত শাহাদাত যুগিয়েছে অনন্ত প্রেরণা, জেগে উঠেছে ঘুমন্ত যুবকের হৃদয়ে বাঁধ ভাঙ্গাজোয়ার, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যৌবন এসে দাঁড়িয়েছে দুশমনের রক্তচক্ষু ও উন্মুক্ত কৃপানের সামনে অমিত সাহসে ভর করে দ্বিধাহীন চিত্তে। তাইতো কবি'র ভাষায় বলতে হয়–

"রক্ত পাথরে সাঁতারি আবার
আসে মুসলিম জাহানে দিন,
জীবনের পথে জাগে একসাথে
লক্ষ সূর্য্য শংকাহীন।"

সেদিন ছিল ৮ জুন ২০০১ এর শুক্রবার, রাত প্রায় ১১ টার সময় ডা. মঞ্জু ভাই আলমডাঙ্গা শিবির অফিসে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন। আমি তখন বসে অন্য একটা কাজ করছিলাম। হঠাৎ মঞ্জু ভাইয়ের আগমনে কিছুটা বিস্মিত হলাম আবার চেহারা দেখে কিছু একটা ঘটেছে ভেবে আৎকে উঠলাম। তারপর বসেই তিনি শুনালেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভাইয়ের শাহাদাতের খবর। যখন শাহাদাতের খবর কানে শুনলাম তখন থেকে কয়েক মিনিট বাকহীন অবস্থায় কাটল। হৃদয়ের ভিতর তখন বার বার দোল খাচ্ছে, এখন শহীদ রফিক ভাইয়ের আম্মা কিভাবে সময় কাটাচ্ছে; আব্বা ও ভাই বোনেরাই বা কি করছে? আম্মার বুক ফাটা আর্তনাদে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে শান্তনা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলে আম্মা হয়তো বলছেন, তোমরা আমার রফিককে

www.pathagar.com

এনে দাও; কৈ আমার রফিক তো কোনদিন আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে ব্যাগ রেখে মা, মা বলে ডাকবেনা। আসলেই রফিক ভাই আর কোন দিন এসে মা বলে ডাকবে কি? পরের দিন আমরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে শহরবাসীকে জানিয়ে দিলাম, যারা শহীদ রফিকের মত একজন প্রদীপ্ত যুবককে একা পেয়ে খুন করতে পারে, তাদের মতো নর-পিশাচদের শহীদ তিতুমীরের রক্তস্নাত এই জমীনে স্থান নেই। আমরা শহীদ রফিকের রক্তকে স্বাক্ষী রেখে দৃপ্ত হাতে শপথ নিলাম যতদিন এই জমীনে ইসলামের স্বর্ণযুগ না আসবে ততদিন আমরা আমাদের পথ চলাকে করব আরও দূর্বার, অনন্ত।

সর্বশেষ রফিক ভাইকে দেখেছিলাম শাহাদাতের ১৩ দিন পূর্বে রাত প্রায় ২ টার দিকে সাদ্দাম হলের ৩য় তলায়। আমি গিয়েছিলাম সদস্য হওয়ার জন্য সি.পি'র সাথে কন্ট্রাক্টে, সাথে অনেক ভাইও ছিলেন। অনেকে রাতের গভীরতায় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছেন। এরকমই এক ভাই বললেন আমি মুজিব হলে চলে যাচ্ছি। আর তখনই রফিক ভাই সবার সামনেই ঐ ভাইকে লক্ষ্য করে আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সদস্য হওয়ার এটাই তো পরীক্ষা, এখানে ধৈর্য্য হারালে সদস্য হবেন কিভাবে? আর যখন জীবনের প্রশ্ন আসবে তখন কিভাবে টিকে থাকবেন।" একেবারে এই কথাগুলোই তিনি সেদিন বলেছিলেন। আমি পাশে থাকার কারণে কথাগুলো আমার হৃদয়তন্ত্রীতে আজও বারবার ঝংকার দিয়ে ওঠে। আসলেই কি আমরা পারব তিনি যেভাবে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিলেন সেভাবে....। তিনি জীবন দিয়ে শহীদী মিছিলকে করলেন আরো লম্বা। যখন শহীদ আঃ মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের খবর বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) কে জানানো হয় তখন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন- "মালেক এদেশের ইসলামের পথে প্রথম শহীদ হতে পারে, কিন্তু শেষ নয়।" তাইতো সেই চির ভাস্বর বাণী অনুযায়ী মালেক ভাই যে মিছিলের ফলক উন্মোচন করেছিলেন সেই মিছিলে শহীদ শাব্বির, হামিদ, আইয়ুব, জব্বার শরীক হয়েছেন। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে যে মিছিল অনেক বড় হয়ে উঠেছে। একে একে ১১৮ জন তাজা গোলাপ মিছিলকে স্বাগত জানালেন। শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাই একই মিছিলের ১১২তম সাথী হিসাবে নাম লেখালেন ৮ জুন ২০০১। এ মিছিল থামবেনা, গন্তব্য তার জান্নাতের বাগান। যুগে যুগে আল্লাহর অনুগত নেক বান্দারাই এ মিছিলের অংশীদার হবার সুযোগ পেয়েছেন। শহীদদের রক্তস্নাত সিঁড়ি বেয়েই আল্লাহর এই জমীনে ইসলামী বিপ্লব সফল হবে, গরীব, দুঃখী-অসহায় মানুষেরা অধিকার ফিরে পাবে, সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার।

লেখক ঃ প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, চুয়াডাঙ্গা জেলা।

www.pathagar.com

শহীদ রফিক এখনও যিনি আমাদের নেতা

মুঃ আবুল কালাম আজাদ

আপোষহীন সংগ্রামে বিজয়ী এক দূরন্ত সেনাপতির নাম শহীদ রফিক। যার হাসিমাখা ঝলমলে চেহারায় সারাক্ষন লেগে থাকতো প্রশান্তির অমিয় ধারা, হৃদয়ের গহীন কোনায় উঠত ভালবাসার প্রবল জোয়ার। অতিরঞ্জিত কোন শব্দমালার কাব্য গাঁথুনীনয় শহীদ রফিক সেই যুবক; যে যুবক কোন দিন মিথ্যার চোরা বালিতে হারিয়ে যায়নি, যার চারিত্রিক রূপ সৌন্দর্য ছিল মনোমুগ্ধকর, জুই চামেলির চেয়েও সুবাসিত একবাড়ন্ত গোলাপ।

শহীদ রফিক ভাই ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো ছাত্রের প্রিয় নেতা। তাঁর হাসিমাখা মুখ সবার হৃদয়কে জয় করতো অতি সহজে। তিনি ছিলেন স্পষ্ট ভাষী, আমানতদারী, সত্যের প্রতি অবিচল ও বাতিলের জন্য এক প্রচন্ড বিদ্রোহ। যার কারণে ইসলাম বিরোধীরা সহজে মেনে নিতে পারেনি তাঁকে। আদর্শিকভাবে পরাজিত হয়ে তারা শহীদ রফিক ভাইকে হত্যার পথ বেছে নিল।

১৯৯৮ সাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে Admission Test দিতে এসে প্রথম সাক্ষাৎ হয় শহীদ রফিক ভাইয়ের সাথে। প্রচন্ড পক্স রোগে তখন আমার শরীর কাঁপছিল, দাড়িয়ে থাকা খুব কষ্ট হচ্ছিল। ঐসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীন সমস্যা নিয়ে ছাত্র ধর্মঘট চলছিল। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হলগুলো বন্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল। এমনি এক জটিল পরিস্থিতিতে আমি আমার সমস্যার কথা জানালে। রফিক ভাই শত ব্যস্ততাকে

www.pathagar.com

উপেক্ষা করে নিজের ভাইয়ের মত যত্ন করে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিম পার্শ্বে (শিবিরের সাবেক দায়িত্বশীল) ওমর ভাইয়েরবাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেদিন থেকেই শহীদ রফিক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। এরপর ভর্তি হয়ে অনেক বার সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে রফিক ভাইয়ের সাথে। তাঁর ভিতরে যে মহৎ ব্যক্তিত্বের ছাপ আমি পেয়েছি যা সচরাচর সবার মাঝে পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ তাঁর পছন্দের গোলাপটিকেই শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন।

প্রাণ খোলা হাসি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করার এমন যাদুকরী ক্ষমতা আল্লাহু সবাইকে দেন না। আর যারাই এই সম্মোহনী শক্তির উত্তরাধিকারী তারাই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা রাখে। শহীদ রফিক ভাইয়ের মাঝে ছিল শত্রুর জন্যও শান্তির নিরব আহ্বান; যার কারনে তিনি শত্রু মিত্র সবাইকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু নরপিশাচদের নির্মম আঘাতে সেই উজ্জ্বল চোখ দুটিকে করে দিল চির দিনের জন্য স্থির ও শক্তিহীন। প্রচন্ড সহজ-সরল এই যুবকের মাঝে ব্যক্তিত্বের গাঁথুনী ছিল ভীষন মজবুত। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ার মাঝে তাঁর এই ব্যক্তিত্বের ভিত কখনো কেঁপে ওঠেনি। তিনি সত্যও ন্যায়ের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। অন্যের করুনা প্রার্থী হওয়াটা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। এটা তাঁর কোন অহংকার ছিলনা বরং তাঁর নির্মল চরিত্রের সাথে এই দুর্লভ গুনটি সঙ্গী-সাথীদের কাছে বাড়তি আকর্ষনের কারণ। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তিনি ছিলেন পাগলপারা এক মুজাহিদ। তিনি বলতেন– "সারাক্ষন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত যেন বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়তে পারি।" তাই তো আমরা দেখেছি রফিক ভাই দ্বীনি আন্দোলনের জন্য পথে-প্রান্তরে সারা দিন ঘুরে বেড়াতেন। দুনিয়ার কোন চাক-চিক্য তাঁর চলার পথকে থামিয়ে দিতে পারেনী এতটুকুও। সকল চাওয়া পাওয়া ছিল তার একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জন, যে কারণে কোন বাঁধা তাঁকে আল্লাহর পানে পথ চলা থেকে থামিয়ে দিতে পারেনি।

আল্লাহ তা'আলা শহীদী বাগানের যে গোলাপটিকে সবচেয়ে বেশী ভাল বাসেন তার সুঘ্রানও বাড়িয়ে দেন। এমন মার্জিত ও রুচিশীল মানসিকতার খুব কম যুবককে দেখেছি আমি। ইসলামী আন্দোলনের এই তরুন সিপাহসালার সংগঠনের প্রতি সবসময় ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল। সংগঠনের দায়িত্বশীলকে নিজের অভিভাবক মনে করতেন। তাদের ব্যাপারে অযাচিত মন্তব্য থেকে দুরে থাকতেন। যা বলার সামনে বলতেন। সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। অনেক চেষ্টা করে রফিক ভাইকে আগে সালাম দেওয়া যেতনা, তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ছিল শিক্ষনীয়।

৮ই জুন বিকালে শাহাদাতের ঘটনা ৯ই জুন ২০০১ সাল শুক্রবার সকালে আমাদের বাড়িতে খবর পৌঁছাল রফিক ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। একথা শুনে আমার ও আমার মেজ ভাই (শিবিরের সাবেক সদস্য) আলমগীর (দুজনই সাংগঠনিক ছুটিতে

www.pathagar.com

ঐদিন বাড়িতে ছিলাম) কান্না শুরু হল আমাদের। এরপর ঝিনেদার উদ্দেশ্যে বাড়ি হতে বের হয়ে এলাম। আলহেরা থেকে অগ্রণী চত্বরে লাশ নিয়ে এসে জানাযা হল। সে এক করুন দৃশ্য। সর্বস্তরের ছাত্রজনতার চোখে পানি। অপর দিকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতিবাদ মুখর হয়ে ঘোষণা করছে।

"উজাড় দু'হাত জুড়ে শোধ নেব ঋণ,
দেবনা সীমানা ছেড়ে ইঞ্চি জমিন"

সেদিন আর ফিরে আসবেনা কোনদিন। অনাগত কাল ধরে মিছিল হবে রাজপথে, শ্লোগান হবে, বাড়বে মিছিলকারীর সংখ্যা। কিন্তু অমন প্রশস্ত বাহুমেলে মিছিল আগলে ধরে রাখার মত সিপাহসালার কি আসবে? হয়তো আর কোনদিন ফিরে আসবে না। ইতিহাসের পিরামিড একদিন ধ্বংশ হয়েই ভোরের আকাশের রক্তিম আভা মিলিয়ে যাবে সূর্যোদয়ের সাথে। কিন্তু শহীদ রফিক ভাই এর চরিত্রের বর্ণ ফ্যাকাশে হবেনা কোনদিন। কারণ তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের আলোর মশাল। তার যোগ্য নেতৃত্ব আর ঈমানের বলিষ্ঠতা দেখে মুগ্ধ হত সবাই। শহীদ রফিক ভাই আজ আর নেই, আছে তাঁর শত স্মৃতি, শত কথা, যা আজো অম্লান দর্পনের মত স্বচ্ছ। তাইতো তিনি শহীদ হয়েও এখনও আমাদের নেতা।

www.pathagar.com

তাঁর মত যেন হতে পারি

আসাদ বিন আলীম
আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ

দায়িত্বশীলের নির্দেশে শহীদের পিতার সঙ্গে বাসে চললাম সাতক্ষীরার সেই সোনার মাটির উদ্দেশ্যে-যেখানে ঘুমিয়ে আছেন সবচে' সৌভাগ্যবান ভাইটি, শহীদ রফিকুল ইসলাম। যার রক্তকে আল্লাহ পছন্দ করেছেন ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য। শহীদের গর্বিত পিতাকে সঙ্গে নিয়ে বাস, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদির ঝক্কি ঝামেলা পেরিয়ে যখন পা রাখলাম সেই কাংখিত মাটিতে-পবিত্র এক পেলব শিহরণ যেন দোলা দিয়ে গেল হৃদয়ের গহীন তলদেশে। হাঁটছি আর ভাবছি-এইতো সেই মাটি-যে মাটিতে শহীদ রফিককে দেখা গেছে বন্ধুদের সাথে খেলায় মেতে উঠতে; এইতো সেই ঘাস-যার উপর শহীদ রফিকের ছুটে চলা পায়ের ছাপ আজও ভাস্বর হয়ে আছে; এইতো সেই গ্রাম-যে গ্রামের আলো-বাতাসে গড়ে উঠেছিলেন শহীদ রফিক এ গ্রামেরই তো প্রতিটি বন্দরে বন্দরে শহীদের হাজারও স্মৃতি চিহ্ন লেপ্টে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। কিন্তু আর কখনও শহীদ রফিকের পদভারে কম্পিত হবে না। এ গ্রাম-তাঁকে আর নিবিড়ভাবে কাছে পাবে না এ মাটি-এ ঘাস! এসব ভাবতে ভাবতে অবশেষে কখনও যে অনেক প্রত্যাশিত সেই বাড়ীর দরজায় পৌঁছে গেছি-টের পাইনি।

বাড়ীতে ঢুকে শ্রদ্ধাভরে সালাম দেবার সুযোগ হলো শহীদের মাকে। কথাও হলো কিছুক্ষণ। কিন্তু শহীদ রফিক ভাই সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করতে পারলাম না। শুধু তখন নয়-তারপর ঐ বাড়ীতে দু'দিনের

www.pathagar.com

অবস্থানের মাঝে অনেক বার কথা হয়েছে শহীদের মায়ের সাথে-অনেক সুযোগ এসেছে প্রশ্ন করার এবং মনে মনে অনেক সিদ্ধান্ত ও নিয়েছি ঃ কিন্তু যখন মায়ের সামনে দাঁড়িয়েছি, তখন আর প্রশ্ন করতে পারিনি। মায়ের পানে তাঁকিয়ে সবকিছু যেন গুলিয়ে গেছে বারবার। শুধু ভেবেছি কী প্রশ্ন করবো-উত্তরতো আমারই জানা আছে। যে সন্তান মায়ের জন্য ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে, হাজারও গল্পের ফুলঝুড়ি নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে চিৎকার করে মাকে বলবে-"মা-এই দ্যাখো তোমার জন্য কত কিছু এনেছি।" মা-ও তখন ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বলবে "পাগল ছেলে আমার!"

অথচ সাদা কফিনে জড়িয়ে সেই ছেলেই যখন লাশ হয়ে নির্বাক মুখে বাড়ী ফেরে আর মাকেও নিরবে বোবার মতই চোখের অশ্রু দিয়ে বরণ করে নিয়ে আবার তাকে বিদায় জানাতে হয়-চির বিদায়। তখন একজন মা'র জীবন কতটুকু বিষাদ ময়, ব্যথাতুর, নিঃস্ব ও অসহায় হয়-তা সহজেই অনুমেয়। মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে ডুক্‌রে কাঁদতে হয় মাকে। অশ্রুতে ভেসে যায় মায়ের বুক। কষ্টে ভরা সে শূন্য বুকের অবলম্বনই এখন শুধু অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস।

এরপরও কি আর কোন প্রশ্ন করার থাকে? তবুও ভাবলাম অন্ততঃ একটা কথা মায়ের মুখ থেকে শুনতে চাইবো শহীদ রফিক সম্বন্ধে। একটি বারের মত জানতে চাইবো মায়ের চোখে শহীদ রফিক কেমন ছিলেন? মনকে অনেক বুঝিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার যে ভাবেই হোক-কথাটা বলবো শহীদ জননীকে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন দাঁড়ালাম তাঁর সামনে-প্রশ্ন করবো করবো করেও তখনও পারলাম না কিছু জিজ্ঞেস করতে মায়ের মুখের দিকে তাঁকিয়ে। মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হলো শেষ পর্যন্ত।

বিদায় বেলায় শহীদের মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু বলেছিলাম-"শহীদ রফিক আপনার চোখে কেমন তা আমি জানি। শুধু দোয়া করবেন আমরা যেন তার মতো হতে পারি।

www.pathagar.com

চলে গেলেন সোনার মানুষ

মোঃ কামারুল আলম
ইংরেজী বিভাগ

রফিক ভাই খুব কাছ থেকে চেনাজানা একজন জান্নাতী মানুষ। নিষ্ঠুর পৃথিবীর নির্বাক পাশবিকতার মাঝে যারা আল-কোরআনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন তাদেরই একজন। ফজরের নামাজের আযান হলে আমায় মাথায় কে যেন হাল্কা পরশ বুলিয়ে দিত। বুঝতে বাকী থাকত না এটা জান্নাতী ছোয়া। একজন আল্লাহর কাছের লোকের আল্লাহর জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। চোখ মেলে দেখতাম ফিনকি দিয়ে হাসি ছাড়িয়ে রফিক ভাই দাঁড়িয়ে। আমি নামাজ না পড়লেও ভাবতাম একজন নামাজীর ছোঁয়ায় এত শান্তি হলে নামাজে না জানি কত শান্তি। অবশেষে নামাজ ধরে ফেললাম। হ্যাঁ, রফিক ভায়ের জন্য নামাজ পড়া শিখতে পেরেছি। আমার দেখা অনেক মানুষের মাঝে তিনিও একজন যিনি নামাজে অত্যন্ত যত্নশীল এবং মনোযোগী ছিলেন। আমাকে সাথে নিয়ে তিনি অনেক রাত নামাজ পড়েছেন। প্রত্যেক দিন রাত্রে নামাজের শেষে কিসের সৌরভ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। তখন বুঝতাম না। কিন্তু এখন যখন বুঁঝি তখন আর সৌরভ পায় না। সারাটা দিন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে রাত্রে একাধারে ঘন্টার পরে ঘন্টা জায়নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর নামাজ সহ অন্যান্য কাজ কর্ম দেখলে আমার কেন জানি সাহাবীদের কথা মনে হত। (আমি সাহাবীদের সাথে তুলনা করছি না)। এর চেয়েও কঠিন কাজ তাঁর দিয়ে সম্ভব কারণ রসুল (সঃ) যে পথ

www.pathagar.com

দেখিয়ে গেছেন তিনি তো সেই আদর্শে গড়া সংগঠনের প্রতিকৃতি। কোরআন হাদিসের আলোকে গড়া ইসলামী ছাত্রশিবিরের ছায়াতলে এসেই রফিক ভাই আল্লাহর এত কাছের মানুষ হতে পেরেছেন। আজ রফিক ভাই নেই। চলে গেছে অনেক দূরে, যে পথে সবাই যায়। তবে তিনি শহীদ হয়ে যে পথে গেছেন সে পথে যেতে পারে তারাই যারা ইসলামকে ভালবেসে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন দিতে পারে অকাতরে। তবু তিনি বেঁচে আছেন তাঁর কর্মে, চেতনায়, রফিক, ভাইদের জন্যই তো আল্লাহ বলেছেনঃ "কোরআনের পথে যারা জীবন দিল তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝিতেছ না।"

www.pathagar.com

ফিরে এলো ৮ই জুন

কাজী মাহবুবা আক্তারী

শহীদ রফিক একটি নাম। একটি আদর্শ, একটি তাজাসদ্য ফোটা গোলাপ। এ গোলাপ ফুলদানীতে সাজিয়ে শোভা বাড়ানোর জন্য ফুটে নাই ফুটে ছিল ঝরে যাওয়ার জন্য, তাই সে অবেলাতেই ঝরে গেল। কি লিখব আমি, সামান্য কয়েক লেখনীর মধ্য দিয়ে যে শেষ করতে পারব না ঝরে যাওয়া এ গোলাপের কাহিনী। সবটুকু লিখতে না পারলেও কিছু কথা, কিছু স্মৃতি আমি তুলে ধরব আমার লেখার মাধ্যমে।

ইসলামী আন্দোলন করতে যেয়ে অনেকের সাথে হয়েছে ঘনিষ্টতা, হয়েছে এক নিবিড় মধুর সম্পর্ক। সেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই দ্বীনি ভায়েরা আমাকে ডাকতো আপা বলে। কদাচিৎ হয়তো কেউ এসে না জেনে ভাবী ডেকে বসতো, মৃদু প্রতিবাদ করে বলেছি আমি ভাবী নই। আমি আপা। সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় সভাপাতি আঃ হাই ভাই, ইউনুচ ভাই, আছাদুজ্জামান ভাই, নজরুল ভাই প্রতি নিয়ত আমার বাড়ীতে আসা যাওয়া করতেন। আমার ছেলেরা তখন ছোট কতই বা বয়স তাদের প্রাইমারী স্কুলও পার হয়নি, দ্বীনি ভাইদের সাহচর্যে থেকেও তাদের আদর স্নেহে ধীরে ধীরে এই মাসুম বান্দারাও বুঝে নিল ইসলামী আন্দোলন কাকে বলে। দায়িত্বশীল ভাইদেরকে ওরা ডাকতো মামা বলে। দায়িত্বশীল ভাইদের সহমর্মিতা বেশী করে উপলব্ধি করেছিলাম ১৯৯৩ সালে। তৎকালীন বিএনপি সরকার সন্ত্রাস দমন আইনে ওদের আব্বুকে সাত মাস

www.pathagar.com

কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিল। দ্বীনি ভায়েরা আমাকে ঠিক বোনের মর্যাদা দিয়েই সর্বক্ষণ খোঁজ খবর রাখতো আর এই সুত্র ধরেই শহীদ রফিক আমাকে ডেকেছিল আপা বলে। প্রায়ই আসতো, যখন তখন আসতো আমার পুত্রদ্বয়ের সাথে। এরই মাঝে আমার বড় পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো আসা যাওয়া আরও বেড়ে গেল। এসেই বলতো আমার আপা কোথায়, আমি সাড়া দিলে বলত আপা খুব ক্ষিধে পেয়েছে আমার। যা আছে তাই দিন। সাধারণতও যা থাকতো তাই পরম তৃপ্তি ভরে খেতো। বলত ডাইনিং এর ভাত তরকারী মুখে দিতে পারিনা, আপনার কাছে এসে খেলে মনে হয় আম্মার হাতে খাচ্ছি। দেখতাম খুব তৃপ্তি সহকারে খাবার মুখে দিচ্ছে। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে আমার মেঝে তনয় চমন সদস্য হওয়াতে আমাদের পরিবারের সাথে সখ্যতা আরও যেন বেড়ে গেল। আমার পরিবারের কথা, আমার সংসারের অনেক তথ্য জানতে চাইতো। আমি হেঁসে বলতাম ছোট মানুষের এখনো সংসারের সব তথ্য জানতে হয়না। অনেক সময় সামান্য অভিমান করে বলত আমিতো আর আপন ভাই নই যে আমাকে বলবেন। এমনি কত কথা যা বলতে পারা যায় না। আমার রান্না খুব পছন্দ করত, বলত আপা আপনার কাছে এলে আম্মার কথা মনে হয়, মায়ের স্বাদ পাই। বলতাম বেশতো আসবে। জীবনের শেষ দিনটিতেও সে আমারই হাতে শেষ খাওয়া খেয়ে গেল, ভুলতে পারিনাই আজো সে ঘটনা। সে স্মৃতি সেই মধুর হাঁসিটি।

৮ই জুন ২০০১, সকাল সাতটা হবে। ঘরেই ছিলাম, বাইরে মটর সাইকেলের শব্দ শুনলাম। মনটা ছিল অশান্ত ও চিন্তাযুক্ত, গতকাল ৭ই জুন সামান্য একটু গন্ডোগোলের কথা শুনেছিলাম-জাসদ ছাত্র লীগের ছেলেদের সাথে। আমার ছেলেরা রাত্রে কেউ বাড়ী ফিরে নাই। তাই গাড়ীর শব্দ শুনে দ্রুত বাইরের ঘরে এলাম। দেখি আমার মেঝো ছেলে চমন ও রফিক এসেছে। আমাকে দেখেই সেই চিরাচরিত নিয়মে একগাল হাঁসি দিয়ে সালাম জানালো, উত্তর দিয়ে বললাম কেমন আছো. বললো ভালই তো আছি, কৃত্রিম রাগ করে বল্লাম তোমরাতো ভালই থাকো, আর এ দিকে আমি তোমাদের জন্য ভেবে মরি। অথচ তোমরা আমার চিন্তার কোন মূল্যই দিতে চাওনা। হেঁসে ফেললো। বললাম নাস্তা কর. বললো কামাল মেসে খিচুরি রান্না হচ্ছে ওখানেই নাস্তা করব। দ্বিতীয়বার বলাতে বলল কি খাওয়াবেন বললাম গ্রামবাংলা মহিলা আমি গ্রামীন নাস্তা করাবো চিড়া দুধ আর পাকা আম। আমার কথা শুনে এক প্রকার লাফিয়ে উঠলো, বলল, আপা আমি খাবো আম আমার খুব প্রিয়। ওরা খাচ্ছে আমি তাকিয়ে দেখছি ওদের খাওয়া তিনটা আম-চমন বলছে দুষ্টামী করে আমি ২টা খাবো, রফিক বলছে আমি ২টা খাবো। শেষমেষ রফিকের জয় হলো- বলছিল খুব কাজ মেসে জুম্মাবাদ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মিটিং আছে-একটু চিন্তিত মনে হচ্ছিল। এক সময় দেখলাম দুধের ভিতর হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বললাম কি হল ভাই-বলল আপা আমার এমন লাগছে কেন-খাবার গলায় আটকে যাচ্ছে। বললাম চিন্তা করছতো পরিস্থিতি নিয়ে। আর দুধে হয়তো মিষ্টি

www.pathagar.com

কম হয়েছে চিনি নাও। চিনি ঢেলে দিলাম, বলল খেতে পারছিনা-আমি বললাম মায়ের কথা মনে পড়ছে বুঝি। বলল না আগামীকাল (৯ই জুন) বাড়ী যাচ্ছি। তার পর খাওয়া শেষ করে বিদায় নিল। বলল আপা যাই, বললাম যাই বলতে হয়না, বলো আসি। রফিক ও চমন মটর সাইকেলে উঠলো, এগিয়ে এসে বললাম, রফিক আবার এসো। ও বলেই ফেললো আর তো আসা হবেনা, কাল বাড়ী যাচ্ছি তো। গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে একটু মুচকী হাসলো। গাড়ী ঝড়ের বেড়ে উড়ে গেল। আমি ওদের গমন পথের দিকে অবাক নেত্রে চেয়ে আছিতো আছিই। রফিকের ঔ মুচকী হাঁসিটা আমার হৃদয়ের গভীরে কেন যেন ধাক্কা দিল একটা। মনে হল বহুদুর, দুরের ঐ নিলিমার মাঝ থেকে ছোট্ট একটা তারকা মিট মিট করছে। ছোট ছেলের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম আম্মু ভিতরে আসেন। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। যদিও বর্ষার সময়, কিন্তু সেদিন বৃষ্টি হয়নি। রোদের তেজ একটু কম পড়ায় বারান্দায় মাদুর বিছায়ে চোখ দুটি বন্ধ করে আধ সোয়া মত শুয়ে আছি। নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে। জুম্মার পর তো সমঝোতা বৈঠক আছে কি হল ইত্যাদি ভাবছি। হঠাৎ কানে গেল কে যেন বলছে কামাল মেসে গুলি বিদ্ধ হয়েছে একটা ছাত্র ভাই। মাথায় গুলি লেগেছে ঝিনাইদহে নিয়ে গেল। কথাটা কানে যেতেই ধড়পড় করে উঠে বসলাম। কথা বলতে পারছিনা। হাফাচ্ছি। কোনমতে উঠে বাইরে এসে সিড়ির উপর বসে পড়লাম। বললাম অতি কষ্টে, কার কি হয়েছে। একজন এগিয়ে এসে বলল সদস্য রফিকের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে হায়েনারা। বুকের মধ্যে তীব্র ভাবে মোচড় দিয়ে উঠলো। আর্তনাদ করে উঠলাম। বাড়ীর সকলের কাছে আকুতী জানালাম তোমরা সবাই রফিকের জন্য দোয়া করবে। ও যেন বেঁচে থাকে। নামাজান্তে অনেক কাঁদলাম আল্লাহ রাব্বুলামীনের দরবারে। যখন দোয়া করছিলাম তখনও আমি জানিনা যে রফিক জান্নাতের পাখী হয়ে গিয়েছে। সারা রাত কেঁদেছি রফিক কেমন আছে এ পর্যন্ত খবর পাইনি। কোনো মতে রাত টা পার করেই ভোরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঝিনেদার উদ্দেশ্যে। হাসপাতালে যাবো ওকে দেখতে। সমস্ত পথ শুধু আল্লাহকে ডাকছি। ওকে যেন সুস্থ দেখি। রিক্সাযোগে হাসপাতালে যাচ্ছি, পথেই মাইকিং হচ্ছে-আমাদের প্রাণ প্রিয় রফিক ভাই দুর্বৃত্ত জাসদ ছাত্রলীগের হায়েনাদের নির্মম আঘাতে শাহাদাত বরন করেছে। রিকশার মধ্যেই ঢলে পড়লাম। আমার আর এক দ্বীনি বোন আমাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে আছেন। রিকশা আলহেরার দিকে যাচ্ছিল চৌরাস্তার মোড়ে আসলেই দেখলাম-শববাহী মিছিল ধীরে ধীরে আসছে। সামনে কফিনের ভ্যান-হায়রে জীবন ২৪ ঘন্টাও হয়নি-আমার সাথে তরতাজা রফিক কথা বলে আসলো। আর সে এখন শুধু কফিনে ভরা লাশ। সবাই সমবেত হলেন অগ্রণী চত্বর। জানাজা শেষে সবাইকে দেখানো হচ্ছে রফিককে। দ্বীনি বোনটি আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন রফিককে শেষ বারের মতো এক নজর দেখার জন্য। কফিনের কাছে গেলাম। দেখলাম একটা তরতাজা গোলাপকে জোর করে তুলে পিশিয়ে ফেলা হয়েছে। ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে

www.pathagar.com

শিশিরের অভাবে। সাদা কাপড় রক্তে ভিজে থোকা থোকা লাল গোলাপের মত দেখাচ্ছে। আমাকে সেখান থেকে ধরে সরিয়ে নিয়ে এল। বলে ফেললাম ঝরেই যখন যাবে তবে ফুটে ছিলে কেন? এক সময় ওকে নিয়ে শববাহী মাইক্রো ওর মায়ের কাছে চলে গেল। রফিক চলে গিয়েছে আজ একবছর আগে। আজো ওর কথা মনে উঠলে বুকের মাঝে তীব্রভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে। আবার আসছে আমাদের মাঝে ৮ই জুন। যতদিন থাকব এ ধরা ধামে ৮ই জুন ফিরে আসবে কিন্তু রফিক কি আর জান্নাতের পাখী হয়ে আমাদের মাঝে আসবে? জানি আসবে না ওযে সবুজ পাখী।

www.pathagar.com

এটা কি মগের মুল্লুক?

আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের

দিন যায় দিন যায় দিন যায় চলে
কত কথা মনে পড়ে বেদনার ছলে।

"এটা কি মগের মুল্লুক?" এটা হল শহীদ রফিক ভাইয়ের একটি আপোষহীন বাণী। শহীদ রফিক ভাইয়ের কথা চিন্তা করলে কথাটি আমার স্মৃতিপটে দারুনভাবে রেখাপাত করে। ১৯৯৭ সাল, হাজী শরীয়তুল্লাহ এতিমখানায় এস.এস.সি ও দাখিল ফলপ্রার্থীদের নিয়ে শিক্ষা শিবির (টি.সি) চলছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তৎকালীন সভাপতি জনাব আসাদুজ্জামান ভাই টি.সি'র পরিচালক। চুয়াডাঙ্গা জেলার তৎকালিন সভাপতি আসাদ ভাই শৃংখলা বিভাগের পরিচালক। শহীদ রফিক ভাই ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান সেক্রেটারী মোঃ জিল্লুর রহমান ভাই শৃংখলা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। আমি সাথী Contact এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ভাইয়ের সাথে Contact হবে। ইতিমধ্যে শহীদ রফিক ভাইয়ের সাথে পরিচয়। আকাশের সূর্যটা সারাদিন Journey করে ক্লান্ত হয়ে গোধূলীলগ্নে পশ্চিম আকাশে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরেই গোটাপৃথিবীকে অন্ধকারে গ্রাস করে নিল। সূর্য মামাকে আর খুজে পাওয়া গেলনা। পৃথিবীটাকে মনে হচ্ছিল as like কবর। একটু পরেই অন্ধকারের বুক চিরে চাঁদিমার আলো সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে দিল। জোস্নার আলোতে খোলা আকাশের নিচে বসলো গল্পের আসর। আসরের মধ্যমনি রফিক ভাই।

www.pathagar.com

গভীর রাত পর্যন্ত রফিক ভাই সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। রাতের বাকী অংশটা আমরা একটা মাদুর বিছিয়ে কাটালাম। আর রফিক ভাই ছোট্ট একটা বেঞ্চির উপর ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে রফিক ভাই টি.সি ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পাসে যাবেন। চৌড়হাস থেকে ক্যাম্পাসের গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ীতে উঠে একজন ছাত্র ভাইকে একটা ছাত্রীর সাথে অশালীন আচরণ করতে দেখলেন। রফিক ভাই তাদেরকে বললেন- "এটা কি মগের মুল্লুক?" যে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের Code of Condact ভঙ্গ করে চলাফেরা করবে? এরপর থেকেগাড়ীতে অনেকদিন কাউকে অশালীন আচরণ করতে দেখা যায়নি। এভাবে শহীদ রফিক ছিলেন সদাসর্বদা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন।

১৯৯৯ সালের আগস্টে শহীদ রফিক ভাইয়ের সাথেসদস্য ভাইদের শিক্ষা শিবিরে ঢাকার আল-ফালাহ মিলনায়তনে আবার দেখা। তার সদা হাস্যজ্জ্বল চেহারা দেখেই আমি চিনতেপারলাম উনি রফিক ভাই। শিক্ষা শিবিরের দ্বিতীয় দিনে ডঃ আকরামুজ্জামান স্যার শিক্ষা কার্যক্রম Programme পরিচালনা করছেন। ইংরেজীতে সবাইকে বক্তৃতা করতে হবে। এক এক করে শহীদ রফিক ভাইয়ের পালা আসল। রফিক ভাই তার বক্তৃতা দিয়ে সকলের মুখে হাসির ফল্গুঝরা প্রবাহিত করে দিলেন। এরপর শুরু হল Group Discussion। রফিক ভাই চুয়াডাঙ্গা সভাপতি আঃ সাত্তার ভাই আমরা তিনজনে একটি Group সকল কথাবার্তা সবাইকে ইংরেজিতে বলতে হচ্ছে। আমার দূর্বল ইংরেজী দিয়ে রফিক ভাইয়ের সকল অবস্থা জানা সম্ভব হলনা। এজন্য মাতৃ ভাষায় রফিক ভাইয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। এদিকে শিক্ষাকার্যক্রম সম্পাদক জনাব মবিনুল ইসলাম ভাই ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং সতর্ক করে দিচ্ছেন যাতে বাংলায় কেউ কথা না বলে। এভাবে টি.সি শেষ করে অনেক রাতে চলে আসলাম চুয়াডাঙ্গায়।

অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। রফিক ভাইয়ের কোন খোজ-খবর জানিনা। কোথায় থাকেন, কোন বিভাগে পড়েন তাও মনে নেই। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হতে এসে রফিক ভাইয়ের সাথে আবার দেখা। ভর্তির নিয়মাবলী সবকিছু রফিক ভাই বলে দিলেন। সাথে নিয়ে বিভিন্ন অফিসে গিয়ে ভর্তির কাজ Complete করে দিলেন। এভাবে শহীদ রফিক ভাই আমার হৃদয় জয় করে নিলেন। সবখানে প্রথমেই রফিক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। পরে জানতে পারলাম রফিক ভাই ছাত্রও ছিলেন দাওয়াহ বিভাগের।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কয়েক মাস অতিবাহিত করলাম। একদিন Plan করলাম রফিক ভাইয়ের সাথে আমার কিছু ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলাপ করব। ২০০১ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ হয়ে গেলে বাড়ী চলে গেলাম। ৭ই জুন পত্রিকায় দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৮ই জুন তারিখ সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ পড়ে শুনতে পারলাম

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় রফিক নামে একজন ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। সারারাত নিদ্রাবিহীন অবস্থায় কেটে গেল। সকালে বাড়ী থেকে রওনা দিলাম।

ঝিনাইদহ, অগ্রণী চত্বরে এসে দেখলাম বিশাল শোক মিছিল। শহীদের লাশকে সামনে রেখে জানাযা পূর্ব সমাবেশে শিক্ষকরা সহ অনেক দায়িত্বশীল ভাইরা বক্তৃতা করলেন। জানাযা শেষে শহীদের লাশ একনজর দেখার জন্য অনেক মানুষের ভীড়। লাইন দিয়ে দাড়িয়ে অনেকক্ষন পরে রফিক ভাইয়ের লাশের কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম রফিক ভাই এবং শহীদ রফিক ভাইয়ের ভিতর অনেক পার্থক্য। মনে হল শহীদের লাশ মাথা থেকে পা পর্যন্ত চুমু খাই। কিন্তু সে সুযোগ আর হলনা। সেদিন শহীদ রফিক ভাইয়ের সাথীরা সবাই শপথ নিয়েছিলেন অন্যায়ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন হয়ে শহীদের রেখে যাওয়া কাজ আঞ্জাম দিবেন। তারপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অশালীন কাজ নজরে পড়লে মনে পড়ে রফিক ভাইয়ের Contribution এর কথা। মনে পড়ে "এটা কি মগের মুল্লুক?"

www.pathagar.com

শহীদ রফিক ভাই ঃ যাকে পেয়েছি অতি সহজে

মাহফুজুর রহমান রনজু
আল কুরআন বিভাগ

মনে সাধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। নির্দিষ্ট গন্ডি অতিক্রম করে সত্যিই একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। পুর্ণ হলো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রত্ব লাভ করার সাধ নতুন জায়গায় বিশেষত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অনেক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। সচেষ্ট হলাম পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায়ে নিতে।

পূর্বেই বন্দোবস্ত থাকায় সহপাঠী মাহমুদুল হাছান ভাই ও ইখতিয়ার ভাই সহ সাকসেস মেসে উঠলাম। পূর্ব পরিচিত তিন বন্ধু নতুন জায়গায় এসে একত্রে থাকতে পেরে নিজেকে খুব তৃপ্ত মনে হচ্ছিল। কেটে গেল প্রায় সাড়ে তিনটি মাস। একদিন মেসের দায়িত্বশীল জাহাঙ্গীর ভায়ের সাথে কনটাক্ট হল। এক পর্যায়ে উনি বললেন, আমরা তো সংগঠনের অধীনে। আপনি যেহেতু সাথী, সুতরাং আপনাকে সংগঠন যে কোন সময় যে কোন জায়গায় স্থানান্তর করতে পারে কি বলেন? আমি স্বীকৃতি সূচক উত্তর দিলাম।

এর ক'দিন পর ক্যাম্পাসে রফিক ভাই আমার সাথে পরিচয় করে কথা বললেন। উনি তখন মদনডাঙ্গা শাখার সভাপতি। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, আপনাকে আমার শাখা অর্থাৎ মদনডাংগায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তখন আমার ভিতর যেন তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। বয়ে চলছিল যেন কাল বৈশেখী ঝড়। কারণ পরিচিত সহপাঠীদের ছেড়ে যেতে হবে নতুন এক জায়গায়। কিন্তু সাংগঠনিক

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত এভয়েড করার প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং আমি মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে থাকলাম। তখনো আমার মদনডাঙ্গার লোকেশান সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা নেই। ভগ্ন হৃদয়ে রফিক ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম মদনডাংগার অবস্থান সম্পর্কে। উনি আমাকে মদনডাংগা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে আসা যায়। ফেল করলে নছিমনে একটাকা ভাড়া লাগে তাও বলেদিলেন। এ মেসের পজিটিভ সাইড সম্পর্কে উনি আমাকে সাধ্যমত বুঝালেন। তখন '৯৮ এর অক্টোবরের মাঝামাঝি হবে। আমি রফিক ভাইকে অনুরোধ করলাম অক্টোবর মাসটা সাকসেসে থেকে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু রফিক ভাই বললেন মদনডাংগা মেসে যারা আছে তারা বর্ডার স্বল্পতায় ভুগছে। সুতরাং আপনি আজ কালকের ভিতরে চলে আসেন। আন্তরিকতা পূর্ণ কথা আমাকে দ্রুত মদনডাংগা যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে বাধ্য করলো। এর মাঝে সংগঠনের জন্যে পেরেশান এই মুজাহিদ সাইকেল চালিয়ে সাকসেস মেসে গিয়ে মদনডাংগার সাথী বৈঠকে উপস্থিতির জন্যে আমাকে দাওয়াত দিয়ে এসেছিলেন। সেদিন তাকে বুঝিনি। কিন্তু আজ সত্যিই নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় আল্লাহর জান্নাতের মেহমান, সত্যের পথে অকুতোভয় সৈনিক রফিক ভায়ের ঐ পেরেশানীর কথা মনে করে। অক্টোবরের ১৮ তারিখ (১৯৯৮ইং) চলে এলাম মদনডাংগা মেসে। তবে আগে যতটুকু অসহায়ত্ব বোধ করছিলাম মোটেই তা থাকলোনা। কারণ এ মেসে এসে পেলাম সহপাঠী আঃ আলী শাহীন, রায়হান, সবুজ ও আরজু ভাইকে। নিজেকে তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিলাম। রফিক ভাইয়ের প্রশংসা গীতি গাইতে গেলে সেটা হবে চর্বিত চর্বন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পর ও তার কতক গুলি বিষয় এমন ভাবে হৃদয়ে নাড়া দেয় যা সত্যিই ভুলার নয়। ইসলামী আন্দোলন তথা সংগঠনকে তিনি একান্ত মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সংগঠনের জন্যে তার পেরেশানী ছিল অতুলনীয়।

আমানতদারীর ব্যাপারে তার একটি বিষয় না বলে পারছিনা। কোন একদিন রফিক ভাই মোটর সাইকেল নিয়ে মদনডাংগা আমাদের মেসে আসলেন। সম্ভবত উনি তখন ইবি শাখার সহকারী যুব ও ক্রিড়া সম্পাদক। আমি মোটর সাইকেলের সাথেই চাবিটা দেখে যথারীতিই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফেললাম। অনুমতি না নিয়ে গাড়ী চালানোর জন্যে পরে উনি আমাকে আদর মাখা ধমকানী দিলেন। সংগঠনের সেই মোটর সাইকেল এখনো সচল। কিন্তু এখন কি খেয়ানত করে ঐ গাড়ী চালালে রফিক ভাই সংগঠনের আমানতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আসবেন? না, আসবেন না। বাতিল অপশক্তি তার সেই প্রতিবাদী কণ্ঠকে চির তরে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

আমি বলছি সেই সংগঠকের কথা যেই সংগঠক হল ডাইনিং এ খাদ্য ফুরিয়ে গেলে নিজের সহকর্মীদের খাওয়ার জন্যে পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেন।

রফিক ভায়ের সর্বশেষ দায়িত্ব ছিল ইবি শাখার যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে। বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি এমন থাকতো যে দায়িত্বশীলদের কাছে না জেনে ফটোষ্ট্যাট

www.pathagar.com

কিংবা কিছু কেনাকাটার জন্যে মেইন গেইটে যাওয়া নিরাপদ ছিলনা। এ অবস্থায় একটা ক্লিয়ার কন্‌সেপশান পাওয়ার জন্যে যাকে কাছে পেতাম তিনি ছিলেন রফিক ভাই। রফিক ভাই, শত ব্যস্ততার ও টেন্‌শানের মাঝেও যাকে পেয়েছি হতাশামুক্ত ও উদ্যমী। পরিস্থিতির আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যার জুড়ি মেলা ভার।

সম্পাদকীয় দায়িত্বের পাশাপাশি রফিক ভাই আরেকটি খন্ড দায়িত্ব পালন করতেন তা হল মদনডাংগা শাখার সাথী ভাইদের আলোচনা চক্রের পরিচালনা। আমার স্পষ্ট মনে আছে রফিক ভাই একদিন চক্র পরিচালনা করে সামনের দিনের জন্যে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস সমন্বয়ে একটি পাঠ ঠিক করে দিলেন। মদনডাংগার সাথী ভাইরা সম্ভবতঃ তাদের পড়া তৈরী করে রফিক ভায়ের প্রতীক্ষায় আজো বসে আছে। কিন্তু রফিক ভাই কি আসবেন তাদের ঐ আলোচনা চক্র পরিচালনা করতে?

এইতো সেই রফিক ভাই, যিনি মদনডাংগা তথা শ্রীরামপুর এলাকার জনগণের মনের মনি কোঠায় বাস করতেন। ঝিনেদা অগ্রণী চত্বরে যার জানাযার মুহূর্তে সজল কাজল নামের দুই সহোদর রফিক কাকু রফিক কাকু ... বলে চিৎকার করছিলো! এতো সেই রফিক ভাই, যার শাহাদাতের পোষ্টার লাগানোর সময় শ্রীরাম পুরের মহিলারা কাপড়ের আঁচলে মুখ ঢেঁকে ডুকরে কেঁদে উঠছিলো! সে কান্না আমাদের কাজের গতিকে থামিয়ে দিচ্ছিলো।

এরপরও সব টুকু বেদনা তখনি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি, যখন মনে পড়ে যায় আল্লাহর ঐ মহান বানী, "আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারনা।"

www.pathagar.com

জান্নাতের পথে আলোর পথিক

মু. উসমান গনি
আল-কুরআন বিভাগ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

"জীবনের চেয়ে দীপ্তমৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি।"

নশ্বর এ পৃথিবীতে হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এ দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। সভ্যতা যখন শিহরিত, মানবতা যখন বিপন্ন, বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ইসলাম যখন তামাম পৃথিবীতে বিজয়ের আসন গেড়ে নিচ্ছে; ঠিক তখনি এ দ্বন্দের শিকার হয়ে পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতে যেতে হলো-পিতা-মাতার আদরের দুলাল, ছোট বোনদের প্রিয় ভাই, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একান্ত আপনজন, মেধাবী ছাত্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের নিস্পাপ উজ্জল একটি নক্ষত্র শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইকে। যিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভাল বাসেননি। ইসলাম ও জান্নাত ছাড়া কিছুই পছন্দ করেননি। শাহাদাৎই ছিল কাম্য যার।

যখনই সেদিনের কথা মনে হয়। আমি আমাকে ধরে রাখতে পারিনা। বেদনায় বুক দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে শুধুই অন্ধকার দেখি। ঐ মানুষটার মৃত্যুতে কার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে জানিনা। কিন্তু আমি আমারটাতো জানি। প্রিয় রফিক ভাই ছিলেন আমার সাংগঠনিক জীবনে আলোচনা চক্রের প্রথম পরিচালক, প্রথম দিন পড়া দিয়েছিলেন। আজো সেই পড়া আর নিতে পারেন নি। পারবেন না কোন দিনও।

www.pathagar.com

শ্রীরামপুর মসজিদে জুময়ার নামাজ পড়িয়ে এসে সামান্য বিশ্রামের পর উঠে দাড়িয়েছি। গ্রুপ দাওয়াতী কাজ করতে যাবো আসরের নামাজ সেরে। এমন সময় কানে একটি আওয়াজ আসল "শিবিরের রফিক ভাই মদন ডাঙ্গাতে আহত" একথাটি শুনতে না শুনতেই আরেকটি আওয়াজ তিনি শাহাদাৎ বরণ করেছেন।" আমি ভাবলাম এ অসম্ভব কিছুতেই হতে পারেনা। মনে হলো প্রচন্ড ভূমিকম্পে পৃথিবী কাঁপছে। আমি যেন হতবাক, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। এই মাত্র শোনা কথাটি। তখন আমার চোখে পানি আসেনি কিন্তু সকল চিন্তা-অনুভূতি কেমন যেন এলো মেলো হয়ে গেল। নিরব, নিস্তব্দ, নিস্তেজ হয়ে গেল আমার সমস্ত শরীর। সামনে তাকিয়ে দেখি ইয়াছিন ভাই (সাতক্ষীরার) বসে আছেন বারান্দার সিড়িতে সীমাহীন অকরুন আকাশ আর নিরব নিথর প্রকৃতির পানে তাকিয়ে।

খোলাফায়ে রাশেদার তিন খলিফাকেই প্রাণ দিতে হয়েছিল আততায়ীর হাতে এ ধরনের হত্যাকান্ডে নিহতের গৌরব এবং মর্যাদাকেই শুধুবাড়িয়ে দেয়। হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীর স্থান হয় মানুষের সীমাহীন ঘৃণা ও ইতিহাসের ডাস্টবিনে। রাজনীতি ও ইতিহাসে ব্যক্তির অবদান ও গৌরবকে রক্তপাত ঘটিয়ে হত্যাকরা যায়না। বরং সেই গৌরবের দীপ্তি ও প্রভাব আরো বেড়ে যায়। শহীদ রফিক ভাইয়ের মৃত্যু যে স্বাভাবিক হয়নি। যাকে ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তার কথা বলতে গেলে এক সাথে একঝাঁক কথা মনে পড়ে।

রফিক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়টা খুব বেশী দিনের না হলেও তার চারিত্রিক মাধুর্য আমার ঘুমান্তদ সত্ত্বাকে বিপুলভাবে জাগিয়ে তুলেছে। আসন করে নিয়েছেন আমার হৃদয়ের আঙ্গিনায়।

সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখে রতনপুর লজিংয়ে যাওয়ার দুদিন পর ১৪/৯/২০০০ তারিখে ক্যাম্পাসে এসে দাড়িয়েছি। সালাম দিয়ে উনি বললেন উসমান ভাই কেমন আছেন। সেদিন অবাক বিস্ময়ে ভেবেছিলাম অপরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম শুনে এই সুন্দর মানুষটি কে? আজ তার উত্তর আমি খুজে পাই। তিনি আমাকে বললেন আপনার লজিংয়ের ওরা খুব ভাল মানুষ। সংগঠন প্রিয় এবং সাংগঠনিক কাজে যথেষ্ঠ সহযোগীতা পাওয়া যাবে তাদের থেকে। তার সেদিনের উৎসাহ আজো রতনপুরে থাকার জন্য আমার অনুপ্রেরণা যোগায়।

৬ই রমজান ৫ই ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ রতনপুরে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন রফিক ভাই। মুস্তাফিজ ভাই (বর্তমান সভাপতি) নেসার ভাই সহ ৬ জন। আমরা মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়তে চলেছি। ঠিক সে সময় রফিক ভাই মুস্তাফিজ ভাইকে বলছিলেন আপনার সুয়েটার খুব সুন্দর' মুস্তাফিজ ভাই বলছিলেন আপনারাটা চমৎকার। দু'জনে যখন একথা বলাবলি করছেন আমি সেখানকার তৃতীয় ব্যক্তি, রফিক ভাই আমার সমর্থন পাবার জন্য বলেছিলেন উসমান ভাই বলেন তো কোনটি সুন্দর। আমি সেদিন

www.pathagar.com

বলেছিলাম দু'টি ভিন্ন সুয়েটার বটে তবে দুটিই চমৎকার। সাথে সাথেই মুস্তাফিজ ভাই (বর্তমান ইবি সভাপতি) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন Good। আর রফিক ভাই বলেছিলেন আপনি দ্রুত মান উন্নয়ন করে সদস্য হন কাজ হবে। সেই কথা আজো আমাকে পীড়া দেয়। রফিক ভাই আমাকে বললেন আর আমি এখনও সদস্য হতে পারছি না।

শহীদ রফিকুল ইসলামকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ও কিছু পয়সার বিনিময়ে যারা হত্যা করেছিল সেই পটলা, লিটন-প্রমুখ ব্যক্তির প্রতি তাদের জীবন কালেই মানুষের সমুহ ঘৃণা, অভিশাপ ও ধিককার দিন দিন বাড়বে। আর রফিক ভাইয়ের দ্বীনি ও রাজনৈতিক অবদান ও গৌরব সময়ে আরো দীপ্তমান ও আলোক প্রভ হয়ে উঠতে থাকবে। ইতিহাসে যাদের স্থান উৎকীর্ণ হয়ে আছে সেই হাসানুল বান্না, সায়্যেদ কুতুব, তারিক, তীতুমীর কেউ পারেনি তাদের অবদানকে ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় হতে মুছে দিতে।

২৪/০২/২০০১ শনিবার। একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জমজমাট মেলা চলছে আমি বিভিন্ন স্টল দেখে ইবির কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে জোহরের নামাজ আদায় করে অনুষদের উত্তর পাশে দাড়িয়েছি। তাকিয়ে দেখি রফিক ভাই সেই পরিচিত হাসিটি নিয়ে এগিয়ে আসছেন। আমিও এগিয়ে গিয়ে সালাম মুসাফাহা সারার পর তিনি বললেন, যশোর থেকে আপনার মেহমান এসেছে আপনাকে খুজছে। ওদেরকে এক স্টলে খুজে পেলাম। দেখা হবার পর তারা আমাকে বলল ভাই "আপনি জান্নাতি পরিবারে বসবাস করেন নাকি? আমি বললাম একথা কেন? ওরা বলল জানিনা এটা ব্যক্তির গুন নাকি ইসলামী ছাত্রশিবিরের বৈশিষ্ট্য, আমি বললাম কি ব্যাপারটা খুলে বল। মেহমানরা বলল রফিক নামের এক ভাই আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমরা যখন পরিচয় দিলাম তখন তিনি আমাদেরকে আপ্যায়ন না করে আসতে দেননি। পরে শুনেছি এই মহৎ ব্যক্তির শাহাদাৎ সংবাদ শুনে আমার ভাইটি তার চোখের পানি সংবরণ করতে পারেনি।

ঘটনার দিন যশোর থেকে এসে শেখপাড়া নেমে নছিমন যোগে মদনডাঙ্গা নামলাম। চিন্তাভাবনা কদিন বাড়িতে কাটিয়ে এলাম দায়িত্বশীল মারুফ ভাই (তৎকালিন মদনডাঙ্গার সভাপতি) এর সাথে দেখা করে শ্রীরামপুর জুময়ার নামাজ পড়িয়ে লজিংয়ে যাব। কামাল মেসের সামনে পৌছাতেই দেখি রফিকভাইয়ের এক খুনি লিটনের সাথে দাড়িয়ে তিনি কথা বলছেন। আমি সালাম দিলাম রফিক ভাই সালামের জবাব দিয়ে মুসাহাফার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর বললেন, শুনলাম ইয়াছিন ভাই রতনপুর আছে আগামি কাল বাড়ি যাবে। বিকালে আমার সাথে দেখা করতে বলবেন, আমি মেসেই থাকব। এটাই ছিল আমার প্রতি রফিক ভাইয়ের সর্বশেষ নির্দেশ এবং আমার সাথে শেষ কথা।

www.pathagar.com

রতনপুর পৌঁছেই ইয়াছিন ভাইকে সংবাদটি দিয়ে নিজেকে এগিয়ে দিলাম বিছানার উপর। বিকালে সংবাদটি শুনার পর ছুটলাম মদনডাঙ্গার উদ্দেশ্যে; কোথায় ফেলে মারা হয়েছে আমার প্রিয় ভাইকে তা দেখার জন্য। সন্ধ্যায় ফিরে এলাম, রাত্রে ভাদালিয়ার সাথী শাহ আলম' ভাইকে সাথে নিয়ে এলেন ঈমামুদ্দীন ভাই তখন বাধভাঙ্গা স্রোতের মত কান্নার জোওয়ার লক্ষ্য করেছিলাম রতনপুরের মানুষের চোখে। ঘাতকদের মনে রাখা উচিৎ রফিক ভাইয়ের হত্যাকান্ড বাংলাদেশের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নতুন সংকল্পে স্থির করেছে। নবতর শপথে অটল ও দৃঢ় করেছে। ইতিহাসে তার স্থান বিরল, বরেণ্য সংখ্যক মহাপুরুষের পর্যায়ে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অনেকের সৌভাগ্য ক্ষণকালের এই মহাপুরুষের কালে জন্ম নিতে পেরেছিল।

৯ জুন ২০০১ শাহাদাতের পরদিন সকালে কোনভাবেই এখানে থাকতে পারছিনা। ইমামুদ্দীন ভাইকে নিয়ে ঝিনেদার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। অগ্রণী চত্তরে পৌঁছেই দেখি বেদনার্ত, শোকাহত, মানুষের ঢল নেমেছে প্রিয় শহীদের জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য। জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন অবিসংবাদিত ছাত্রনেতা কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মু. নজরুল ইসলাম ভাই।

জানাযার পর শেষবারের মত শহীদকে দেখার ইচ্ছা সকলের। তাই মানুষ প্রতিযোগীতায় নেমেছে কে আগে দেখবে। লাইন ধরে সকলে এগিয়ে যাচ্ছে। আমিও লাইনের মাঝে প্রিয় দ্বীনি ভাইকে শেষ বারের মত দেখার জন্যে। যখন শহীদ রফিক ভাইকে দেখলাম তখন মনে হলো ঝড়ে বিধ্বস্থ অথচ বৃষ্টিস্নাত একটি ফুল, সারাটা মুখ জুড়ে তার অসীম তৃপ্তির ছোয়া। ইচ্ছে হলো বলি রফিক ভাই আমি রতনপুর পৌঁছেই ইয়াছিন ভাইকে আপনার সংবাদ পৌছে দিয়েছি। আপনি কি আকাংখীত কথাগুলো বলতে পেরেছেন তার সাথে। এমন সময় দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর দুটি ধারা। নিজেকে শান্তনা দিলাম এই ভেবে যে, কাঁদলে চলবেনা। জান্নাতের পথে আলোর পথিক যাবার বেলায় রেখে গেছেন অনেক দায়িত্ব। তার রেখে যাওয়া দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়াই বর্তমান সময়ের দাবি।

www.pathagar.com

ব্যাথাতুর স্মৃতি

ওবায়দুল্লাহ (রাসেল)
দাওয়াহ বিভাগ

কত কথা হলো, কতোবার দেখলাম তোমার প্রশস্ত ললাট
কই? কখনও তো এতটুকু বুঝিনি,
সাগর গভীর চোখে একবারও খুজিনি,
তোমার সুপ্ত শপথ বিদ্রোহী হয়ে খুলবে আকাশ কপাট।

কলম হাতে কি লিখব? অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর। তারপরও হাহাকার এ হৃদয়ে কিঞ্চিত প্রশান্তি পেতে কলমের ভাষায় কিছু লিখছি।

মুমিনের নিকট ঈমানের অপরিহার্য দাবী শাহাদাত। সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন সংঘাত, কল্যাণ ও অকল্যাণের রশি টানাটানি সর্বত্রই। একজন মুমিনের সমগ্র জীবনের প্রকাশ ও জীবনাচার হবে শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত। ঠিক এই তামান্না ছিল শহীদ রফিকুল ইসলামের। বেশ কিছু পূর্ব থেকে রফিক ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। ১৯৯৩ সালে যশোর জেলার শার্শা থানার বাগআঁচড়া মাদ্রাসায় সাংগঠনিক একটি প্রোগ্রামে সর্বপ্রথম পরিচয় হয়। পরিচয়ের পর হতে তিনি একদিকে আমার দ্বীনি ভাই অন্যদিকে একই জেলায় দুজনের বাড়ী হওয়ায় পরিচয়টা আরও মজবুত হয়। পরিচয়ের পর অনেকবার তার সাথে দেখা ও সাংগঠনিক কাজে বহুবার মিলিত হয়েছি। পরিচয়ের পর থেকে তার মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চঞ্চলতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। ১৯৯৯ সাল আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমূহ বন্ধ থাকায় আমি সহ আরও

www.pathagar.com

অনেক পরীক্ষার্থীদের মদন ডাঙ্গা মেসে ও পাশে মসজিদে অবস্থান করতে হয়েছিল। সেখানে রফিক ভাইয়ের সাথে দেখা হল। দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়ায় সালাম দিয়ে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সার্বিক কুশলাদি বিনিময় করলেন। মেসে আমার লেখাপড়া ও খাওয়ার অসুবিধা হবে ভেবে তিনি আমাকে তার এক পরিচিত বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। এভাবে হৃদয় উজাড় করে তার সহযোগিতার ফলে আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর তার নিজের ভাই ভেবেই আমাকে রাখলেন। তিনি অনেক সময় আমাকে তার বেডের উপর ঘুমাতে বলে নিজে বিছানা পেতে নীচে ঘুমাত। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। রুম ঝাড় দেওয়া থেকে শুরু করে জামা কাপড় পরিষ্কার করা সবকিছুই নিজ হাতে সমাধা করতেন। সাংগঠনিক কঠোর পরিশ্রম ও রুমের নিজস্ব পরিশ্রম সবটাতে তিনি ছিলেন খুবই অগ্রগামী। রফিক ভাইয়ের রুমের সামনে সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ রেখেছিলেন। ফুলকে তিনি ভালবাসতেন তাই প্রতিদিন ফুলগাছে তারপানি দেওয়া, পরিচর্যা করা নিত্যদিনের কাজের একটি অংশ ছিল। আজ তার ফুলগাছ গুলো যেন বলছে যে আমাদের রফিক কোথায় যিনি আমাদের পানি খাওয়াতো ও যত্ন করতো? হাঁ রফিক ভাইও একটি ফুল তাই সে জান্নাতে ফুলের বাগানে চলে গিয়েছেন।

রফিক ভাইয়ের শাহাদাতের মাত্র ৩ মাস পূর্বের একটি ঘটনা আমার হৃদয়ে দারুনভাবে রেখাপাত করে। যে ঘটনা আমার এ জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তখন আমার ২য় বর্ষের পরীক্ষা চলছে। আমি রুমে লেখা পড়ায় রত আছি। রফিক ভাই তার পড়ার টেবিল ঠিক করছেন। কিছু সময় পর আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কত তারিখে পরীক্ষা। আমার পরীক্ষা ৩দিন পর জানতে পেরে তিনি বললেন– "আমি কিছু ছবি তুলেছি তুমি দেখবে? বলেই তিনি কিছু ছবি আমার হাতে দিলেন। ছবি দেখতে দেখতে কিছু ছবি আমার ভাবনার জগতে নিয়ে গেল। সাদা পোশাকে ছবি উঠেছেন মনে হল বেহেশত হতে এ ধরায় নেমে এসেছে। আমার সেদিন ছবিগুলো দেখে এ চিন্তা নাড়া দিয়েছিল, যে মানুষ এত সুন্দর করে ছবি উঠে সে হয়তবা আল্লাহর দ্বীনের জন্য শহীদ হতে পারে। আবার চিন্তা হল না! এটা কখনো হতে পারে না। তারপর আমি চিন্তিত মনে রফিক ভাইকে প্রশ্ন করলাম যে রফিক ভাই এত গুলো ছবি আপনি তুললেন কেন? আর এত সুন্দর ছবি আপনি কিভাবে তুললেন? তিনি হেসে উঠে বললেন আমার পড়াশুনা শেষের পথে তাই কিছু ছবি বাড়ীতে মায়ের কাছে ও কিছু ভার্সিটিতে থাকবে। সত্যিই তার পড়াশুনা শেষ হলো তিনি তার মায়ের কাছে ছবি পাঠাতে পারেন নি। পাঠিয়েছেন তার রক্তমাখা লাশ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন সাথে শাহাদাত নামক মূল্যবান একটি সার্টিফিকেট নিয়ে গেছেন।

শহীদ রফিক ভাইয়ের বেড আমার বেড পাশাপাশি ছিল। ফ্যানের বাতাস আমার বেডের উপর বেশী পড়ত। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন শেষে রুমে ফিরে ঘর্মাক্ত দেহে

www.pathagar.com

আমার বেডের উপর কিছু সময় কাত হয়ে শয়ন করিতেন। মাঝে মাঝে রুমমেট মামুন ভাইয়ের সাথে রসিকতা করতো।

একদিন আমার পিতা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসলেন। আমি রুমে ছিলাম না। রফিক ভাই আমার পিতাকে নিজের টাকা দিয়ে খাওয়ালেন এবং রুমে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। আমি রুমে ফিরে রফিক ভাইকে তার টাকা দিতে গেলাম তিনি বললেন থাকরে পাগল দিতে হবে না। আমার পিতা আসলেও তো আমাকে খাওয়াতে হতো। যেন আমার পিতাকে সে নিজের পিতা ভেবে খেদমত করলেন। তার এই খেদমত ও ত্যাগ আল্লাহপাক কবুল করেছেন। এভাবে শহীদ রফিকের জীবন আলোচনা করলে লিখে শেষ করা স্তব নয়। আমি তার রুমমেট হিসাবে আমার সাথে তার যে স্মৃতি বিজড়িত হয়েছে তা শরীরের প্রতিটি পাজরে ঘোরাফেরা করতে থাকবে। যে স্মৃতি তার সাথীদের মাঝে প্রেরণার উৎস হয়ে এ আন্দোলনে কাজ করবে। রফিক ভাইয়ের আশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করবে। বাতিল শক্তির সাথে তার শত্রুতা কিসের? কি অপরাধ ছিল তার? তার একটি মাত্র অপরাধ ছিল তা হল– "পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি তিনি পরিপূর্ণভাবে ঈমান এনেছিলেন।" (সুরা বুরুজ)

রফিক ভাইয়ের বাসনা ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা। তার স্বপ্ন ছিল অন্ধকার সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানো। তাইতো তিনি দিন রাত দ্বীনের কাজে পাগলপারা হয়ে ছুটে বেড়াতেন। শহীদ রফিক শাহাদাত বরণ করেছেন কিন্তু হাজারো রফিক এই কাফেলায় অংশ নিয়েছে। অসত্যের দাপট ক্ষণস্থায়ী আর সত্যের দাপট চিরস্থায়ী। আজ রফিক ভাই আমাদের মাঝে নাই। তার কাজ ও ইসলামের মহান দায়িত্ব আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। তার শরীর ও মাথা থেকে যে রক্ত ঝরেছে সেই রক্ত যেন আমাদের ডেকে বলছে- "এই ক্যাম্পাস ও ময়দানকে তোমরা অবহেলায় বাতিলের হাতে তুলে দিওনা। তোমরা আমার মত রক্ত দিয়ে হলেও কালেমার পতাকাকে উড্ডীন রাখবে।" শহীদ রফিকের রক্তে যেন এদেশে একদিন কলেমার পতাকা পত পত করে উড়তে থাকে এ কামনা করি মহান আল্লাহর কাছে।

লেখক ঃ শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের রুমমেট।

www.pathagar.com

বলা হলনা শেষ কথাটি

মুহাঃ সাইফুল্লাহ আল মামুন
দাওয়াহ বিভাগ

যুগে যুগে মহান আল্লাহ তায়ালা অনেক সুন্দর সুন্দর মানুষ দ্বারা এ পৃথিবীকে সাজিয়েছেন। তেমনি তিনি যখন যাকে ইচ্ছা তাকে আবার নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তেমনই একজন সুন্দর মানুষ ছিলেন আমার প্রিয় রফিক ভাই। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে ঘাতকের নির্মম ছোবলের মাধ্যমে তুলে নিয়ে আমাদেরকে প্রিয়জন হারা শোকের সাগরে ভাসিয়ে রেখে গেলেন।

শহীদ রফিক ভায়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত ভাবে খুব বেশী পরিচয় ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন সিনিয়র ভাই এবং তিনি হলে অবস্থান করতেন, আর আমি ঝিনাইদহে মেসে থাকতাম তবে তার সাথে দ্বীনি ভাই হিসেবে সাংগঠনিক পরিচয় ছিল। তার শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে আমি হলে সিট নিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে রব্বুল আলামীনের মনোনীত বান্দা আমার প্রিয় ভাই রফিকের সাথে আমার বেশী দিন থাকার সুযোগ হল না। তিনি পাড়ি জমালেন পরপারে এরই মধ্যে তার সাথে যতটুকু মেশার সুযোগ হয়েছিল তার ভিতরে তিনি দু একটি স্মৃতি আমার জন্যে রেখে গেছেন, (স্বল্প পরিসরে আমি সেগুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করছি) রফিক ভায়ের মাষ্টার্স ১ম সেমিষ্টার পরীক্ষার ১ম দিন তিনি যখন হল থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছিলেন, হলের বেলকনিতে দাড়িয়ে রাণা ভাই, মিঠু ভাই সহ আরো অনেক ভাই তখন রফিক ভাই ভালভাবে পরীক্ষা দিবেন, রফিক ভাই প্রশ্নগুলো ভালভাবে পড়ে নিবেন, রফিক ভাই সবগুলো বিষয়ে টাচ করবেন এমন সব

www.pathagar.com

ধরনের উক্তি করছিল আর হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল আর সবার প্রিয় রফিক ভাই হাত উঁচু করে হাসতে হাসতে তাদের শুভেচ্ছার উত্তর দিচ্ছিলেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম রফিক ভাই সকলের কাছে এত প্রিয় যে সবাই তাকে এভাবে বলছে। আল্লাহর প্রিয় গোলাম রফিক ভাইয়ের প্রতি সকল ছাত্রজনতারা এ ভালবাসা আমাকে আজও নাড়া দেয়। একে একে তাঁর ১ম সেমিষ্টারের ৩টি পরীক্ষা শেষ হল। ৪র্থ পরীক্ষা যেদিন তিনি শেষ করে হলে ফিরছিলেন সেদিন তাকে যেন খুব হাসিখুশি লাগছিল। তিনি যখন হলের গেটের কাছে আসলেন আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম রফিক ভাই পরীক্ষা তো প্রায় শেষ করে ফেললেন, আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যাবেন? তিনি উত্তরে বললেন হ্যাঁ আর হয়তো একমাস, আর চারটি পরীক্ষা বাকী অনেক দিন তো থাকলাম আর কতদিন থাকব তোমাদের সাথে। এমনি করে সবাইকে তো একদিন চলে যেতে হবে। সত্যি সত্যিই রফিক ভাই চলে গেলেন কিন্তু তাঁর গর্বিত পিতামাতার কাছে নয়। তিনি চলে গেলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমাদের সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে।

শাহাদাতের মাত্র ২/৩ দিন আগে, আমি হল থেকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য ব্যাগ নিয়ে ৩য় তলা থেকে কেবল মাত্র নিচে নেমেছি নেমেই রফিক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। রফিক ভাই আমাকে বললেন কোথায় যাচ্ছ, আমি বললাম ভাইয়া বাড়িতে যাচ্ছি। তিনি আমাকে বললেন বাড়িতে বেশীদিন থাকবে না তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আমি বললাম ঠিক আছে দোয়া করবেন। আমি বাড়িতে গেলাম রফিক ভাইয়ের কথা মত বাড়ি থেকে ২/৩ দিন পরেই ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কিন্তু নিয়তি আমার সাথে বৈরি আচরন করল, বাসষ্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠার পর আমাদের এলাকার এক সাংবাদিকের সাথে দেখা হল, তিনি আমাকে বললেন তোমাদের ভার্সিটিতে গন্ডগোল হয়েছে শুনেছ? আমি বললাম না। তিনি বললেন তাতে একজন শিবির নেতা মারা গেছে, আমি তখন অত্যন্ত মুষড়ে পড়লাম তার কাছে আরো তথ্য জানার চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি বেশী কিছু বলতে পারলেন না এমনকি নামটিও বলতে পারলেন না। আমি একেবারে ঝিনাইদহে চলে আসলাম, রাস্তায় কোন পত্রিকা থেকে কোন খোঁজ নেওয়ার তেমন সুযোগ পেলাম না। ঝিনাইদহের পাগলা কানাই ষ্ট্যান্ডে নেমে একটা রিক্সা নিলাম পাশে দেখলাম পরিচিত একজন ছাত্র তাকে রিক্সায় তুলে নিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম ভার্সিটিতে কে নাকি মারা গেছে সে তেমন কিছু বলতে পারলনা তখন রিক্সা ওয়ালা বলল রফিক নামক একজন লোক মারা গেছে। তখন আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, কারণ গাড়ির মধ্যে শুনলাম শিবির নেতা আর নাম শুনছি রফিক তাহলে সেই প্রিয় ভাই রফিক ছাড়া আর কেউ নয়। মেসে যেয়ে শুনলাম তার জানাযা হল মাত্র কিছুক্ষণ আগে অগ্রণী চত্বরে এবং তাকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও প্রিয় রফিক ভাইয়ের মৃত্যু মুখ খানিও দেখতে পেলাম না। মন যেন বিলাপ করছিল আর বলছিল রফিক ভাইয়ের নিস্তেজ দেহ খানি যদি একবার দেখতে পেতাম তাহলে একথাটুকু অন্তত বলতাম রফিক ভাই আপনার কথামত আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে চলে এসেছি, কিন্তু আমার শেষ কথাটি বলা হল না।

www.pathagar.com

যে কথা বার বার দোলা দেয় হৃদয়পটে

তৌফিকুল ইসলাম

ঝিনেদার আলহেরা থেকে সাইমুম ছাত্রাবাসে অবস্থান করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কেযেন বলছে করুন কণ্ঠে শহীদী সংবাদ। এগিয়ে গেলাম, আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বললেন রফিক ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন।

আমার হৃদয়মন ক্ষনিকের মধ্যেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। যেন নিথর হয়ে গেলাম আমি। অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না কিছুতেই। মনের চোখে ভেসে উঠলো একটি পবিত্র মুখ, একটি প্রাণ, একটি স্মৃতি, বিকশিত একটি প্রতিভা কিংবা ফুটন্ত একটি গোলাপ।

তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে রওয়ানা দিলাম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। রিক্সায় চড়েই ভাবছিলাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ই জুন সন্ধে সাড়ে ছয়টা ও পরদিন ৭ই জুনের ট্রাজেডির কথা। জাসদ ছাত্রলীগের কতিপয় সন্ত্রাসী সাদ্দাম হলের সামনে গাজার আড্ডা বসায়। এ দৃশ্য অবলোকন করে সাধারণ ছাত্ররা এগিয়ে প্রতিরোধ করলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতজানু কর্তৃপক্ষ এই তুচ্ছ ঘঠনাকে কেন্দ্র করে হল সমুহ বন্ধ করে দেয়। ফলে সাধারন ছাত্ররা অভিভাবকহীন অসহায় হয়ে পড়ে। হল থেকে ঝিনেদা যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি ও রফিক ভাই ভাগ্যচক্রে একই বাসে উঠি। রফিক ভাই বাসের পেছনের গেটে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করে অভিভাবকের ন্যায় আমাদেরকে আগলে নিয়ে আসছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন– "সামান্য তুচ্ছ

www.pathagar.com

ঘটনাকে কেন্দ্র করে জানি না কার শরীর থেকে রক্ত ঝরে"। তাঁর কথাটা বারবার দোলা দিচ্ছে ব্যাথাতুর হৃদয় পটে। হারিয়ে গিয়েছিলাম ভাবনার গভীরে। হঠাৎ সামনে চোখ পড়তেই দেখি হাসপাতালের পাশেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রাসেল ভাই, সেক্রেটারী মোস্তাফিজ ভাই ও জিল্লু ভাই সহ অসংখ্য লোকের সমাগম, সবাই স্তব্ধ, বাকহীন, কেউ কেউ হাউমাউ করে কাঁদছে। সে কি হৃদয় বিদারক করুন দৃশ্য। সমগ্র হাসপাতালেই যেন হাহাকার পড়ে গেছে। খোদার সৃষ্টি গাছ গাছালী গুলোও যেন বেদনায় কাতর। ওদের নীরব চাহনী যেন অভিসম্পাত করছে সমাজের নিকৃষ্ট রক্তপায়ী নরপশুদের।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম লাশ রাখার রুমে। সবার চোখে টলটলায়মান অশ্রু। আর সংযত রাখতে পারিনি নিজেকে। তপ্ত নয়নযুগল থেকে ঝরে পড়ল দু'ফোটা অশ্রু। মনে হল যেন সদ্য বৃন্তচ্যুত একটা তরতাজা গোলাপ। সেই অতি আপনজন রফিক ভাই আমাদের মাঝে নেই। পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষন। ক'দিন আগে যিনি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যাস্ত ছিলেন। আজ ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অনেক অনেক খুশি ; পৃথিবীর মায়াকাটিয়ে তিনি অনেক উপরে উঠে গেছেন। সেই খুশির ছোঁয়া তার দুই ঠোটে। সারা মুখ জুড়ে যেন পরম তৃপ্তির ছোয়া, রক্ত ও জমাট হয়নি। নিজেকে প্রশ্ন করলাম এটাতো শহীদের রক্ত? কারণ শহীদের রক্ত কখনও জমাট বাধেনা।

ভাবতে অবাক লাগছে এই মহান প্রতিভা আজ আমাদের মাঝে নেই। আমি এবং তিনি ২০৮ ও ২১১নং রুমে পাশাপাশি থাকার কারণে এবং একই বিভাগের ছাত্র হওয়ার ফলে তাঁর সাথে মিশার সুযোগ হয়েছিল। আমি আশ্চর্য হতাম তখন, যখন আমি জুনিয়র হওয়া সত্বেও আমি সালাম দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার পূর্বেই তিনি বুঝতে পেরে দুর থেকে সালাম দিয়ে দিতেন। আমি আরও আশ্চর্য হলাম সেদিন যেদিন তিনি জিয়া হল গেষ্ট রুমে কর্মী বৈঠকেমেহমান হিসাবে হেদায়েতী বক্তব্য দিয়েছিলেন। এটা বক্তৃতা নয় যেন কবিতা। যেন বহমান ঝর্ণার মধুর কলতান। তার বক্তৃতা শুনেই ঘোষনা দিয়েছিলাম সাথী হব। হয়েছি কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে তিনি নেই। তাঁর শহীদ হওয়ার কিছুদিন পরেই ২১১ অর্থাৎ তাঁর রুমেই আমাকে দেওয়া হল। আমি নিজেকে গর্ববোধ মনে করলাম একজন শহীদের স্মৃতি বিজড়িত রুমে থাকতে পেরে। বাড়ী থেকে দেয়া তার চিঠিগুলো পড়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারিনী। মনে হল তিনি মা বাবার একটি স্বপ্ন, উজ্জ্বল নক্ষত্র, এলাকার আলোকিত নয়নমনি। শহীদ রফিকুল ইসলাম যে পথে জীবন দিয়েছেন, মহান রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের সবাইকে সেপথে ..... টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমীন।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন এক নেতার নাম শহীদ রফিক

মোঃ আব্দুল আলী (শাহীন)
সম্মান শেষ বর্ষ
আল-কোরান এন্ড ইসঃ স্টাডিজ

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য এ সত্যের মুখোমুখি আমরা সবাই। মানুষ তাঁর কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের শাহাদাত যেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি নেতা কর্মীর হৃদয়ের কোনে এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করে, যেন ইসলামী আন্দোলনের জন্য শহীদ রফিকের বেঁচে থাকা উচিৎ ছিল।

শহীদ রফিক ২৭ বছরের এক টগবগে সংগ্রামী তরুণের নাম ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন এক নেতার নাম বিকশিত একটি প্রতিভা, ফুটন্ত একটি গোলাপের নাম। যা বার বার দোলা দিয়ে যায় অসংখ্য ব্যথাতুর হৃদয় পটে। শহীদ রফিক ভাইয়ের নাম মনে হলেই মনে পড়ে যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রফিক ভাইয়ের আপোষহীন নেতৃত্বের কথা।

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষে যখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলাম। তখন সংগঠনের সাথী হিসেবে জেলা সভাপতির দেয়া লিখিত সাংগঠনিক পরিচয় ই.বি., শাখায়। জমা দিলাম। ৯৮ এর সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন অনুষদ ভবনের নীচে করিডোরে রফিক ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি তখন মদনডাঙ্গা শাখার দায়িত্বশীল ছিলেন। [যেখানে রফিক ভাইকে খুনীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে] সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রফিক ভাই আমাকে বললেন "শাহীন ভাই আপনাকে আমার শাখায় চলে আসতে হবে" পরবর্তীতে তিনিই আমাকে মদনডাঙ্গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

www.pathagar.com

১ অক্টোবর ১৯৯৮ মদনডাঙ্গা শাখার সাথী হিসেবে ই.বিতে সাংগঠনিক কাজ শুরু করি এবং ই.বিতে প্রথম জোন সভাপতি হিসেবে রফিক ভাইকে পেয়ে যাই। রফিক ভাইর চেহারার বাহিরের অবয়রটা দেখলে একটু রাগী মনে হলেও ভিতরের হৃদয়টা ছিল তাঁর ভালবাসায় পরিপূর্ণ। দেখা হলেই চমৎকার একটা গাল ভরা হাসি দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে ভালবাসতেন। খোঁজ খবর নিতেন কর্মীদের সুখ দুঃখের, দ্বীনি কাজের ব্যপারে রফিক ভাই এত আন্তরিক ও আপোষহীন ছিলেন যে, তাঁর মত এরকম দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন দায়িত্বশীল আমার সাংগঠনিক জীবনে আর পাইনি। প্রত্যেকটি জনশক্তির একান্ত আপনজন ছিলেন শহীদ রফিক ভাই। হৃদয় ভরা আবেগ দিয়ে ভালবাসতেন কর্মীদেরকে। দরদ ভরা মন নিয়ে ছুটে যেতেন মির্জাপুর শাখায় অসচ্ছল পরিবারের কর্মী শামসুল ইসলামের কাছে, তাকে সহযোগীতার জন্য। উৎসাহ দেয়ার জন্য লেখা পড়ায়, রফিক ভাই সবার জন্য যেমন উদার ছিলেন আবার আন্দোলনের কাজের ব্যপারে ছিলেন আপোষহীন।

এ ব্যপারে একটি ঘটনা আমার প্রায়ই মনে পড়ে, একদিন মদনডাঙ্গা চাষী কল্যাণ মসজিদে শাখার মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক হচ্ছিল, তখনকার শেরপুর উপশাখার সভাপতি ছিলেন কাজী গোলাম মোস্তফা ভাই। উনি উনার শাখার এয়ানত ঠিকমত আদায় করতেননা। একটু নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। ঐদিন বৈঠকেই রফিক ভাই প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে মোস্তফা ভাইকে এক পর্যায়ে বলছিলেন "দেখেন মোস্তফা ভাই সংগঠনের কাজ যদি ভাল না লাগে তাহলে সংগঠনের দেয়া লজিং থেকে চলে যান, এখানে আরেকজন ভাইকে লজিং দিলে সে সংগঠনের কাজ করবে। আপনি শুধু শুধু সংগঠনের ক্ষতি করছেন কেন? তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদের একটু খারাপই লাগছিল যে, রফিক ভাই এভাবে বলে ফেললেন। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম ঐ ভাইয়ের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার জন্য রফিক ভাইর ব্যক্তিগত কোন বিরোধ ছিল না, দুনিয়াবী কোন স্বার্থ ছিলনা। শুধু মাত্র একটি কারণ ছিল সেটি হল, তিনি ছিলেন দ্বীনের কাজের ব্যপারে আপোষহীন। অন্যায়কে কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারতেন না। প্রচন্ড রাগী ছিলেন রফিক ভাই, কিন্তু অন্যায়ভাবে কারও প্রতি চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে দেখিনি কোন দিন শহীদ রফিক ভাইকে।

৯ জুন ২০০১ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে যখন ছবি সহ শহীদ রফিক ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ দেখেছিলাম, তখন বিশ্বাসই করতে পরিনি যে, আমাদের সবার প্রিয় রফিক ভাই আর নেই। আর কোন দিন রফিক ভাইকে দেখবনা করিডোরে, হাস্যোজ্জল চেহারায় জিয়া হলের সামনে, রফিক ভাই দেখা হলে বলবেনা কোন দিন "শাহীন ভাই আগামী কাল ক্যাম্পাসে মিছিল।" চোখে পানি। শুধু বার বার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল যে, যে ছাত্রাবাসের সামনে রফিক ভাইকে হত্যা করা হল সে ছাত্রাবাসের একজন ছাত্র হয়েও দুর্ভাগ্য আমার বাড়ীতে থাকার কারণে শেষবারের মত আমার প্রিয় দায়িত্বশীল রফিক ভাইকে দেখতে পারিনি।

কোন দিন ভাবতেও পারিনি প্রিয় নেতা রফিক ভাই এভাবে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন।

www.pathagar.com

যে ভাইটির সাথে ১ জুন শুক্রবার মদনডাঙ্গার জামায়াত কর্মী সালাম ভাইয়ের বাড়ীতে মোস্তাফিজ ভাই সহ (বর্তমান ই.বি সভাপতি) দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম, আর খাওয়ার মাঝেই রফিক ভাই কৌতুক করে বলছিলেন "শাহীন ভাই আপনাদের সিলেটীদের বড় একটা দোষ আছে সেটি হল আপনাদের এলাকার মেয়েদেরকে সিলেট ছাড়া অন্য জেলায় বিয়ে দেন না"। আমিও তখন হাসতে হাসতে বলছিলাম আপনি চাইলে আমি দিতে পারব ইনশাল্লাহ, কোন সমস্যা নেই। তখন আমার প্রিয় ভাই রফিক বলছিলেন তাই নাকি? এ কথাগুলিই রফিক ভাইর সাথে আমার জীবনের শেষ কথা।

সেদিন কি আমরা কেউ যানতাম যে এর পরের শুক্রবারেই (৮ জুন ২০০১) তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাসদ ছাত্রলীগের খুনীদের কাছে আমাদের প্রিয় ভাই রফিক শাহাদাত বরন করবেন? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের হতবাক করেছে রফিক ভাইয়ের শাহাদাত। সবার কাছে একটাই প্রশ্ন এমন একজন মানব প্রেমী জিন্দাদিল মুজাহিদকে তারা কিভাবে হত্যা করলো?

ওরা কি জানতনা যে রফিক ভাই কেমন উদার মানুষ ছিলেন। শাহাদাতের কয়েক মাস পূর্বে খুনীদেরই একজনের মুমূর্ষ অবস্থায় রক্তের প্রয়োজন ছিল, শহীদ রফিক ভাই তাঁকে বাঁচানোর জন্য নিজের শরীর থেকে এক ব্যাগ রক্ত দিয়েছিলেন। হয়তোবা ভুলে গিয়েছিল ঐ অকৃতজ্ঞ মানুষরূপী পশুরা, রফিক ভাইয়ের সেই উদার চরিত্রের মানবীয় সুন্দর গুনাবলী ও ত্যাগ স্বীকারের কথা।

গত ৮ জুন ২০০২ রফিক ভাইয়ের প্রথম শাহাদাত বার্ষিকী চলে গেলো। আজ মনে হয় যেন কতকাল ধরে রফিক ভাইকে দেখিনা; হয়তোবা ইহজগতে আর কোনদিন দেখব না প্রিয় ভাইটিকে। কিভাবে দেখব।

দুনিয়ার ইতিহাসে রফিক ভাইর শাহাদাত নতুন কোন ঘটনা নয়। এটা শহীদ মালেকেরই দেখানো পথ। যারাই ইসলামী আন্দোলনের কাজকে এগিয়ে নিতে মরণ পণ জিহাদে শামিল হবে, খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তি তাদের সাথে এ আচরণই করবে। যে আচরনের স্বীকার হয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শহীদ সাইফুল ইসলাম (মামুন), শহীদ আমিনুর রহমান, শহীদ মুহসিন কবির, শহীদ আল মামুনসহ আরও অনেকেই। শোকে মুহ্যমান হলে কি আমাদের চলবে? শোককে শক্তিতে পরিনত করতে হবে। শহীদ রফিক ভাই যে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন এবং যে ক্যাম্পাস কে ইসলামী আন্দোলনের দুর্জয় ঘাটি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের সুন্দর জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই রক্তস্নাত ক্যাম্পাসে দাড়িয়ে শপথ করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ক্যাম্পাসে কালেমার পতাকা উড়াবই ইনশাল্লাহ।

সব শেষে মহান প্রভূর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন শহীদ রফিক ভাইকে শাহাদাতের পূর্ণ মর্যাদা দান করেন এবং আমাদেরকে রফিক ভাইয়ের দেখানো সুন্দর পথে কবুল করেন। আমীন।

www.pathagar.com

যেদিন রফিক ভাইয়ের শাহাদাত

মোঃ সুলতান মাহমুদ জিন্নাহ
আল-হাদীস বিভাগ, ৩য় বর্ষ

সে দিন ছিল ২০০১ সনের ৮ জুন শুক্রবার। ভোর বেলাতে ইবি সভাপতি রাসেল ভাই, রফিক ভাই ও আরো অনেকে আমাদের (কামাল) মেসে আসলেন দেখে খুব ভাল লাগল। কেননা মেসের আশ পাশের খবর তেমন ভাল ছিলনা। তার পূর্বে ৬ই জুন ভার্সিটির সাদ্দাম হলের সামনে কতিপয় উচ্ছৃংখল মাস্তান কর্তৃক গাঁজা খাবার আড্ডা বসায় হলের অবস্থানরত ছাত্রদের সাথে উচ্চ বাক্য বিনিময়ের পর হালকা ধরনের সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষের পর এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তৎপর হয়ে ওঠে শিবির উৎখাতের জন্য।

মেসে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের পেয়ে আমার সব ধরনের চিন্তা দুর করে ফিরে পেলাম মানসিক স্বস্তি। তারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের একটু পরে গ্রামের ভিতর ঢুকল সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে। শ্রীরামপুর গ্রামটি ছিল রফিক ভাইর জন্মস্থানের মতো। ছোট বড় সবাই এক ডাকে রফিক ভাইকে চিনত। তিনি মদন ডাঙ্গা আবাসিক শাখায় এক বৎসর শিবিরের সভাপতির দায়িত্ব পালন করায় এলাকাবাসীর সাথে এই ধরনের মধুর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। রফিক ভাই তার একান্ত একজন সুধীকে দেখে বলেছেন চাচা, আপনাদের ছেড়ে চলেই যাচ্ছি তাই দেখা করতে আসলাম, আর মাত্র ২/১ মাস। মাষ্টার্স পরীক্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে। চাচা জবাবে বলেছেন তোমরা চলে গেলে আর আসবে কে বাবা? এইভাবে গ্রাম বাসিদের সাথে বিভিন্ন রকমের কথা বলার পর আবার মেসে ফিরে আসেন। মেসে খাবারের দায়িত্ব ছিল আমার। এর মধ্যে খিচুড়ী রান্না হয়ে

www.pathagar.com

গেছে। সবাইকে খিচুড়ী খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে খাবার পরিবেশন করলাম। খাবার খাওয়ার পর রফিক ভাই আমার বেডে শুয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে আমার এক কর্মী এসে হাজির হলো। আমি রফিক ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি তার ভাল মন্দ বিষয়ে খবর নিলেন। এইভাবে ইত্যাদি বিষয় কথাবার্তা বলতে বলতে জুমার নামাজের সময় ঘনিয়ে আসে। মদন ডাঙ্গা সভাপতি মারুফ কারখী ভাইয়ের নির্দেশ কানাপুকুর জামে মসজিদে নামাজ পড়ানোর জন্য, যাবার সময় বললাম রফিক ভাই আমি কানাপুকুর নামাজ পড়াতে যাচ্ছি। তিনি বললেন ঠিক আছে দ্রুত চলে এসো। রফিক ভাইয়ের বিদায়ী কথা দ্রুত চলে এসো.....। আজও মনে পড়ে দ্রুত চলে এসো.....। কানাপুকুর জুমার নামাজ পর আসার পথে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কোন যানবাহন জোটেনা। মনটা একটু খারাপ হলো কি করি, ভাবলাম যে সামান্য এক কিঃমিঃ রাস্তা পায়ে হেঁটে চলে যাই। হাঁটা ধরলাম প্রায় আধা কিঃমিঃ আসার পর দেখলাম, রাস্তার ডান পার্শ্বে ৭/৮ জন লোক দাড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমি ওদের দেখে স্বাভাবিকভাবে চিন্তিত হই। হয়তবা এরাই জাসদ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী। তারা আমাকে দেখে এগিয়ে আসা শুরু করল। আমি ভাবলাম এখন কি করি? কি উপায়? আমার ও তাদের মাঝে দুরুত্ব ১৫ গজের মতো। আশ পাশে কোথায় অবস্থান নেয়া যায় চিন্তায় হিমশিম খাচ্ছি ইতিমধ্যে পিছন থেকে একটি ভ্যান গাড়ী এসে গেল। আমি ভ্যান ওয়ালাকে দাড়ানোর কথা বলেই দ্রুত ভ্যানে উঠে পড়ি। ওদেরকে ৫/৬ গজ পথ অতিক্রম করতেই দেখি রাস্তার বাম পার্শ্ব থেকে তিন হোন্ডায় নয়জন সন্ত্রাসীর এক বাহিনী আসছে। তারা আমাকে দেখেই গাড়ীর গতি একটু স্লো করে একজন বলছে এই দেখতো এ-কে? আরেকজন বলছে এ শিবির, এই শালাকে ধর সাইজ করে দেই। আরেকজন বলছে না-এ ভার্সিটির ছাত্র না- আরেকজন বলছে না-হে- এ ভার্সিটির ছাত্র এটাকেই ধর আর কোথাও যাবনা। আমি তাকিয়ে দেখলাম ওদের চক্ষুটা রক্তাক্ত, চেহারায় খুনের নেশা, হয়তবা মদ, গাজা খেয়ে এভাবে আসছিলো। সহজেই ওদেরকে চিনে ফেললাম যে ওরা জাসদ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী। আমি ওদেরকে দেখে নিশ্চিত যে আমার জীবনের এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। আর নিস্তার নেই। রাস্তার ডান পার্শ্বে ৭/৮ জন দাড়ালো বাম পার্শ্বে ওরা তিন হোন্ডায় নয়জন। কোথাও সরে পড়ার সুযোগ নেই। নেই কোন বাড়ীতে ওঠার সুযোগ। মনে মনে শহীদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। মনের সবটুকুন শ্রদ্ধা আবেগ উজার করে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারলনা আমাকে কি করবে। দুই হোন্ডা আমার সামনে চলে গেল, পিছনে থাকলো এক হোন্ডা সবাই বার বার ঘাড় ফিরে আমার দিকে তাকাতে লাগলো। পিছনের হোন্ডা থেকে একজন বলছে এই ভাই, এই ভাই আমি অত্যন্ত নরম সুরে পিছনে তাকিয়ে বললাম ভাইয়া আমাকে ডাকছেন....। ওরা তিনজন শেষবারের মতো আমার দিকে তাকিয়ে গাড়ীর গতি বাড়িয়ে চলে গেল। আমি চলন্ত ভ্যানে বসে সব দেখছি। সবাই মদন ডাঙ্গা বাজারে নামল। আমি চিন্তা করলাম এখন কি করতে পারি। মেসে খবর দেয়া দরকার। ওরা মেসে হামলা চালাতে পারে। আবার ভাবলাম কিভাবে যাব। কারণ গেলে তো ওদের সামনে দিয়েই যেতে হবে এবার আমাকে ধরে ফেললে আর ছাড়বেনা। এই সব চিন্তা করে ভ্যান থেকে নামলাম। তখন আমার ও ওদের দুরত্ব প্রায়

www.pathagar.com

একশত গজের মতো ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। পার্শ্বে একজন সুধীর বাড়ীতে উঠলাম আর বললাম ভাই সন্ত্রাসীরা বাজারে অবস্থান করছে আপনি দ্রুত মেসে খবরটা দেন। তিনি মেসে না যেয়ে মদন ডাঙ্গা বাজারে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে এরা কারা? কি জন্য এসেছে? তার ৭/৮ মিনিট পর মাসুদ রানা নামে এক ছেলেকে পাঠালাম যে দ্রুত যেয়ে খবর দেওয়ার জন্য সাথে সাথে ওরা মেস ঘিরে ফেলে। অনেকে সরে পড়লেও রফিক ভাই সরতে পারেনি। কেননা সন্ত্রাসীরা বলেছে রফিক ভাই আপনি দাঁড়ান। আপনার কোন ভয় নেই। আপনাকে কিছু করবো না। রফিক ভাই অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে দাড়িয়ে গেছেন। আর পালানোর চেষ্টা করেননি। ওরা চারদিকে থেকে ঘিরে কাপুরুষতো ভাবে পৈশাচিক কায়দায় সত্যের নির্ভিক সৈনিক রফিক ভাইকে কুপিয়ে হত্যা নিশ্চিত হবার পর ফেলে রেখে চলে যায়। ওদিকে আমি কঠিন মানসিক যন্ত্রনায় ছটফট করছি। কি করি? কোন খবর পাচ্ছিনা। এই চিন্তায় প্রায় ২০/২৫ মিনিট পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দেখলাম মদন ডাঙ্গা বাজারে লোকের ভিড়। তখন ভাবলাম এত লোক অবশ্যই কিছু হয়েছে। একটু এগিয়ে এক ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই এত লোক কি হয়েছে! বললেন এই মাত্র মাস্তানরা রফিক ভাইকে মেরে চলে গেল। খুব দ্রুত এগিয়ে লোকের সমাগমে উপস্থিত হলে একজন ভাই আমাকে বলল এই মাত্র রফিক ভাইকে হাসপাতালে পাঠালাম। শুনার সাথে সাথে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যেতে লাগল। হাত, পা কেমন যেন অবশ হয়ে আসল। কষ্ট করে মেস পর্যন্ত গেলাম যেয়ে দেখি অনেক লোকের সমাগম তার মধ্যে অনেকেই চিৎকার করে কাঁদছে। ইতিমধ্যে আরেকজন সাথী কামরুজ্জামান ভাইকে পেলাম দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। হাসপাতালে এসে দেখি অপারেশন থিয়েটার এর সামনে ইবি সভাপতি রাসেল ভাই ও বর্তমান সভাপতি মুস্তাফিজ ভাই সহ অনেক দায়িত্বশীল দাঁড়ানো সবাই নিশ্চুপ। কথা নেই ঠিকই, কিন্তু তাদের চেহারার মাঝে বুক ফাটা আর্তনাদ আর চিৎকারই দেখা যাচ্ছে। এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম খবর কি? উনি বললেন দোয়া করেন, আশংকাজনক। দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় ৫/৭ মিনিট পর খবর এলো রফিক ভাই শাহাদৎ বরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন) সবাই চিৎকার দিয়ে কেঁদে ফেললেন। ডুকরে ডুকরে কান্নার আওয়াজে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যেতে লাগল। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মসজিদ তখন যে পরিবেশ, চিৎকার ডুকরে ডুকরে কান্নায় মসজিদের মেঝেতে গড়াগড়ির অস্থিরতায় মনে হচ্ছিল শহীদের সাথীদের কলিজা ছিড়ে গেছে। এই কান্না বন্ধ করার জন্য শহর থেকে হাজারো লোক এসেও বুঝ দিতে পারেনি। বরং তারা চোখের পানি ফেলতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে বলেছেন এদের মনে হয় আপন ভাই বা রক্তের কেউ। তাছাড়া এত কাঁদবে কেন? তারপর যখন তারা জানতে পারল যে এদের সাথে রফিক ভাইয়ের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক তাদের দ্বীনি ভাই। তখনই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, এই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার কোন শক্তি নাই। যে দ্বীনি ভাইয়ের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ককেও হার মানায়, সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংগঠন, এই দ্বীনি কাফেলা বিজয়ের মালা একদিন আনবেই– ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

স্মৃতিতে ভাস্বর শহীদ রফিকুল ইসলাম

মু. রুহুল আমীন

শান্তিডাংগা দুলালপুরের এই শান্তি নিকেতনে যখন শান্তি পরিবেশ বিরাজ করছিল যখন সেশনজটের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রীষ্মকালীন ছুটি থাকা সত্ত্বেও হলসমূহ খোলা রাখছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই অশুভ শনির চক্রে পড়ে, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, ৭ই জুন ২০০১ সালে আকস্মিকভাবে হল সমূহ বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল পাঁচটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ হলো। আমরা ভার্সিটি গাড়ি যোগে ঝিনাইদহ আল-হেরা ইসলামিক ইনষ্টিটিউটের মসজিদে অবস্থান নিলাম। কিন্তু গর্বের বিষয় আমাদের সাথে ছিলেন আমার একান্ত আত্মার আত্মীয় শ্রদ্ধেয় ভাই শহীদ রফিকুল ইসলাম। শুধু সাথে ছিলেন না বরং তিনি শৃংখলা বিভাগের মত কঠিন দায়িত্বও ঐ রাতে পালন করেছিলেন। রাতে আমরা ঈশার নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করে না খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। কারন-তখন ও রফিকুল ইসলাম ভাই আরামের পথ ছেড়ে দিয়ে, বেছে নিলেন তাঁর পাহারা দেয়ার জিম্মাদারী।

রাত প্রায় দু'টার সময় খাদ্য বিভাগের পরিচালক মু. আব্দুল জলিল ভাই আমাদের খাওয়ার জন্য ডাকলেন। শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাই সহ আমরা সকলেই খেতে বসলাম। খাবার হিসেবে আসল পলিথিনে বাঁধা কিছু নরমাল খিচুরী। অনেকে ক্ষুধার জ্বালায় রেগে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন এত রাতে খাবার তাও আবার নরমাল খিচুড়ী তখন শ্রদ্ধেয় ভাই শহীদ রফিকুল ইসলাম শান্ত্বনার ভাষায়

www.pathagar.com

বলেছিলেনঃ "আমরা তো এতক্ষন এখানে ঘুমিয়ে ছিলাম আর যারা খাদ্য নিয়ে এসেছেন ওনারা রাত জেগে রান্না করে পলিথিনে রেডি করে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং আমাদের রাগ করা ঠিক হবে না"।

পর দিন ৮ই জুন শুক্রবার। ফজর নামাজ বাদ শান্ত পরিবেশ দেখে দায়িত্বশীলের কাছে বাড়ীতে যাওয়ার আরজী পেশ করলাম। কারণ অনেকদিন হলো বাড়ী থেকে এসেছি। তখন আমাদের ওখানের দায়িত্বশীল হিসেবে ছিলেন মু. মোস্তাফিজুর রহমান ভাই, বর্তমান যিনি ইসলামী ছাত্র শিবিরের ইবি শাখার সভাপতি। তিনি বললেন রাসেলভাই, রফিকভাই সহ কয়েকজন ভাই মদনডাঙ্গায় গেছেন। সেখান থেকে কি সংবাদ আসে তা বলা যাচ্ছে না, আপনি একটু দেরী করে জুম্মার নামাজ পর যান। দায়িত্বশীলের কথামত আমি আল্-হেরার "আমর ইবনুল আস" মসজিদে সালাতুল জুমা আদায় করলাম। এরপর মোস্তাফিজ ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। তখনও ক্যাম্পাস থেকে কোন সংবাদ আসেনি। তিনি আমার প্রয়োজন বুঝে একসপ্তাহর জন্য রাড়ীতে যাওয়ার ছুটি দিলেন এবং বললেন এক সপ্তাহ পর তথা ক্যাম্পাস খোলার পূর্বেই চলে আসতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তখনও জানতাম না আমার পরম শ্রদ্ধেয় রফিকুল ইসলাম ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষা বাদ দিয়ে আল্লাহর দেয়া পরীক্ষায় উত্তম ভাবে কৃতকার্য হয়ে যে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হচ্ছেন।

ঐ দিন মাগরিবের আগেই বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম। অনেক দিন পরে বাড়ী যাওয়ার পর ভাল লাগার পরিবর্তে কেমন যেন খাপ ছাড়া খাপ ছাড়া লাগছিল। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও কারন উপলব্ধি করতে পারলাম না। রাত কাটলো ঐ ভাবেই, পর দিন বাড়ীর প্রয়োজনে শহরে যেতে হল। শহরে উঠতে না উঠতেই আমার একান্তই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ডঃ মোহাম্মদ সোলায়মান স্যারের সাথে দেখা। আমাকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি ক্যাম্পাস থেকে কবে এসেছ? ক্যাম্পাসের পাশেই কি ঘটনা ঘটেছে তুমি কি জান? পর পর কয়েকটি প্রশ্নে তিনি করলেন। আমার উত্তর দেয়ার আগেই তিনি বললেন আমাদের রফিক শাহাদাত বরণ করেছে। প্রথমেই আশ্চার্য হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমাদের রফিক মানে দাওয়াহ মাষ্টার্সের রফিক ভাই? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ এবং বললেন পত্রিকায় পড়লাম সে মদনডাঙ্গাস্থ কামাল মেস থেকে জাসদ ছাত্রলীগ কতৃক শাহাদাত বরণ করেছে। অতি কষ্ঠে স্যারকে বিদায় জানিয়ে আরো ভালভাবে জানার জন্যে পত্রিকা অফিসে গেলাম। যেয়ে দেখি পত্রিকার মধ্যে আমার গত দিনের খারাপ লাগার প্রতিফলন। তখন যেন আমার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত, পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল, পৃথিবীর সকল কিছু আমার সামনে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। বার বারই স্মরণ হচ্ছিল শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের স্মরণীয় দুটি ঘটনার কথা।

আমি তখনো ক্যাম্পসের পার্শ্ববর্তী আনন্দ নগর গ্রামের এক মসজিদের কোয়ার্টারে

www.pathagar.com

থাকতাম। একদিন মাগরিব বাদ হঠাৎ শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের আগমন, দেখে খুবই ভাল লাগল। কেননা তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক। আর আমার সাথে ছিল তাঁর অন্য একটা সম্পর্ক। দেখা হলেই মৃদু হেসে খোঁজ খবর নিতেন শত ব্যাস্ততার মধ্যেও। কাছে পেয়ে ঐ দিন কিছু আপ্যায়ন করানোর ইচ্ছা পোষন করলাম। কিন্তু তিনি বললেন কোন কিছুর প্রয়োজন নেই তার পরেও দু'টো সিদ্ধ ডিম তাঁর সামনে পরিবেশন করলাম। যেটা ছিল আমার শেষ আপ্যায়ন। নাস্তা গ্রহন করার পর তিনি আমাকে পাশে ডেকে নিয়ে নিরিবিলি ভাবে বললেন রুহুল আমীন, পড়াতো শেষের দিকে, এখন তোমাদের জন্য কিছু একটা করে যেতে চাচ্ছি, সেটা তোমাদের পড়ার শেষে কাজে লাগবে। বিষয়টি পরিস্কার ভাবে জানতে চাইলে তিনি বললেন যদি আমরা মাসিক ৫০ অথবা ১০০ টাকা করে জমা রাখতে পারি, তাহলে পড়ার শেষে এখান থেকে একেবারে খালি হাতে যেতে হবে না। কিছু নিয়ে যেতে পারবো। যা আমাদের বেকারত্বের দুঃদিনে আশার সঞ্চার করবে। আমি কোন প্রশ্ন ছাড়াই এক বাক্যে রাজী হয়ে গেলাম এবং শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইকে অভিনন্দন জানালাম। কিন্তু এই নিঃস্বাস পরোপকারীর শীতল হস্তের পরশ আর বেশী দিন পেলাম না। তিনি চলে গেলেন ওপারের সুন্দর ভূবনে। রেখে গেছেন অমর কিছু স্মৃতি।

আর এক দিন আল্লাহর পথের এই নিবেদিত মুজাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলের গেট দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ভিতরে ঢুকছেন, হঠাৎ আমার সাথে দেখা। দেখা মাত্রই আমার দিকে ফিরে মুচকি হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম রফিক ভাই দৌড়াচ্ছেন কেন? তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে জবাব দিলেন সদস্য বৈঠক মুলতুবির পর এখনই আবার শুরু, হেঁটে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে।

এখনো ক্ষনে ক্ষনে শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের অমর স্মৃতির কথা হৃদয় পটে ভেসে আসে, তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। কেননা তিনি তো ছিলেন আল্লাহর পথের নিবেদিত লড়াকু সৈনিক, ছিলেন দ্বীনের জন্য পাগল পারা। চিন্তিত থাকতেন কিভাবে ক্যাম্পাসের সকল ছাত্রের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো যায়। আমরা যদি শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাইয়ের শোককে শক্তিতে পরিনত করে তাঁর রেখে যাওয়া জিম্মাদারীকে সামনে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাই সহ পাঁচ জন শহীদ ভাইদের রক্ত ভেজা এই ক্যাম্পাসে ইসলামী আন্দোলনের আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজ ধ্বনিত হবে না। ইন্‌শাল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শহীদ ভাইদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব আন্‌জাম দেয়ার তৌফিক দেন- আমীন।

www.pathagar.com

শোকাহত পিতার দুটি কথা

মোঃ সাইদুর রহমান

সর্ব প্রথমে প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। পরম করুণাময় বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্ তায়ালার। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাঃ (সঃ) এর উপর। আর কলিজার টুকরা রফিক সহ সকল শহীদের শাহাদত মকবুলীয়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করছি। আমার নয়নের মনি রফিকুল ইসলাম ৩য় সন্তান ও ২য় পুত্র খানপুর, সাতক্ষিরা মাদ্রাসা হতে ১৯৯০ সালে দাখিল পাশ করে বাঁগআচড়া সিঃ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। বাঁগআচড়া মাদ্রাসা হতে আলিম ও ফাজিল কৃতিত্বের সাথে পাশ করে বাগ আচড়া কলেজে বি,এ-তে ভর্ত্তি হয়। বি,এ পাশ করার আগেই ১৯৯৪/৯৫ শিক্ষা বর্ষে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হয়। বাগ আচড়া থাকা কালীন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সংস্পর্শে এসে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি উন্নত চরিত্র গঠনে আত্মনিয়োগ করে ও মানব সেবায় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আরও জোরদার করে। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের ফ্রি বই দেওয়া এবং তাদের বেতনাদি পর্যন্ত পরিশোধ করতে সাহায্য করত নিজে কষ্ট স্বীকার করে। যার জলন্ত প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী ছেলেদের কান্নাও আহাজারি। এভাবে রফিকের ছাত্র জীবনের সমাপ্তির সন্নিকটে এসেছিল শাহাদাতের সময় মাষ্টার্স পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্বের শেষ লগ্নে। ২০০১ সালের ৬ই জুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গাজা

www.pathagar.com

খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্র শিবির এবং জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে ছোট খাট সংঘর্ষ বাঁধে। ৭ই জুন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষনা করেন। ৮ই জুন শিবির জাসদ ছাত্রলীগের বিবাদ মিমাংসা ই,বির সভাপতি রইসুল ইসলাম রাসেলের নেতৃত্বে ৮/১০ জন শিবির নেতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মদন ডাঙ্গার কামাল মেসে অবস্থান নেয়। শিবির নেতাদের মধ্যে রফিক ও ছিল।

সন্ত্রাসীরা ধোকা দিয়ে শিবির নেতাদের আপোষের আহ্বান করে জুমার নামাজের পর ছাত্রলীগ জাসদের সন্ত্রাসীরা রামদা, চাইনীজ কুড়াল, হাতুড়ী ও রাইফেল স্টেনগান নিয়ে আক্রমন করে। রাসেলসহ অন্যরা মেস ত্যাগ করতে সক্ষম হলো কিন্তু লিটন খবিরসহ সন্ত্রাসীরা রফিককে আটকায়ে রামদা, চাইনীজ কুড়াল ও হাতুড়ী দিয়ে রফিকের মাথা ও সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত করে সন্ত্রাসীরা চলে যায়। জিল্লুর রহমান সহ শিবিরের ছেলেরা ঝিনাইদহ হাসপাতালে ভর্তি করে। বিকাল ৪ টার দিকে রফিক শাহাদতের নজরানা পেশ করে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়।

শাহাদাতের খবরঃ ৮ই জুন শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না, অবশেষে বেপরোয়া রাস্তায় পায়চারী করতে লাগলাম। এমন সময় পাশ্ববর্তী গ্রাম নাকতাড়া মুনছুর মাষ্টারের বাড়ীর সামনে যেতেই থানা আমীর অধ্যাপক আব্দুস সবুর সহ জামাত শিবিরের কয়েকজনের সাথে দেখা হয়। সালাম বিনিময় পর থানা আমীর বললেন মাওলানা সাহেব মাগরীবের নামাজ কোন মসজিদে পড়বেন? উত্তরে বললাম আমাদের লাঙ্গল দাড়িয়া মসজিদে। আব্দুস সবুর আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে মটর সাইকেলে করে মসজিদে নিয়ে আসলেন মাগরিবের নামাজ শেষ হলে মুসুল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন মুমিন জীবনের একমাত্র কাম্য শাহাদাত বরণ। আমাদের থানার ২য় শহীদ রফিকুল ইসলাম। পুত্রের শাহাদাতের খবর শুনে জ্ঞান হারানোর উপক্রম। পরবর্তীতে ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। যেহেতু শহীদের পিতা হওয়া সবার ভাগ্যে হয়না। আমি শহীদ রফিকের পিতা। রফিকের শাহাদাতের খবরে কেবল মাত্র আমার পরিবার নয় গোটা এলাকা ধ্বসে গিয়েছে। শাহাদাতের পরের দিন ৯ই জুন বিকেলে যখন রফিকের কফিনের গাড়ী বাড়ী পৌছাল তখন বাড়ীঘর রাস্তাঘাট ঈদগাহ ময়দান পুরুষ, মহিলা, হিন্দু, মুসলিম সকলে এক নজর রফিককে দেখতে এসেছিল, সবার ভাগ্যে ভীড় উপেক্ষা করে শহীদের মুখ দেখা সম্ভব হয়নি। এ দুঃখ এখনও প্রকাশ করে। এমনকি রফিকের মা আদরের কলিজার টুকরাকে অনেক কষ্টে এক নজর দেখেছিল।

পাড়া প্রতিবেশী সহ এলাকার আগত সকলের চোখে পানি ও মুখে বিস্ময় সবাই বলতে লাগলো এমন সদালাপী পরোপকারী সত্যবাদী নির্ভীক খোদাভীতি রফিককে কেন মেরে ফেলল। কিন্তু কোন জবাব নেই। সবার একই প্রশ্ন কেন আমাদের রফিককে প্রাণ দিতে হলো ওতো কোন অন্যায় করেনি। তার কাজ ছিল মানুষকে আল্লাহর দিকে ও মঙ্গলের

www.pathagar.com

দিকে ডাকা ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো। এসব সহ্য হয়নি হায়েনাদের তাই সেদিন পশুর মত ঝাপিয়ে পড়ে রফিককে শাহাদাতের পেয়ালা পান করালো ইসলামের শত্রুরা। তারা মনে করেছিল রফিককে সরাতে পারলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারাদেশে ইসলামী আন্দোলন বন্ধ করা যাবে। তাদের ধারনা ঠিক নয়। শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের প্রেরণার উৎস। রফিকের রেখে যাওয়া কাজ তার সাথীরা সুচারুরুপে পালন করবে ইনশাল্লাহ।

শহীদ রফিকের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশের ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হোক এই কামনা করি দরবারে এলাহীতে। পরিশেষে আমার নয়নের মনি রফিকুল ইসলামসহ সকল শহীদদের শাহাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হোক। আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। ছাত্রশিবির কর্মীদের ঈমানী শক্তি ও জিহাদী প্রেরণা দান করুন। আমিন ছুম্মা আমীন।

www.pathagar.com

সন্তান হারা মায়ের আহাজারী

শহীদ রফিকের আম্মা

আল্লাহ পাকের লাখো কোটি শুকরিয়া যে আমি শহীদের গর্বিত মা হতে পেরেছি। এই ভাগ্য সবার হয় না বা এটা চাইলেও পাওয়া যায় না। তাই আমার কলিজার টুকরা রফিক আমার জীবন ধন্য করেছে। আমি ভাগ্যবতি মা। কলিজার টুকরা রফিক আমার তৃতীয় সন্তান। ছোটবেলা থেকে ও ছিল খুব বুদ্ধিমান। অনেক আদরের রফিক আমার। কি লিখবো ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি আজ। সে দিন ছিল ৮ই জুন। ২০০১ সাল। আমার রফিকের মাস্টার্স শেষ বর্ষের পরীক্ষা ৩-৪টা বাকী ছিল। কিন্তু আমার রফিক তো জীবনের শেষ পরীক্ষায় সফল হয়েছে। শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে আল্লাহ তাকে জান্নাতের বাগিচায় নিয়ে আমাকে জানিয়ে দিলেন, তোমার রফিক মরেনি।

ওর মেজ চাচা আদর করে ওর নাম রেখেছিলেন রফিক। রফিক অর্থ বন্ধু। ছোট বেলা থেকে ও সবার কাছে বেশি আবদার করত। কিন্তু আমি মা হয়েও তার সব আবদার পূরণ করতে পারিনি। হে আল্লাহ! তুমি ওর সব আবদার পুরণ করে দাও। ও সংসারের পালন করতো। কোন সমস্যা হলে সমাধান ও ওই দিত। ছোটবেলা থেকে আমার ছেলে-মেয়েদেরকে ইসলামী শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিনি। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমার রফিক জীবনে অনেক বড় হবে। হে আল্লাহ! তুমি সত্যি তাকে অনেক বড় করেছ। নবীদের পরে শহীদদের স্থান। শাহাদাতের কয়দিন আগে তুমি আমার গলার চেইন তৈরি করে এনেছিলে। আর

www.pathagar.com

আমায় বলেছিলে আমি পড়া শেষ করে চাকুরি পেলে তোমার আশা আমি পুরণ করবো। আজ আমায় কে বলবে যে আমি যখন চাকুরি পাব। তোমার সব আশা পুরণ করবো। হে আল্লাহ মায়ের দোয়া দ্রুত গতিতে তোমার কাছে পৌছে যায়। শোকাতুর মায়ের দোয়া কবুল করে তুমি আমার রফিককে জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌছে দাও। যেদিন তোমার অনুমতি ছাড়া কোন সুপারিশ কেউ করতে পারবে না। সেদিন আমার রফিক আমার অপেক্ষায় জান্নাতের বাগিচায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ জান তুমি সন্তান হারানো ব্যথা কত কষ্টের। আমার বুকটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কোথাও খুঁজে পাইনি আমার কলিজার টুকরাকে। মা বলে আর কোন দিন ডাকবে না। আর বলবে না মা ভাত দেন। আল্লাহ এযে কি ব্যথা তাও তুমি জান। এসব কথা যখন আমায় হৃদয়ে জেগে উঠে তখন শোকে ভেঙ্গে পড়ি। তাই আমি শহীদের গর্বিত মা। আমার রফিক শহীদ। এলাকার যুবক ও কিশোরদের সাথে ছিল তার অনাড়ম্বর মেলামেশা দরিদ্র ছাত্রদেরকে আমার রফিক লেখাপড়া করার উৎসাহ যুগিয়েছে এবং তাদের সামর্থ অনুযায়ী টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। কি অপরাধ ছিল আমার রফিকের। কি মিষ্টি হাসি। কি সুন্দর কথা। হায়েনার দল রামদা ও হাতুড়ির আঘাতে কেড়ে নিল সব। আল্লাহ আমি তাকে হিফাজত করতে পারিনি। তুমি তাকে হিফাজত করেছ। আরও হিফাজত করেছ আমার পরিবারটাকে সেই দিনের হাত থেকে যেদিন কেউ কারও জন্য কিছু করতে পারবে না। আল্লাহ তুমি আমার দুর্বল ঈমানটাকে সুদৃঢ় করে দাও যাতে আমি ধৈর্যের সাথে তোমার দেওয়া সর্বোত্তম নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আমার রফিকের শাহাদাতের বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন বলে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আমার রফিকের দ্বীনি ভাইদের সহ সকলের কল্যাণ কামনা করি।

www.pathagar.com

স্মৃতির আলপনায় একটি নাম

মোঃ আঃ মালেক
(শহীদ রফিকের চাচাতো ভাই)

রফিক সম্পর্কে কোন দিন কোন কিছু লিখবো তা কখনও কল্পনায় আনিনি। কিন্তু আজ আমি তার বড় ভাই হয়ে তার স্মৃতির কথা গুলি না লিখে পারলাম না। পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিই ধ্বংসশীল। এই পৃথিবীও চির দিনের নয়। তাঁর বুকে যা কিছু আছে সব কিছুই এক দিন ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর সাধ গ্রহণ করতে হবে, একথাটা অবস্যম্ভাবী সত্য। তার থেকে কেহই রেহাই পায়নি পাবেও না। কিন্তু কোন মানুষ স্মৃতি-বিস্মৃতির রোমাঞ্চতার মাঝে টিকে আছে এ পৃথিবী। শহীদ রফিক তেমনি একটি নাম। একটি স্মৃতি, একটি প্রাণ, একটি প্রতিভা, একটি নক্ষত্র, একটি আদর্শ, একটি ফুটন্ত গোলাপ। যা বার বার দোলা দেয় অসংখ্য ব্যথাতুর হৃদয়কে বিশেষ করে আমাদের পরিবারকে। যার মনে আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন ভয় ছিলনা, সে সংগঠনের কাজ ছাড়া অন্য কাজ বুঝতো না। সে জীবনে শাহাদাতের স্বপ্ন ছাড়া কোন স্বপ্ন কল্পনা করতো না। যার সকালে ঘুম ভাংতো ফজরের আজান ও সংগঠনের কাজ নিয়ে আবার রাতে কাটতো সংগঠনের অকুতো ভয় আল্লাহর সৈনিক হিসাবে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সংগঠের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

মনে করে ছিলাম শহীদ রফিকের স্মৃতি বিকিরণ করে সকলকে মর্মাহত করবো না। কিন্তু শহীদ রফিকের কিছু স্মৃতি চারন না করে পারছিনা, যে স্মৃতি বার বার মনের মাঝে উকি মারে এবং নিজের মনকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই তাঁর সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

জীবনী ও কিছু স্মৃতি চারন উল্লেখ করছি।

শৈশব জীবন ঃ

শহীদ রফিক সাতক্ষীরা জেলার আশাগুনির লাঙ্গলদাড়ীয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকে শৈশব পর্যন্ত নিজ গ্রামে আব্বা-আম্মা, চাচা-চাচী, ভাই-বোনের আদর স্নেহে বড় হতে থাকেন। তাঁর শৈশব জীবনের কিছু কথা, পারিবারিক সূত্রে ছোট কাল থেকে আমরা তিন ভাই ছিলাম পিঠে-পিঠে খলিল, মালেক ও রফিক। রফিক ছিল আমাদের দুই জনের চেয়ে একটু ছোট, চঞ্চল ও আমোদ প্রিয়। যার ফলে সকলের কাছে সে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। বিশেষ করে ছোট বেলায় তাকে আমি টুনু নামে ডাকতাম। আর সেই নামে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা এক নামে আজও চেনে। ছোট বেলা থেকে তিন ভাই এক সাথে ঘুমানো, খাওয়া, গোসল, খেলাধূলা, স্কুলে যাওয়া এমন কি সব কিছুই এক সাথে করতাম। যখন আমরা তিন ভাই এক সাথে বাজারে বা স্কুলে যেতাম তা দেখে গ্রামের লোকজন বলাবলি করতো ওরা তিন ভাইয়ের মধ্যে এত মিল। যে মিল আমাদের পরিবারের মাঝে আজও অটুট আছে। ছোট বেলা থেকে শহীদ রফিক অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, ডানপিটে ও বন্ধুপ্রিয়।

শিক্ষা জীবন

ছোট বেলা কোরআন শিক্ষা লাভ করেন তার পিতার নিকট থেকে। আব্বা ও চাচারা পারিবারিক ভাবে ধর্মভীরু থাকার ফলে প্রাইমারী স্কুলে না পাঠিয়ে শহীদ রফিককে (আমাদেরকে) ছোট কাল থেকে গ্রামের পার্শ্বে গাজীপুর কুড়িগ্রাম ইসলামীয়া সিদ্দিকীয় সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। প্রথম শ্রেণীর থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ভাল ছাত্র হিসেবে পড়া লেখা করে। সেই মাদ্রাসার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাঁর গর্বিত পিতা মাওঃ মোঃ সাইদুর রহমান। শৈশব থেকে যখন সে কৈশোর জীবনে পদার্পন করলো তখন তার সঙ্গী সাথী ছিল অনেক, যাদের কে নিয়ে সব সময় খেলাধুলা ও চলাফেরা করতো। গ্রামে আমরা চাচাত ভাই ও ভাগ্নে মিলে ৬/৭ জনের একটি খেলার টিম ছিল। যে টিমের সদস্য ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সেক্রেটারী রবিউল বাশার। সে সম্পর্কে ছিল আমাদের ভাগ্নে রফিকের বড় ভাই মাওঃ মোঃ খলিলুর রহমান ছিল আমাদের খেলার টিমের প্রধান। আমি ভাল লেখা পড়া করার জন্য ঐ মাদ্রাসা থেকে সাতক্ষীরা শহরের পাশে খানপুর দাখিল মাদ্রাসায় এসে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হই। তারই পরের বছর সে বলল আমিও মালেক ভাইয়ের মাদ্রাসায় পড়তে যাব। তার অনুরোধে আব্বা ও চাচাজান তাকে খানপুর মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি করান। সেখান থেকে সুনামের সাথে ১৯৯০ সালে দাখিল পাশ করেন এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামের লোক জনের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেন। এরপর আলীম পড়ার জন্য চলে আসেন। যশোর জেলার শর্শা থানার বাগ আঁচড়া ফাজিল মাদ্রাসায়। সেখানে সে এক টানা চার বছর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করে এবং আলীম ও ফাজিল কৃতিত্বের

www.pathagar.com

সাথে পাশ করে।

তার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪ইং সালে ভর্তি পরীক্ষা দেন এবং দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে ভর্তির সুযোগ পান। ভর্তির সুযোগ পেয়েও তাকে সাংগঠনিক ভাবে ভর্তি হতে দেয়া হয়নি। তখন তার সাংগঠনিক মান ছিল যশোর শহরের খাজুরা শাখার সদস্য প্রার্থী। যার ফলে সে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। পারিবারিক ভাবে চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ও ভাগ্নে রবিউল বাশার এবং আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস ও দাওয়াহ বিভাগের ছাত্র। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ ইং সালে আবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দাওয়াহ এন্ড ইসলামীকে ষ্টাডিজ বিভাগে ভর্তির সুযোগ পায়। ই.বিতে ভর্তির সময় শেষ হওয়ার ২ দিন আগে আমি ভাগ্নে রবিউল বাশারের সাথে পরামর্শ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভর্তির জন্য যশোরে শিবিরের শহর ম্যাচে (মুন্সি মেহেরুল্লাহ) গিয়ে তাকে খোঁজ করে না পেয়ে এক সদস্য ভাইকে বলে আসি। পরের দিন সে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আসে এবং দাওয়াহ এন্ড ইসলামীক ষ্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়। ২০০০ইং সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের অনার্স পাশ করে। ২০০১ ইং সালে ৮ জুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র জীবনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী মাষ্টার্স শেষ পরীক্ষার একটি মাত্র কোর্স বাকী থাকতে আল্লাহর জমীনে দ্বীন কায়েমের দৃঢ় শপথে বলিয়ান হয়ে শহীদ মালেকের বজ্র নির্ঘোষের সাথে কণ্ঠ মেলাতে মেলাতে শহীদী ঈদগাহে জমায়েত হলেন শিবিরের ১১৪ তম শহীদ মোঃ রফিকুল ইসলাম। ঐ দিন সে জীবনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী শহীদ উপাধী লাভ করে এবং মহান আল্লাহপাকের দরবারে চলে যান আব্বা, আম্মা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য সাথীদেরকে ফাঁকি দিয়ে।

পারিবারিক জীবন ঃ

আমরা একই পরিবারের একান্ন ভুক্ত সদস্য হিসেবে ছোট বেলা একসাথে বেড়ে উঠি। আব্বা, চাচারা দুই ভাই, আম্মা, চাচী আম্মা, ছয় ভাই এবং নয় বোনের বিরাট সংসার থাকার পরও এক অসাধারণ মিল, যা বর্তমান জামানায় খুজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। যে মিল এখনও পর্যন্ত আমাদের পরিবারের মাঝে অটুট আছে। একই পরিবারে অনেক সদস্য হওয়ায় আমাদের পরিবারে এবং ভাই বোনের মাঝে কোন ধরনের মন মালিন্য ছিলনা। ছোট বেলা থেকে ছয় ভাইয়ের আশা ছিল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা দূর করবো। এক সাথে ছয়/সাত ভাই ও বোনদের লেখা পড়ার খরচ যোগানো ছিল মা বাবার ও পরিবারের জন্য খুবই কষ্টকর। তার পরও পড়া লেখা করে এক ভাই ডিগ্রী ও পাঁচ ভাই মাষ্টার্স ডিগ্রী পাশ করতে যাচ্ছি ঠিক তখন আমাদের মাঝ থেকে অকালে ঝরে গেল আমাদের পরিবারের সবার প্রিয় ৪র্থ ভাইটি। যে ছিল আমাদের পরিবারের পরামর্শ দাতা ও ছোট ভাই বোনদের সব ধরনের আকাংখা পূরণে সর্বদা সচেষ্ট। ছয় ভাইয়ের মধ্যে সে ছিল ভাগ্নে ভাগ্নি ও ছোট ভাই-বোনের কাছে খুব প্রিয়

www.pathagar.com

জন। ছোট কাল থেকে সে ছিল আত্মীয় পরায়ন ও মিশুক। যখন সাংগঠনিক ছুটিতে বাড়ী আসতো তখন ফুফু, বোন আত্মীয়-স্বজনের এবং বন্ধুদের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া ছিল তার ছুটির একটা অংশ। এছাড়া ছোট বেলা থেকে আম্মা, চাচীরা বলাবলি করতো ছয় ভাইয়ের মধ্যে সংসার ও মা বাবার কেউ যদি দেখা শুনা করে, তবে তা করবে রফিক। বাড়ীতে আসলে ছোট ভাই ও বোনেরা আব্দার করে তার কাছ থেকে গল্প শুনতো ও তাদেরকে সে বলতো আর কয়দিন পর আমি চাকুরী পেলে তোমাদের সব দাবী পুরন করবো। শহীদ রফিক চলে গেছেন সব দাবীর বড় দাবী আজও পুরনের জন্য মহান পাকের দরবারে কিন্তু তার ছোট ভাই রফিক কে যে সবচেয়ে বেশি ভাল বাসতো সে হলো আমার শ্রদ্ধেয় মেজ চাচা। যে চাচার ছেলে মেয়ে ও সংসার বলতে কিছুই ছিল না, ছিলাম শুধু আমরা কয় ভাই-বোন। আজও যখন চাচা বাড়ীর প্রাচীরের ভিতরে ঢোকে তখন দেয়ালে লাগানো শহীদ রফিকের ছবির দিকে শুধু সন্তান হারানোর ব্যথা পরিলক্ষিত হয়।

সাংগঠনিক জীবন ঃ

শহীদ রফিকের সাংগঠনিক জীবন শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। সে তখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। আমরা যখন সব ভাই গ্রামের মাদ্রাসায় পড়া লেখা করি তখন আমাদের পাশের গ্রামের নজরুল ইসলাম নামে এক ভাই আমাদের বৈঠক ঘরে এসে বললো আজ বিকালে আপনাদের সাথে বাদ আছর মসজিদে কিছু কথা বলবো। আমরা আছর নামাজ শেষে সব ভাই ও মুসুল্লিরা মসজিদে বসলাম। তিনি আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের পর কোরান, হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করলেন এবং ইসলামী ছাত্র শিবির কি, কি জন্য ইসলামী ছাত্র শিবির করবেন। আলোচনার পর যখন মসজিদ থেকে বাহির হই তখন তিনি কিছু ফরম দিয়ে বললেন আপনারা ইচ্ছা করলে ছাত্র শিবিরের যোগ দিতে পারেন। সে দিন থেকে রফিকসহ আমরা ইসলামী ছাত্র শিবিরের যোগদান করি। এর পর শহীদ রফিক বাগ আঁচড়া মাদ্রাসার আলীম ক্লাসের ছাত্র থাকা কালিন সময়ে ১৯৯২ ইং সালে সংগঠনের সাথী হয়। ১৯৯৪ ইং সালে সংগঠনের সদস্য প্রার্থী হন এবং ১৯৯৮ ইং সালে সংগঠনের সর্বোচ্চ ক্যাডার সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। সদস্য হওয়ার পর সে ই.বি শাখার একটি উপশাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। ১৯৯৯ ইং সালে নতুন Set up থাকে দায়িত্ব দেয়া ই.বি শাখার যুব ও ক্রিড়া সহ-সম্পাদক। আর তার বড় ভাই আমাকে দেয়া হয় ই.বি শাখার যুব ও ক্রিড়া সম্পাদক। দুই ভাইয়ের উপর চলে আসে সংগঠনিক শুরু দায়িত্ব। যে দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে দুই ভাই এক সাথে বাড়ী যেতে পারছি খুবই কম। ১৯৯৯ ও ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত সে ছিল আমার বিভাগের সহকারী সম্পাদক যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। ছয় বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এবং দুই বছর আমার সহকারী হিসাবে তাকে দেখেছি সংগঠনের জন্য পাগল পারা। সাংগঠনিক কাজে তাকে যে মুহূর্তে ডেকেছি লেখা পড়া এবং সব কিছু ফেলে সে সংগঠনের ডাকে সাড়া

www.pathagar.com

দিয়েছে, যা ছিল দায়িত্বশীলদের প্রতি আনুগত্যের চরম বহিঃপ্রকাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া লেখা করতে গিয়ে দুই ভাইকে আর্থিক কষ্ট করতে হয়েছে কিন্তু কোন দিন ছোট ভাই হিসেবে আমার কাছে একটি টাকাও চায়নি। হঠাৎ একদিন ক্যাম্পাসে গিয়ে বললো ভাই তোর কাছে কোন টাকা আছে কিনা, আমি তখন তাকে ২০ টাকার একটা নোট দিলাম। তাছাড়া কোন দিন কোন কিছু আমার কাছে চায়নি। তবে আমি যখন ছাত্র ও সাংগঠনিক জীবন শেষ করে বাড়ী চলে আসবো তখন আমাকে বললো তোর তোষকটা আমাকে দিস। পাশে ছিল ঐ সময় আমার বিভাগের এক সাথী সে বললো রফিক ভাই মালেক ভাইয়ের তোষকটা আমি নিব। তখন সে আর কোন কথা না বলে তাকে নিতে বললো। যেটা ছিল তার সাংগঠনিক ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টান্ত। এরপর আমি যখন সাংগঠনিক জীবন শেষ করে বাড়ী চলে আসি তখন তিনি আমার জন্য ই.বির ক্যাম্পাস থেকে চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি ও গাইড কিনে বাড়ী পাঠাতেন। আমি ও রফিক কুরবানী ঈদের পর বাড়ী থেকে এক সাথে বাহির হয়ে সাতক্ষীরার গাড়ীতে আসি : সে চলে যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আমি চাকুরীর উদ্দেশ্যে রাতে ঢাকায় রওনা হই। আমি ঢাকায় এসে চাকুরীতে ঢোকার একমাস পরে এম.ফিল এর জন্য ফরম উঠাতে যাই ই.বিতে তখন তাকে আমি বললাম তোর কোন টাকা লাগবে কি? তখন সে বলল তুই পারলে বাড়ীতে বড় আব্বার জন্য কিছু টাকা পাঠাবি। যেটা ছিল তার পারিবারিক চিন্তা ভাবনার অনন্য দৃষ্টান্ত। পর দিন রাতে আমি ই.বির ক্যাম্পাসে থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রাত ৯টায় জিয়া হল থেকে রওয়ানা দিচ্ছি সে সময় ছয়/সাত জন ছোট ভাই সহ রফিক আমাকে শেখ পাড়ায় গাড়িতে উঠিয়ে দেয়ার জন্য তার রুম থেকে নামছি এমন সময় হারুন জিয়া হলের গেষ্ট রুমে যেয়ে বলল মালেক ভাই রফিক ভাইয়ের কিছু টাকার দরকার। আমি রফিককে বললাম কত টাকা লাগবে? সে উত্তর দেয়ার আগে আমি ম্যানি ব্যাগ থেকে পাঁচ শত টাকার একটা নোট বের করে দিলাম এবং বললাম যদি টাকা লাগে তবে ঢাকায় কেউ আসলে তাকে বলে দিস। ঢাকার গাড়ীতে উঠার পূর্বে আমার সাথে সে জীবনের শেষ সালাম ও কোলাকুলি করেছিল। সে সময় সকলে (হারুন,রানা, মর্শেদ ও সাইফুল) তার দেখা দেখি ওরাও কোলাকুলি করলো। তখন তার এক বন্ধু আমাকে বলল মালেক ভাই আপনি চাকুরী পেয়ে নতুন প্যান্ট শার্ট পরে আসলেন তা ছোট ভাইয়ের জন্য কি এনেছেন। আমি লজ্জায় কিছু না বলে ঢাকায় চলে আসি এবং রফিকের জন্যে ২টা শার্ট পিচ ক্রয় করি। আর পরের মাসে একটি প্যান্ট পিচ কিনে এবং তৈরী খরচের টাকা দিয়ে ই.বিতে রফিকের কাছে পাঠাবো। রফিকের শেষ ইচ্ছা শার্ট ও প্যান্ট পিচের ওয়াদা আজও আমি পূরণ করতে পারিনি। আমি বড় ভাই হিসাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি বলে মনে করি। আমি ঢাকায় চলে আসি একা আর রফিক এক মাসের ব্যবধানে বাড়ী গেছে সাদা কাপড়ে মোড়ানো কাঠের বক্সের ভিতরে শত গাড়ী ও হাজার হাজার লোক বেদনা ভরা মন নিয়ে শেষ বারের জন্য মা-বাপ ও ভাই বোনের কাছে। সে দিন

www.pathagar.com

আমাদের বাড়ীতে ছিল অনেক নাম করা মেহমান ও বন্ধু বান্ধবের সমারোহ কিন্তু সে সব মেহমানদের মেহমানদারী করাতে পারেনি রফিক। শহীদ রফিক সারাদিন সংগঠনের কাজ করতো আবার সারা রাত হল পাহারায় কাটিয়েছে অকুতো ভয় সৈনিক হিসাবে। সাংগঠনিক যে কোন সিদ্ধান্ত অকপটে মেনে নিতে তার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। আবার যে কোন অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও ভয় পেত না।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, ও শত কর্মকর্তা-কর্মচারী এক নামে চিনতো ও জানতো শহীদ রফিকুল ইসলাম কে। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, সদালাপী, মিষ্টিভাষী, মিশুক, সংগঠন প্রিয় ও পরোপকারী। ছোটদেরকে ভাল বাসতেন ও স্নেহ করতেন এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। ছোট বড় সকলকে দুর থেকে সালাম দিয়ে আপন করে নিতেন। এমন দূর থেকে ছালাম দিতেন। যা আজও ই.বির ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীরা বলা বলি করে। শহীদ রফিক সর্বদা সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন। রফিক যখন বাড়ীতে থাকতো তখন বলত আজান হলে চল সবাই মসজিদে যেয়ে জামায়াতে নামাজ পড়ি। আমরা কয় ভাই যদি মসজিদে না যাই তবে আল্লাহর মসজিদে আবাদ করবে কে।

শেষ কথা

সবাই আছে আমাদের ঘিরে, সেই জিয়া হলের ২১১ নং কক্ষ এখনও আছে, ই.বির সেই সবুজ শ্যামল গাছ পালা আছে, তার পড়ার টেবিল চেয়ার আর বই-খাতা, কলম, জামা-কাপড় এরউপস্থিতি ঠিক পূর্বের মত আছে, মা তার ছেলের অপেক্ষায় আছে, বোন তার ভায়ের অপেক্ষায় আছে, কিন্তু রফিক নেই। আছে আমাদের পরিবারের মাঝে নীরবতা, স্থবিরতা ও শুন্যতা। তার মায়ের কাছে ফিরে গেছে রফিকের সেই বালিশ, বেড ছিট, ব্যাগ, ট্রাং, জামা কাপড় ও বই খাতা, বাড়ী থেকে তার মা যা দিয়ে পাঠিয়েছিল রফিককে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া লেখার জন্য। যে রফিক বাড়ীর প্রাচীরের মধ্যে ঢুকে প্রথম তার বড় মাকে ডাক দিয়ে বলতো বড় মা আমি বাড়ী এসেছি। সেই রফিকের বড় মা গত রমজানের ঈদে বলেছিল মালেক তোরা সবাই বাড়ী আসলি তা টুনু বাড়ী আসেনি। আমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে চোখের অশ্রু ফেলে ছিলাম আর আমার চাচী আম্মা বলে ছিলো বুবু টুনু আর কোন দিন বাড়ী আসবে না তোমাকে বড় মা এবং আমাকে মা বলে আর কোন দিন ডাকবে না। টুনুর বড় মা আরো বলে ছিলো তোরা কি টুনুকে বাড়ী থেকে বের করে দিছিস কেন? তাকে তোরা বাড়ী নিয়ে আয়। রফিককে যারা মেরে ছিল তাদেরকে তোরা পাঁচ ভাই কিছু করতে পারলিনা। তাছাড়া চাচাজান, চাচীজান, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও তার বন্ধুদের প্রশ্ন এসবের কি কোন বিচার হবে না। এমনকি পরিবারের নানা প্রশ্ন যার জবাব দেয়া খুবই কষ্টকর। কে দিবে সেই সব প্রশ্নের জবাব?

শহীদ রফিক আমাদের সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেল দুরে-অনেক দুরে,

www.pathagar.com

যেখানে গেলে কেউ কোন দিন ফিরে আসে না। জানি রফিক ও ফিরে আসবে না কোন দিন। কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না, সেই প্রিয় ফুটান্ত লাল গোলাপটি ঝরে পড়েছে। যে গোলাপটি তার বিকিরণ ছড়িয়ে ছিল সুদুর সুন্দর বন হতে কুষ্টিয়া তথা বাংলার জমিনে।

এসব আজ শুধুই স্মৃতি। তোমার স্মৃতির কথা কি লিখব? এসব কথা মনে হলে সব কিছু এলো মেলো হয়ে যায়। নীরবে শুধু দুই চোখের পানি ফেলি বার বার। রফিক তুমিতো নিশ্চয়ই বেহেস্তের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নীরবে-নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছো। শুধু বলি একবার ফিরে এসো, দেখে যাও তোমার স্নেহময়ী আম্মা, আব্বা, বড় মেজ চাচা, ভাইবোন ও আত্মীয় স্বজন কেমন আছেন, কি করছেন। তোমার ফটো, পোষ্টার, জামা,বেডিং পত্র ও স্মৃতি বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন বারবার, অজ্ঞান হচ্ছেন যে কতবার। তোমার আব্বা আজ তোমার শোকে চোখ হারাতে বসেছে, তোমার মা আজও বাকরুদ্ধ দেখে যাও, তোমার ভাই-বোনেরা তোমাকে হারানোর বেদনায় কতটা মর্মাহত। তোমার সাথীরা (বন্ধুরা) কবর জিয়ারতে এসে বারবার কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ছে, চোখের পানিতে সাগর বানিয়ে দিচ্ছে। দিনের দিন কতদূর দুরান্ত থেকে তোমার কবর জিয়ারত করতে ছুটে আসছে তোমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী শিবিরের নেতা কর্মীরা। তাদের আহাজারিতে এলাকা স্তম্ভিত হয়ে যায়। তোমার বন্ধুরা নিজ হাতে কবরের উপর রোপন করেছে কত রকম ফুলের চারা ও গাছ। ঐ যে ফুটেছে কত সুন্দর সুন্দর ফুল। একবার এসোনা ফুল নিতে? আর এক বার চলনা অতীতের মত পারিবারিক কবর স্থানে। যেখানে সবাই মিলে মোনাজাত করবে পূর্ব পুরুষের জন্যে। কিন্তু না তুমিতো অভিমান করে আছো, শত ডাকলেও তুমি আসবে না। কোন দিন আসবে না। তুমি আমাদের আদর্শ, তুমি আমাদের প্রেরণা, আমাদের নির্দেশনা।

পাপিষ্ট, নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু ঐ ঘাতকেরা অস্ত্রের আঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছে তার মাথা ও মুখমন্ডলকে। অভিশপ্ত নরপিশাচের দল ওর মাথাটাকে থেতলে কুপিয়ে সবটুকু রক্ত নিংড়িয়ে নিয়েছে। সোনামানিক ঘুমিয়ে আছে আমাদের এই গোরস্থানে শান্তভাবে। জীবনভর ঘুমের বাঁধনে বেঁধে রাখবো আমাদের এই নীরব ছোট গোরস্থানে। ওরে নির্দয় হতভাগা প্রেতাত্মারা, তোমরা কি জানোনা শক্তিমত্তার প্রচন্ডতায় হত্যা করে চির-শাশ্বত ইসলামের সৈনিকের মিশনকে ব্যর্থ করা যায় না। বরং আত্মনিবেদিত প্রাণ পুরুষের অন্তর জমীনে শহীদী বীজ অংকুরিত হয়ে শাখা প্রশাখা আর ফলে ফলে বিকাশের মাধ্যমে চরম উৎকর্ষতার পরম আনন্দে আন্দোলিত হওয়ার অনন্য সুযোগ পেয়ে থাকে। মহান প্রভুর বানী শোন "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। আসলে তারা মৃত নয়, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা জাননা। শহীদ রফিকের জীবনকে ব্যর্থ করতে পারনি তোমরা। সে সফল কাম হয়েছে। তার জীবন বাগানের আজ বসন্তের সম্ভারে ভরপুর। জান্নাতের ফুল কলিরা ওর পরশ পেয়ে মাতোয়ারা। ওর জন্যে আল্লাহর

www.pathagar.com

তরফ থেকে সবকিছুর আয়োজন হয়েছে একেবারে জীবনের প্রত্যুষ মুহূর্তে। ওর অনাবিল সুখের রাজ্যে একটুও অভাব নেই।

এই সুখী জীবন লাভের অদম্য বাসনায় উদ্দীপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কত পাগলপারা সাধক সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উৎসাহিত হয়ে শহীদী কাফেলার এই ঈর্ষান্বিত মিছিলে শরিক হতে চেয়েছেন। আকাংক্ষা হচ্ছে, ঈর্ষা হচ্ছে নিরুপম সৌন্দর্যে ভরা জান্নাত প্রাপ্তির এই সংগ্রামী পথে আল্লাহর রাহে শহীদ রফিকের মত জীবন কুরবান দিয়ে অপার সুখময় এমন জীবনের সাথে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য যদি হতো আমার জীবনে! মনে পড়ে যখনই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছিলাম যখন তখন শহীদ রফিক, মহসিন আল-মামুন, আমীন ও সাইফুল ইসলামের মতোই জীবনের আশায় ক্রন্দনরত হয়েছি এবং শপথ নিয়েছি। কিন্তু সৌভাগ্য হয়নি এপথে সেই সুখময় জীবন লাভের। আল্লাহ পছন্দ করেনি এই পাপ পঙ্কিল জীবনটাকে। যাকে পছন্দ করেছে সে চলে গেছে আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে যে কোন দিন ফিরে আসবে না আমাদের মাঝে।

মনে রেখ রক্ত পিপাসু ঘাতকের দল দুর্দান্ত প্রতাপ তোমাদের চির দিন থাকবে না। মায়াময় এই পৃথিবী তোমাদেরকে চিরদিন ধরে রাখবে না। অপেক্ষা কর সময় আসবে শহীদের রক্ত কথা বলবে। আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের একদিন হাজির হতে হবে, ন্যায় বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সেদিন মদনডাঙ্গা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি গাছপালা, ধুলিকনা, সুরম্য অট্টালিকা, সবুজ ঘাস, পাখিরা আর রফিকের রক্ত মাখা দেহ বহনকারী এ্যাম্বুলেন্সটি তোমাদের সেই নারকীয় হত্যা ঘটনার সত্য সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের সেই অস্ত্র ও হাত কথা বলবে সাক্ষ্য দেবে তোমাদের বিরুদ্ধে। অপেক্ষা কর! দেখা হবে, কথা হবে তোমাদের সঙ্গে আল্লাহর আদালতে।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট ফরিয়াদ করি, হে আল্লাহ তুমি রফিকের শাহাদাতকে কবুল ও মঞ্জুর কর। শহীদ রফিকের রেখে যাওয়া ইসলামী সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কাজকে তাঁর সাথীরা যাতে বাস্তবায়ন করতে পারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলার জমীনে সেই তওফিক দান করুন। তাঁর রেখে যাওয়া ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশে যেন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয় এই কামনা করি। আমাদের পরিবারের সকলকে দান কর ইহকালীন কল্যাণও পরকালীন মুক্তি। আমীন!

www.pathagar.com

শহীদ রফিক, কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

মোঃ খলিলুর রহমান
(শহীদ রফিকের বড় ভাই)

শহীদ রফিক। ডাক নাম টুনু। গ্রামাঞ্চলে সবাই ওকে টুনু বলে ডাকতো। টুনু, ভাই বোনদের মধ্যে ছিল ২য়। আমি ছিলাম সবার বড়। রফিক আমার চেয়ে মাত্র দু,বছরের ছোট ছিল। ছোট বেলায় লেখা-পড়া, খেলা-ধুলা ও খাওয়া-দাওয়া আমরা এক সাথেই করতাম। চাচাত ভাই মালেক ও ছিল নিত্য দিনের সঙ্গী। এ তিন জনের পোশাক পরিচ্ছদ ও একই ধরনের হতো। এ ছাড়া আব্দুল্লাহ ও রবিউল বাশার (ই, বি. সেক্রেঃ) আমাদের সাথে থাকতো।

আমি, রফিক, মালেক আব্দুল্লাহ এবং রবিউল বাশার এ পাঁচ জনের মধ্যে ছিল দারুন মিল। আমরা একই মনমানসিকতা বিশিষ্ট হওয়ার কারনে লেখা-পড়া, খেলা-ধুলা সহ সব কিছুই এক সাথেই করতাম। ইসলামী ছাত্র শিবিরে যোগ দিয়েছিলাম সবাই এক সাথে। প্রথমে আমি সাথী ১৯৯১ সালে। আমি সাথী হবার পর প্রতিযোগিতা লেগে গেল। প্রথমে রবিউল ও টুনু সাথী হয়। আব্দুল্লাহ ও মালেক সাথী হয় একটু পরে।

সদস্য হবার দৌড়ে রবিউল ও রফিক ছিল অগ্রে। মালেক শপথ নেয় একটু পরে। আমার এবং আব্দুল্লাহর পক্ষে সদস্য শপথ গ্রহন সম্ভব হয়নি।

টুনুর (রফিকের) ছোট বেলার কথায় আসি। ছোট বেলায় ও একটু দুরন্ত প্রকৃতির ছিল। তবে সৎ সাহস সত্যবাদিতার ব্যাপারে ওর খুব সুনাম ছিল। সব সময় এক সাথে থাকার কারনে আমার সাথে ঝগড়া ও মারা মারি কম করতো না। আমি সব সময় ধৈর্যের

www.pathagar.com

পরিচয় দিতাম বলে ঝগড়া বেশী দুর গড়াতো না। দুজনের মধ্যে যেমন ঝগড়া হতো তেমনি ছিল দারুন মিল। কোথাও বেড়ানোর সময় রফিক আমার পিছু ছাড়তো না। আমিও ওকে ফেলে যেতাম না।

টুনুর (রফিকের) গায়ের রং ছিল কালো। ওর মত কালো আমাদের পরিবারে আর কেই ছিল না। মজা করার জন্য কেউ কেউ বলতো তুই এ বাড়ীর সদস্য না। বন্যার সময় তোকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। এ কথা বললে ও খুব ক্ষেপে যেত। মন কষ্টে কেঁদে ফেলতো। সত্যি রফিক এখন আমাদের বাড়ীর সদস্য নয়। জান্নাতি পরিবারের সদস্য হয়ে অবিস্মরনীয় হয়ে রইলো। রফিক দুরন্ত প্রকৃতির থাকলেও ছাত্র শিবিরের এসে তার জীবনে দারুন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শহীদ রফিকের সাংগঠনিক জীবন বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে গোলাপের মত সুন্দর ও স্বচ্ছ জীবন। ছাত্র শিবিরের সাথী হবার পর থেকে তাকে কখনো অন্যায় কাজ করতে দেখা যায়নি। তার দ্বীন দারিতা, খুলুসিয়াত, স্পষ্ট বাদিতা। পরিশ্রম প্রিয়তা এবং অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা দেখে আমি বিস্মিত হতাম। আল্লাহর জমিনে তার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকতে দেখেছি ওকে। সব সময় নিরলস ভাবে আন্দোলনের কাজ করে যেত। দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ এবং অবসাদ তার জীবনে আসতো না। সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকার কারনে বাড়ীতে কম আসতো। মাঝে মাঝে দু এক দিনের জন্য বাড়ী আসতো কিন্তু বিশ্রাম করতো না। বাড়ীর ছোট খাটো কাজ গুলো নিজ হাতে করতো।

ছোট ভাইবোনদের অত্যাধিক আদর করতো রফিক। বাড়ীতে আসার সময় ছোটদের জন্য অনেক উপহার নিয়ে আসতো। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক, পারিবারিকসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে করতে অনার্স শেষ করে করে মাষ্টার্স চুড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা দিয়ে চললো রফিক। আর মাত্র ৪টি পরীক্ষা বাকী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি হওয়াতে রফিক ৯ই জুন বাড়ী আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গাজা খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র শিবির ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে ছোটো খাটো সংঘর্ষ হলো ৬ই জুন। ৭ই জুন ২০০১ ই,বি, প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষনা করলেন। ৮ই জুন শুক্রবার শিবির-জাঃ ছাত্রলীগের বিরোধ মিমাংসার জন্য শিবির নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জাসদ নেতা ও সাবেক সাংসদ দবির জোয়ার্দার সহ জাসদ নেতাদের সাথে আলোচনায় বসার কথা ছিল। সে মতে ই,বি শিবির সভাপতি রাসেল, জিল্লুর ও রফিক সহ ৮/১০ জন শিবির নেতা মদন ভাংঙার কামাল মেসে অবস্থান করছিল। জুম্মার নামাজ বাদ দুপুরের খাবার গ্রহন শেষের দিকে সংবাদ আসলো শিবিরের নেতাদের উপর আক্রমন করা হবে। সংবাদ আসার অল্পক্ষনের মধ্যে জাসদ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হায়েনার মত শিবিরের ছাত্রদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। রাসেল, জিল্লুসহ অন্যরা স্থান ত্যাগ করতে পারলেও রফিককে সন্ত্রাসীরা ধরে ফেলে। রামদা হাতুড়ী দিয়ে মাথা চুর্ণ বিচুর্ণ দিল সন্ত্রাসীরা। মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা চলে গেলে শিবিরের ভাইরা রফিককে ঝিনাইদহ হাসপাতালে ভর্তি করালো। ততক্ষণে

www.pathagar.com

আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের অমীয় পেয়ালা পান করলো শহীদ রফিক। বিক্ষোভে ফেটে পড়লো শহীদের সাথীরা। ঝিনাইদহ সহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল হলো। পরের দিন শনিবার ঝিনাইদহে বিশাল সমাবেশ ও জানাজা শেষ করে শহীদের কফিন গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরা লাঙ্গল দাড়ীয়া গ্রামে আনা হলো। পথে বাগআচড়া, সাতক্ষীরা রাজ্জাক পার্ক এবং আশাশুনি বাজারে হাজার হাজার মানুষের অংশ গ্রহনে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদের কফিন বাড়ী আনার পর এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা হয়। রফিকের আব্বা, আম্মা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সহ এলাকাবাসীরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না। সবাই বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। প্রতিবাদ করার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে গেল সকলের। নারী, পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম শহীদ রফিককে এক নজরে দেখার জন্য পাগল প্রায় হয়ে গেল। শোকাহত মানুষের ভীড় উপেক্ষা করে শহীদের আম্মা নিজের ছেলের মুখটা শেষ বারের মত কাছে যেয়ে দেখতে পারলেন না। আমার আম্মা তার ছেলে কাছে যেয়ে না দেখার অতৃপ্তি যেমন বেদনা দেয়। ঐ দৃশ্যের কথা মনে উঠলেই আমারও ভীষন কষ্ট হয়। শহীদের বাড়ী ঈদগাহে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ৫ম ও শেষ বারে সমাবেশ ও জানাজা সমাপ্ত হয়। জানাজায় ঈমামতি করেন শহীদ রফিকুল ইসলামের পিতা মাওঃ সাইদুর রহমান। জানাজা শেষে নিজ হাতে দাফন করলাম আমার সহদর ভাই রফিককে। রফিককে কবরে রাখার সময় আমার হাতে যে রক্ত লেগেছিল তা আজ ও হাতের তালুতে অনুভব করি।

ইসলামের শত্রুরা মনে করেছিল রফিককে সরাতে পারলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিবিরকে উৎখাত করা যাবে তথা ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শাহাদাত, জেল, জুলুম, হুলিয়া ইত্যাদি অপচেষ্টা ইসলামী আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয় না বরং আন্দোলনকে আরো বেগবান করে। শহীদ রফিকের অসমাপ্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য লক্ষ-লক্ষ মদ্দে মুজাহিদ প্রস্তুত। শহীদের সাথীরা দুর্বার গতিতে কাজ করে মনজিলে মাকসুদে পৌছাবেই ইনশাআল্লাহ।

১৯৫২ সালে এক রফিক জীবন দিয়ে মায়ের ভাষা ফিরিয়ে এনেছিল। আমার বিশ্বাস একবিংশ শতাব্দির দ্বার প্রান্তে এসে আরেক রফিক ইসলামের জন্য জীবন দিল। অতএব একবিংশ শতাব্দির বিশ্ব হবে ইসলামী বিশ্ব এটাই সকলের প্রত্যাশা।

পরিশেষে শহীদ রফিক সহ সকল শহীদদের শাহাদাত কবুলিয়াতের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করি। আল্লাহ আমাদের পরিবারের সকলকেই উত্তম ধৈর্য ধারন করার তাওফিক দিন। আমিন।

www.pathagar.com

ভুলতে পারিনা শহীদ রফিককে

মোঃ আব্দুল গাফফার
(শহীদ রফিকের চাচাত ভাই)

যে মানুষটিকে আমি আমার চলার পথে দিক নির্দেশক বলে মনে করতাম তাকে নিয়ে আজ স্মরণীকা লিখতে হচ্ছে কথাটি ভাবতেই কান্নায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। শহীদ রফিকের সহিত আমার আত্মার কত মিল ছিল তা আমি বলে বা লিখে বুঝাতে পারব না। শুধু এতটুকু জানি শহীদ রফিক আর আমি শাহাদাতের সাত আট মাস পূর্বে আমরা দুজনে এক বোনের বাড়ীতে গিয়েছিলাম বাই সাইকেলে। বোনের বাড়ী থেকে বেরুতে সন্ধ্যে হয় এবং পথিমধ্যে আমাদের সাইকেলের চাকা লিক হয়ে যায় সন্ধ্যার পরে রাস্তায় সাইকেল ঠিক করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমরা হাটতে শুরু করি। কিন্তু মাঝ পথে এসে শহীদ রফিক আর হাটতে পারে না। ওকে আমি সাইকেলের পিছনে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে আসি এবং যেখানে বাজার ও বেশী লোকজন থাকে সেখানেও নেমে যায় আর বলে লোকজন দেখলে কি বলবে? এই ঘটনা যখন মনে পড়ে তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারিনা। স্মৃতির যে অংশ বেদনার অশ্রুজলে বার বার সিক্ত হয় সেখানেই শহীদ রফিকের অবস্থান। শহীদ রফিক এখন শুধু স্মৃতি, হাতড়ে খুঁজে ফিরি তোমাকে। বুকের ভিতর বিশাল শুন্যতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন মনে হয় তুমি আমার থেকে অনেক দুরের অজানা লোকে। তোমার সাথে আমার এক সংগে চলার দিনগুলো এখন কষ্টের আর্তনাদে মুহ্যমান হয়ে পড়ে প্রতি নিয়ত। আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ রফিক আর নেই। একথা বিশ্বাস করতে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ স্তব্ধ হয়ে

www.pathagar.com

যায়। রক্ত স্নাত কাফেলার যোগ্য উত্তরসুরী হয়ে পরপারে চির প্রশান্তির ভুবনে চলে গেছেন যে মানুষটি নাম তাঁর শহীদ রফিক।

এখন আর দেখতে পাব না আমাদের প্রিয় ভাই রফিক। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি হয়ে চলে গেছেন সে। ইসলামী আন্দোলনের বেগবান সৈনিক হিসেবে তার দীপ্ত পদচারণা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পাওয়া যাবে না দ্বীন প্রতিষ্ঠার মুজাহিদ ঝরে যাওয়া একটি সম্ভাবনাময় সূর্য সন্তান শহীদ রফিক। আমার বিশ্বাস তুমি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েও চির প্রেরণায় জলন্ত উৎস হয়ে থাকবে। শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জিবীত শহীদ রফিকের নাম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। শহীদ রফিক সম্পর্কে কোন কিছু লিখতেগেলে আমার শব্দগুলি কেমন যেন স্তিমিত হয়ে যায়। শহীদ রফিকের মত কাছের মানুষ আমার আর কেউ ছিল না। রফিক ভাইকে ভাবতেগেলেই সুপ্ত হৃদয়ে তপ্ত আগ্নেয়গিরির ভালবাসার হাতছানি দিয়ে চলে যায়। আর ফিরবে না বলে। একটা হৃদয়াক্তিক স্বকীয়তায় ভ্রাতিত্বের এত বড় মায়া জাল আর কার ও সাথে গড়ে উঠবে না কখনও। সর্বশেষে তৎকালিন আওয়ামী দুঃশাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে পবিত্র কোরানের আইন প্রতিষ্ঠার একনিষ্ট সৈনিক রফিক কে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। যা দেশ জাতির জন্য এক কলংকজনক অধ্যায়। তাই ভবিষ্যতে আর কোন ভাইকে রফিক ভাইয়ের মত হারাতে না হয়। সেজন্য শহীদ রফিকের স্মৃতিকে সামনে রেখে দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে পবিত্র কোরানের আইন প্রতিষ্ঠার ও আমরা সবাই এই শহীদি মৃত্যুকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভুষিত করুক এটা কামনা করি।

www.pathagar.com

শহীদ রফিকের

বড় বোন হালিমা খাতুন

ভাইয়া তুমি তোমার সেরা সাফল্য অর্জন করেছ কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের ভাইয়াকে। তুমি কি জান আমাদের ভাইয়া বলে ডাকার মত আর কেউ দুনিয়াতে থাকল না। সেই দিনের দুঃখময় স্মৃতিকে আমি মাঝে মাঝে একেবারে সহ্য করতে পারি না। মেনে নিতে পারি না। চিরন্তন সত্যকে। তবু যেভাবেই হোক আমাদের পথ চলা থেমে নেই। এভাবে আমরাও মৃত্যুকে এড়াতে পারব না। আর এই কঠিন মুহূর্তে ভাইয়া আমাদেরকে হাত বাড়ীয়ে গ্রহন করবে সেই দিনই আমি সব চেয়ে সুখী হব। নিজের ভাইয়াকে হারিয়েছি এটা বড় মর্মান্তিক বেদনা দায়ক, হিমালয় পাহাড়ের চেয়ে ভারী। এটা যে কেবল বুঝতে পেরেছি আমি। ভাইয়ার এই ত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছে জান্নাতের নিশ্চয়তা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না নিশ্চয় তারা জীবিত'। (আল কোরআন) আমার ভাইয়া আমার বিয়ের পর আমি শশুর বাড়ী যাই এবং তিন দিন পর আমার ভাইয়া আমাকে নিয়ে আসার জন্য যায়। তখন আমার শাশুড়ি ভাইয়াকে ফিরিয়ে দেয়। ঐ দিন আমার ভাইয়া ফিরে আসে এরপর দুই দিন পর আবার যায়, যেয়ে আমার শাশুড়িকে বলে আম্মা আমরা নয় ভাই-

www.pathagar.com

বোনের মধ্যে কেউ বাইরে থাকিনা তাই আমরা হালিমাকে রেখে থাকতে পারছি না, এই বলে আমাকে নিয়ে আসে। কিন্তু সেই নয় ভাই বোনের মধ্যে সর্ব প্রথম আমার ভাইয়া হারিয়ে গেছে, তাই আমাদের থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে প্রতিটি, দিন প্রতিটি রাত। এমন নেই যে ভাইয়ার কথা মনে হয় না। যখন খুব বেশী অস্থির হয়ে যাই ভাইয়ার জন্য তখন কোরআন শরীফ পড়ি, খতম দেই এবং দোয়া করি, 'হে আল্লাহ আমার ভাইয়ার শাহাদাত কবুল করে নাও এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর'। আমরা কোন না কোন দিন মারা যাব কিন্তু আমরা কি আমার ভাইয়ার মত জান্নাতের অধিকারী হতে পারব? হে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা আমার ভাইয়ার মত জান্নাতের অধিকারী হতে পারি।

www.pathagar.com

শহীদ রফিকের

সেঝ বোন জাহীদা

আমার স্মৃতি পটে গেঁথে রয়েছে অনেক কথা যা কোন দিন ভুলব না। ভাইয়া তুমি যেদিন বাড়িথেকে চলে গিয়েছিলে। সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম ভাইয়া তুমি আবার কবে বাড়ি আসবে। ১৬ই মে আমাদের আলিম পরীক্ষা শুরু হবে। তুমি আমার পরীক্ষা দেখতে আসবে না। তখন তুমি বলেছিলে আমার তো মে মাসে পরীক্ষা হবে। তো যদি সুযোগ পাই তাহলে এসে তোমার পরীক্ষা দেখে যাব। আমি মনে করেছিলাম ভাইয়ার পরীক্ষা ভাইয়া হয়তো আসতে পারবে না। কিন্তু ৪-৫ টা পরীক্ষা হয়ে গেলে একদিন রেজাউল ভাই আমার পরীক্ষা দেখতে এসেছিল। এসে আমার সংবাদ দিল বলল তোমার ভাইযা ৮ই জুন তোমার পরীক্ষা দেখতে আসবে। আমি শুনে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সবার সাথে বলতাম আমার ভাইয়া ৮ই জুন আমার পরীক্ষা দেখতে আসবে। তুমি আসবে এজন্য আমি অধীর অপেক্ষায় তোমার পথ পানে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু সেদিন ৮ই জুন আসলো সেদিন সারা বেলা তোমার আসার অপেক্ষায় ছিলাম। যখন দুপুর পেরিয়ে গেল বিকাল আসলো তখন মনে মনে ভাবছি এবার ভাইয়া আসবে। কিন্তু বিধাতার কি নির্মম পরিহাস। আছরের নামাজ পড়ে উঠে তোমার খবর পেলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারি হয়েছে এজন্য তোমার গায়ে গুলি লেগেছে শুনে আমার মনে এতো আঘাত লাগলো সে

www.pathagar.com

কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবোনা। তার খানিক পরে শুনতে পেলাম তুমি শাহাদাত বরণ করেছো। সত্যি ভাইয়া তুমি ওয়াদা পুরন করেছিলে। ৮ই জুন তুমি বাড়ি ফিরে এসেছিলে কিন্তু তুমি জীবিত আসোনি। তুমি শহীদ হয়ে ফিরে এসেছিলে। ভাইয়া তোমার শাহাদাতের কথা শুনে আমি আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। মনের অজান্তেই দুচোখের পানিতে বুক ভেসে গিয়েছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তেও তুমি ওয়াদা পুরুন করেছো। পরীক্ষা দিতে কয়টা বাকী ছিল। কিন্তু তুমিতো জীবনের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেছো। তুমিতো শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছ। ভাইয়া তুমি যেখানেই অন্যায় দেখতে সেখানেই ছুটে যেতে প্রতিবাদ করতে। তুমিতো অন্যায়কে মোটেও সহ্য করতে পারতে না। তেমনি ভাইয়া তোমার মাঝে অনেক মহৎ গুনের সমাবেশ ও ঘটেছিল। তুমি ছিলে গরিবের বন্ধু। তোমার এই ছোট জীবন পরিসরে অনেক অনাথের সেবা করেছো। তাইতো তুমি খোদার প্রিয় বান্দা হয়ে গেছ। সবই বুঝি সবই জানি তবু ধিক্কার দিই সেই অশুভ শক্তির যুবকদেরকে। মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদে যাদের চোখে পানি আসেনা। যারা ক্ষমতার বলে বহু কষ্টে লালন পালন করা সন্তানের রক্ত নিয়ে হোলি খেলে। যে দেশে প্রতিদিন হতভাগীনি মায়েরা তাদের সন্তানের মৃত্যু সংবাদ শুনে অশ্রু বিসর্জন করে। সে দেশের লাখো লাখো ধর্ম প্রাণ মানুষের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সোচ্চার হন সেই সব হায়েনাদের বিরুদ্ধে যেন আর কোন মায়ের বুক এভাবে খালি না হয়।

www.pathagar.com

শহীদ রফিকের ৫ম বোন

সাহিদা

সেদিন ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে আমার ভাইয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। আর ফিরে আসেননি। আমার ভাইয়াতো চলে গেছেন সুন্দর ভুবনে সেখানে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক শহীদি মিছিলে। ভাইয়া আমাকে নিয়ে এক সাথে খেতেন। আমাকে বিভিন্ন গল্প শুনাতেন। ভাইয়া আমাদেরকে সত্য কথা বলার উপদেশ দিতেন। কখনো মিথ্যার আশ্রয় দিতেন না। আমি কোন অন্যায় কাজ করলে বুঝিয়ে বলতেন। সকাল হলে ঘুম থেকে উঠিয়ে নামাজ পড়তে বলতেন। আমাকে নিয়ে পড়াশুনা করাতেন। ভাইয়া আমাকে জামা কাপড় কিনে দিতেন। আমি ভাইয়ার কাছে যা আবদার করতাম ভাইয়া আমাকে তাই কিনে দিতেন। কিন্তু আজ আমাকে কেউ এভাবে আদর করবেনা। এই সব কথা মনে পড়লে আমার কান্নায় বুক ফেটে যায়। আমার মনে হয় যেন আমার ভাইয়া বেঁচে আছেন। মরেননি। আমাদের ৯ ভাই-বোনের মধ্যে আমার ভাইয়া আমাকে বেশি যত্ন করতেন। আমার কোন দিন নাম ধরে ডাকতেন না। আমাকে আপু বলে ডাকতেন। আমার ভাইয়া বাড়ি এসে আমাকে বলতেন। আপু তুমি আর কয়টা দিন দেরি কর জাহিদা সাজিদার বিয়ে হয়ে গেলে। তোমার আমি গলার চেইন তৈরি করে দেব। তুমি এখন কারও কাছে বলিও না। আর আমি এই তারিখ বাড়ি আসার সময় তোমার জন্য

www.pathagar.com

চামড়ার জুতা নিয়ে আসবো। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আমার ভাইয়া আর নিয়ে আসলো না। আমার ভাই যখন বাড়ি আসতেন। কোন কিছু নিয়ে আসলে তা আমার কাছে দিতেন। ৯ই জুন আমার পরীক্ষা তাই আমি ৮ই জুন সন্ধ্যায় পড়তে বসি। এমন সময় শুনি ইসলামের শত্রুরা আমার ভাইয়ার জীবন কেড়ে নিয়েছে। যখন তোমার শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনলাম সেদিন আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল কান্নায়। কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোটা পানিও পড়েনি। তখন মনে পড়তে লাগলো। তোমার সমস্ত দেয়া আদর মমতা ভালবাসার প্রত্যেকটি কথা। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, তুমি এমন করে চলে যেতে পার? পার না। কেন তুমি বলে গেলে না আমি এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছি। এ কথাটি তাহলে আমি তোমার উজ্জ্বল দুঃখময় সুন্দর মুখ ও সুন্দর হাসিটুকু শুধু একবার প্রাণ ভরে দেখতাম। তোমার অকাল মৃত্যু আমার অন্তর ব্যাথিত করে ঠিকই আবার যখন আল্লাহর এই ঘোষণা মনে পড়ে যে 'শহীদি আত্মা মরে না, সে অমর আর শহীদের পরিবার আত্মীয় স্বজন সবাই শহীদের সাথেই জান্নাতে যাবে'। তখন শান্ত হই, ধৈর্য্য আসে। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমার ভাইয়ার শাহাদাত কবুল করে নাও এবং জান্নাতুল ফেরদৌস তাকে দান কর। আমরা সবাই কোন না কোন দিন মারা যাব কিন্তু আমরা কি আমার ভাইয়ার মত জান্নাতের অধিকারী হতে পারবো? আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা আমার ভাইয়ার মত জান্নাতের অধিকারী হতে পারি।

www.pathagar.com

মোঃ আবু ইউছুফ

শহীদ রফিকের ছোট ভাই

আমার মেজ ভাই শাহীদ রফিক, আমার ভাইয়ের কথা এমন কোন দিন বা রাত্র নেই যে, আমার বুকে আঘাত হানেনা, যখনই মনে পড়ে তখনই শুধু নিশব্দে চোখ দিয়ে পানি বাহির হয়। তাঁর মত একজন নামাজী, সদ্য ব্যবহার আত্মত্যাগী, রসিক, মুখমিষ্ট, এবং নীতিবান লোক এ সমাজে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তো সবার উর্ধে। তিঁনি সব কিছু জানেন সবই তাঁর ইচ্ছা। মেজ ভাইকে একদিন আমি বললাম, ভাই মেজ চাচার তো জমি অনেক তার তো ছেলে মেয়ে বউ কেহই নেই। মেজ চাচা মারা গেলে ফুফুরা তো জমির ভাগ থেকে লিখে নিলে হয়না। মেজ চাচা আমাদের জমি লিখে নেওয়ার জন্য বলত। তখন আমার মেজ ভাই আমাকে বলেছিল ওসব ফাঁকি ফুঁকির মধ্যে নেই, অন্যায় ভাবে কোন কিছু করা যাবেনা। পরের জিনিসের প্রতি কোন প্রকার লোভ ছিল না। আরেকদিন আরেকটা জমির ব্যাপারে আমি বলেছিলাম যে মেজ ভাই চাচার একটু বললে হতনা যে ঐ শহরের জমি থেকে আমাদের কিছু লিখে দেয় কিনা। তখন উত্তরেণ মেজ ভাই বলেছিল অত লোভ কেন তোর? আল্লাহ দিলে পরে সব কেনা যাবে। আমার একটু ছোট বেলা থেকে লোভ এবং মেজ ভাইয়ের মধ্যে সেটা ছিল না। মেজ ভাই ছিল স্পষ্ট ভাষী, একদিন আমরা সবাই কোরান শরীফ পড়ছি। তখন আমি মনে মনে অর্থাৎ খুবই নিঃশব্দে দ্রুত কোরান শরীফ পড়তে ছিলাম আর মেজ ভাই পড়তে ছিল স্পষ্ট করে একটু শব্দ করে। মেজ ভাই এর চেয়ে যখন বেশি পড়া হয়েছে আমার তখন আমাকে বলল এই ফাঁকি দিয়ে পড়িসনা একটু স্পষ্ট করে পড়।

www.pathagar.com

শহীদ রফিকের ছোট বোন

মিস মাসকুরা পারভীন
৪র্থ শ্রেণী

আমার ভাইয়া শহীদ, তিনি কবরে শান্তিতে আছেন। ভাইয়ার আদর আর পেলাম না। তিনি আমাকে যেমন আদর করতো তেমন করে আর কেউ আদর করে না। ভাইয়াকে কোথাও খুজে পাইনা। আমি যেখানে যাই সেখানে মনে হয় ভাইয়া আছে কিন্তু তিনি তো অনেক দুরে আর কোন দিন ভাইয়ার সাথে দেখা হবে না, আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভাইয়ার সাথে বেহেস্তে বসবাস করার তৌফিক দান করুন। আমার মেঝ ভাই রফিকুল ইসলাম।
কামনায়–

শহীদ রফিকের ছোট বোন
মিস মাসকুরা পারভীন
৪র্থ শ্রেণী

www.pathagar.com

শহীদ রফিকের চতুর্থ বোন

সাজিদা সুলতানা

আমার মেঝ ভাইয়া শহীদ রফিকুল ইসলাম। তিনি আমার স্মৃতি পটে অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন চিরকাল। এমন কোন দিন বা রাত্র নেই যে দিন আমার মেঝ ভাইয়ার কথায় বুকে ব্যথা পাই না। আর যখন মনে পড়ে সেই দিনের কথা তখন শুধু চোখ দিয়ে অশ্রু বাহির হয়। তিনি খুব সাহসী ও সত্যবাদী ছিলেন। ১৯৯৭ সালে আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমি এপিন্ডীস অপারেশন হই। অপারেশনের সময় মেঝ ভাইয়া এবং আমার বড় আপার মেয়ে জাকিয়া খালার সাথে ডাক্তারের বাসায় যাই। ডাক্তার যখন আমাকে দেখলো এবং বললো রুগির অভিভাবক কে। তখন ভাইয়া বললো আমি। আমি ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম আব্বা আসবে না? তখন ভাইয়া বললো আমিতো আছি আব্বার কি প্রয়োজন। অপারেশনের সময় হলে ভাইয়া আমাকে এমন শান্তনা দিল, যে আমি কোন ভয় পাইনি। অপারেশন শেষ হলে ভাইয়া নিজ হাতে আমাকে ফলের রশ করে খেতে দিতেন। এবং দু, তিন দিন পরে ভাইয়া কুষ্টিয়া যায়। কুষ্টিয়ায় যেয়ে তিনি একজন গরীবের ছেলেকে রক্ত দিয়ে আসলেন। তখন আম্মা ভাইয়াকে বললো সাজিদার তুমি একটু রক্ত দিলেনা, অন্য লোকের রক্ত দিলে কেন। তখন ভাইয়া বললেন তাতে কি হয়েছে আম্মা। সাজিদা তো সুস্থ্য আর যদি রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে দেয়া যাবে। যখন

www.pathagar.com

এই স্মৃতি মনে পড়ে, আমি তখন চোখকে স্থির রাখতে পারিনা। ভাইয়া যেমন আদর করতেন আমাদের আবার তেমন শাসনও করতেন। ভাইয়ার মত আর কেও আদর করেনা। ২০০১ সালে এপ্রিল মাসে যে দিন ভাইয়া শেষ বার বাড়ি থেকে চলে যায়, সে দিন সাহিদা ও আমি মাদ্রাসায় যাই, তখন ভাইয়া আমাদের ডেকে বললো আমি তো বাড়ি থেকে চলে যাব। তখন আমরা বললাম আবার কবে বাড়িতে আসবেন ভাইয়া। ভাইয়া বললেন আগামি মাসে আসার জন্য চেষ্টা করবো। তিনি ঠিকই আগামী মাসে বাড়ি আসলেন, কিন্তু তিনি সাধারণ ভাবে আসলে না। তিনি আসলেন শহীদ হয়ে। সেই দিনের দুঃখময় স্মৃতিকে আমি মাঝে মাঝে সহ্য করতে পারি না। মেনে নিতে পারি না চিরন্তর সত্যকে। তবুও যে ভাবেই হোক আমাদের পথ চলা থেমে নেই। এভাবে আমরাও মৃত্যুকে এড়াতে পারবো না।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যারা আমার ভাইয়াকে আমাদের কাছ থেকে, আমার আব্বা-মার, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ যেন ঈমান দেন অথবা এই জমিন থেকে ধুলিষাৎ করে দেন।

আমার ভাইয়ার মত শাহাদাত প্রাপ্তির কামনায়।

শহীদ রফিকের চতুর্থ বোন
সাজিদা সুলতানা

www.pathagar.com

যে স্মৃতি আজও কাঁদায়

মোঃ রেজাউল ইসলাম রেজা

পুষ্প আপনার জন্য ফোটেনা। মানুষের হৃদয়, আবেগ ও অনুভূতিকে আন্দোলিত করাই ফুলের স্বার্থকতা। যদি কেউ একটি ফুল অংকুরিত হওয়ার আগেই নষ্ঠ করে দেয় তবে সেটা নেহায়াত দৃষ্টিকটু, আবেগ ও অনুভূতি বহির্ভূত বৈকি।

শহীদ রফিক তেমনি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের নাম। যে গোলাপটি বিকশিত হওয়ার আগেই সুন্দর বিদ্বেষীরা অংকুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছে।

শহীদ রফিক আমার দীর্ঘ্য ১৫ বৎসরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধু সহপাঠী। সেই ১৯৮৭ সালে ৭ম শ্রেণীতে পড়ার সময় দুজনের প্রথম পরিচয়। আর প্রথম পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। দুজনার মাঝে এমন বন্ধুত্ব ছিল যে মানুষে আমাদের "মানিক জোড়" "জোড়ের কবুতর ইত্যাদি দিয়ে সম্বোধন করত। সেই ৭ম শ্রেণী থেকে এম.এ পর্যন্ত একই সাথে থেকেছি, পড়েছি। মাঝে মাঝে দুজনার মধ্যে হালকা অভিমান হলেও রাতে আবার এক বিছানায় একে অপরকে গলা জড়িয়ে ধরে অভিমান ভাঙ্গাতাম। আমাদের এই বন্ধুত্বের দীর্ঘ্য সময়ে দুজন যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি তার জন প্রিয়তা, ছোট বড় সবাইকে সে অল্প সময়ের ব্যবধানে আপন করে নিতে পারত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বৎসর লস করার কারণে আমি হয়ে গেলাম ১ বৎসরের সিনিয়ার। আমি ১ বৎসর সিনিয়ার হওয়ার পরও দেখেছি ভর্তি হওয়ার পর পরই তার নজির বিহিন জনপ্রিয়তার ঢল। মাঝে মাঝে আমার হিংসা হতো আমি সিনিয়র হওয়ার পরও আমাকে কয়টা মানুষ চেনে? তাই রফিককে বলতাম-"রফিক লেখা পড়ায় তুই আমাকে

www.pathagar.com

হারাতে না পারলেও মানুষের ভালবাসা পাওয়ার দিক থেকে আমাকে শুন্যে রেখেছিস।
দীর্ঘ্য ১৫ বৎসরে আমি দেখেছি শহীদ রফিক সব সময় অন্যায়ের বিরদ্ধে একটি চরম দ্রোহ। অন্যায়কে সে কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। আমি বলতাম রফিক সমাজের সকল অন্যায় দুর করার দায়িত্ব তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কি প্রয়োজন মানুষের সাথে ঝামেলায় যাওয়ার?" জবাবে বলত অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তুই ঝামেলা মনে করিস? আমার সমর্থানুযায়ী আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করব। তোর ভাল না লাগলে বা সাহস না হলে তুই করিসনা।" এটাই ছিল তার বিশ্বাস। এমনকি আমিও যদি কোন অন্যায় করে ফেলতাম তবে সাথে সাথে প্রতিবাদ করত। বন্ধু বলে ক্ষমা করতনা। এমন একটা সুন্দর মনের বন্ধুকে আর কখনো কি ফিরে পাবো?

এইতো সেদিন শাহাদাতের মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম ই.বিতে তখনও আমার মাষ্টার্সের রেজাল্টা হয়নি এবং রফিকের মাষ্টাসের পরীক্ষা প্রায় শেষ পযায়ে। পরিচিত অনেকেই দাওয়াত করে খাওয়াবে বলে আগ্রহ প্রকাশ করছে ইতিমধ্যে রফিক এসে বললো "যে কয়দিন থাকবি আমার কাছে থাকবি এবং আমার রুমেই খাবি। আমাকে ছাড়া কোথাও যেতে পারবিনা।" মাগরীবের নামাজের পর হল মসজিদের পিছনে খোলা মাঠে বসে অত্যান্ত আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে অনেক কথা বললো। তার কথা বলার ধরন আমাকে সন্দেহানী করে তুললো। আমি বললাম রফিক এমন ভাবে কথা বলছিস যেন এটাই তোর জীবনের শেষ কথা(?) মানুষ মৃত্যুর আগে যেমন ভাবে ওসিয়াত করে যায় ঠিক তেমনই যেন তোর কথা বলার ভঙ্গিমা। জবাবে বললো-"বলাতো যায় না মৃত্যু কখন হাজির হবে। যখন সে, বিষয় নিয়ে বসতে হয় সেটার সমাধান এমন ভাবে করতে হয় যেন এটাই আমার শেষ আলোচনা।" আবেগটাকে অন্যদিকে ঘুরানোর জন্য বললাম বন্ধু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা মোটেও ভালনা। এর পরে চাকুরী পাওয়াও মুশকিল। পরিবারের লোকজন তো আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সুতরাং সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পথ চলতে হবে। যে কয়টা দিন বাকী আছে একটু সাবধানে থেকে কোন মতে পরীক্ষাগুলো শেষ করে বাড়ী চলে আয়। চাকরী/বাকুরী খোজ করতে হবে। আমার এই কথা তার হৃদয়ে তীরের মত আঘাত করলো তাৎক্ষণাত একটু অভিমান করে বললো তুইতো কাপুরুষ শিয়ালের মত ভীত। তোদের মত মানুষেরা জ্বর বা ডাইরিয়ায় ভুগে ধুকে ধুকে মরবি। আর আমি সিংহের মত জীবন-যাপন করতে ভালবাসি। সত্যের জন্যে আন্দোলন করছি দেখবি আমি হঠাৎ একদিন মারা যাব। শাহাদাতের আকাংখা নিয়ে ময়দানে কাজ করছি যদি শহীদ হতে পারি তবে সেটা আমার সৌভাগ্য। তুই দোয়া করিস আল্লাহ যেন আমাকে রোগে পড়ে ধুকে ধুকে না নিয়ে হঠাৎই শহীদের মৃত্যু দান করেন।

সেদিন রফিকের জন্য এই দোয়াটা করতে পারিনি বরং বলেছিলাম রফিক আবেগ দিয়ে জীবন চলেনা। আবেগ কমাও বাস্তবতার ফিরে এসো। প্রিয় বন্ধু আমাকে বলেছিল "রেজা" এটা আমার আবেগ নয় বরং এটাই আমার শক্তি। সে দিন কি বুঝতে পেরেছিলাম? যে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুটি তারই মাত্র ১ সপ্তাহ পরে শহীদ আমির হামজার মিছিলে শামিল হয়ে যাবে?

www.pathagar.com

বাড়ীতে এসে শহীদ রফিকের শেষ কিছু ইচ্ছাও তার অনুভূতির কথা বলছিলাম। কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ সংবাদ পেলাম জাসদ ছাত্রীগের বহিরাগত ক্যাডাব কর্তৃক আমার ১৫ বৎসরের অকৃতিম বন্ধু রফিক শাহাদতের অমিয় শুধু পান করেছে। সংবাদটি শোনার সাথে সাথে আমার অস্তিত্ব নিথর হয়ে গেল আমি যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অন্যান্য অনেকের মত আমি এই ঘটনাটি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছিলাম না। কথায় বলে "জিনিষ যায় যার ইমান যায় তার"। আমার হলো এমন দশা। আমি ঘটনার জন্য নেতৃবৃন্দকে দোষারূপ করেছিলাম। এরই মধ্যে একদিন শেষ রাত্রে ফজরের আযানের একটু আগে স্বপ্ন দেখলাম সাদা জামা-পায়জামা ও সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় শহীদ রফিক আমার পড়ার টেবিলের পাশে এসে সুন্দর মুচকি হাসি দিয়ে একটি সালাম দিল। আমি উত্তর দিয়ে পিছনে তাকাতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো রেজা খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন যাচ্ছিস। কেন অন্যকে দোষারূপ করছিস? আল্লাহর ইচ্ছায় এটা হয়েছে। তকদিরের উপর কি মানুষের কোন কিছু করার আছে? ওদের কারো কোন দোষ নেই। তোরা সব ভুলে যা। আমি বললাম রফিক আল্লাহ তোর সাথে কেমন ব্যবহার করছেন। তুই কি শহীদের দরজা পেয়েছিস? উত্তরে বললো আমি খুব ভাল আছি আল্লাহ আমাকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে তবে দুঃখ হলো আমাকে কেন গোসল করাল? কিয়ামতের দিন সব শহীদগণ যখন রক্তমাখা কাপড় নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে আমি রফিক তখন আল্লাহকে কি দেখাবো"? বিষয়টি নিয়ে আমি ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিসে কথা বললে উনারা বললেন যেহেতু পোষ্টমর্টের করা হয়েছে যেহেতু গোশল দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য তুই সুপারিশ করবি কিনা জিজ্ঞাসা করলে বললো অবশ্যই যদি তোরা ভাল আমল করিস, ভাল পথে থাকিস এবং সর্বপরি যদি আল্লাহ তৌফিক দান করেন তবে সুপারিশ করব।" এরপর অনেক বার স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু প্রথমবারের সেই স্বপ্নের স্মৃতি আমাকে সর্বদা বিচলিত করে।

জ্ঞানীরা বলেন "এমন জীবন করিবে গঠন মরিলে হাসিবে তুমি কাদীবে ভূবন" শহীদ রফিক ঠিক তেমনই এটা জীবন গঠন করেছিল। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাতারে শরীক হয়ে নিজে সুখে আছে। আর তার বিরহে জগৎবাসী শোকে মুহমান। সবার মাঝে শহীদ রফিকের শুন্যতা চির বিরাজমান থাকবে যেটা কখনো পূরন হওয়ার নয়। তার পরে শহীদ রফিকের কোটি কোটি উত্তরসুরীরা শোককে শক্তিতে পরিণত করে খোদার জমিনে খোদার বিধান প্রতিষ্ঠার দুর্বর আগ্রহ নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। বাংলার ঘরে ঘরে লাখো রফিকের জন্ম হয়েছে যারা বাতিলের কাছে নথি স্বীকার না করে শাহাদাতের তিব্র আকাংখা নিয়ে ময়দানে কাজ করছে। বাতিলের সকল চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে শহীদ রফিকের রেখে যাওয়া কাজের আনজাম দিয়ে একদিন ঠিকই মনজিলে মকছুদে পৌছাবেই এই কাফেলা। সেই দিনের অপেক্ষায় আমরা প্রহর গুনছি। "তোমরা চিন্তা করোনা বিচলিত হইওনা তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।" (আল কুরআন) আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরতি হাতে যেন শহীদ রফিকের উত্তরসুরীদের সাহায্য করেন - আমিন।

www.pathagar.com

মতিউর রহমান মল্লিক
আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস

অনেক আগেই আমি শহীদদের সম্পর্কে জানবার জন্যে
একঝাঁক জালালী কবুতর
উড়িয়ে দিয়েছিলাম
কেবল শহীদ আব্দুল মালেক ভায়ের নিভৃত গ্রামের বাড়ী
অন্তর দু'বার আমি গিয়েছি-
শিমুল আর শিমুল যেখানে;
যেখানে প্রতিবছরই ছড়িয়ে যায় তাঁর বিচূর্ণ মস্তক
এবং বিক্ষত বক্ষের রক্তের পতাকা মত
অলৌকিক এক কারুকাজ।

বস্তুত এ ভাবেই শহীদেরা চিরকালের মত অমর থেকে যায়
এবং এভাবেই কেউ যেন মুদ্রিত করে গেছে দলিলেরও অধিক দলিল।

তারপর এই সব আলোচনা
এবং সমুদ্র যাত্রার এক ফাঁকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাখীরা
দিয়ে গেল আরেক খবর -
বলে গেল মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও শহীদের দৃষ্টি নাকি
প্রশান্ত এবং প্রজ্ঞাবান দূরগামীর মত
দূরন্তরে থাকে ঃ
নিষ্পালক -
অনবরত অন্য কোথাও!
এবং তাঁর কবর থেকে বেরিয়ে পড়ে আলো ও সুঘ্রাণের অভূতপূর্ব অধ্যয়ন

যেমন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলো শহীদ মুহসিন কবীর
যেমন শহীদ আল মামুনের কবর থেকে বেরিয়ে আসলো
আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস
হায়! আমারও যদি এরকম সাত সমুদ্র তের নদীর কপাল হতো!

www.pathagar.com

মু. আব্দুস সাত্তার
রাত দুপুরে শহীদ রফিক

হৃদয় মাঝে আসন গাড়া, রক্ত মাখা নাম
এই ভুবনে কে আছে যে শুধরাবে তার দাম।
গভীর রাতে ঘুমের মাঝে, ব্যস্ত থাকত দ্বীনি কাজে
ডাকলে পারে রাত দুপুরে, আসত ফিরে সবার মাঝে।
স্মরণ হলে সেই স্মৃতিটা, গড়িয়ে পড়ে অশ্রু ফোঁটা
ভাবতে গেলে অবাক লাগে ভেঙ্গে পড়ে অন্তর খোটা।
রাত দুইটায় জিয়া হলের, ২১১ নম্বর রুমটায়
গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল, আমার প্রিয় রফিক ভাই।
৬ই জুনের গভীর রাতে সভাপতি, রাসেল ভাই ডাকল রফিক ভাইকে
দিলেন সাড়া দুই/এক ডাকেতে, নাড়িয়ে মোদের হৃদয়টাকে।
নেমে এসে জড়িয়ে ধরে, করলেন মোসাফাহ
আহঃ সত্যিই তিনি এই শতকের সাহাবাহ।
কেমন করে এত রাতে, দিলেন সাড়া এক ডাকেতে
বলল হেঁসে যেমনি করে আবু বকর রাসুলেরই 'ডাকেতে।
ঘুমাতে পারি আমি রফিক, জাগে আমার অন্তর
সবই যদি ঘুমিয়ে থাকে রুখবে কে এই প্রাঙ্গন।
জানতাম যদি দুদিন পরে-পাড়ি দিবে পরপারে
অনেক করে জড়িয়ে ধরে ধন্য হতাম গর্ব ভরে
এসো বন্ধু শপথ পড়ি।

আব্দুল সামাদ আযাদ
ফেরদাউসের পাখি

সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম সামনে তোমার
আমার হাত প্রসারিত তখন আকাশের মালিকের দিকে
তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছো লাল পিরহান জড়িয়ে
আর তোমার বুকের উপরে ঢাকা মাটির কবর।

তবু তোমার স্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সেই স্বর্ণালী অনুভব
এদিকে ছিলে তুমি, ওদিকে তুমি, তুমি
একশ পঁচাত্তর একরের সবুজ প্রতি ইঞ্চি ভূখন্ডে
তুমি ছিলে অবিশ্বাসীদের আতঙ্ক এক মানুষ
কারণ রফিক মানেই তো যে মানেনি পরাভব
যে জানতো উদ্ধত সঙ্গিনের সামনে বুক চিড়িয়ে দাঁড়াতে।

www.pathagar.com

অথচ সাক্ষী এখানে সবাই, তুমি ছিলে মাটির মানুষ
ডাইনিং বয় কিংবা ছোট্ট ভ্যান চালক যেন তোমার নামে পাগল
খোড়া চাচার চায়ের দোকানে তুমি ছিলে স্মিত হাস্যে
চির প্রাণবন্ত সরস এক মহান পুরুষ

আজ তুমি নেই -
তবু খাওয়ার টেবিলে ভাত ঠেলে দিয়ে
ছোট্ট ডাইনিং বয়টি আন্‌মোনা হয়ে যায় তোমার পোষ্টার দেখে
এখনো মাঝরাতে তোমার সহকর্মীদের কিংবা কোন কোন সহপাঠীর
বুক ছিড়ে কান্না আসে যেন শতাব্দির পুঞ্জিভূত কষ্ট
চায়ের ধুমায়িত কাপে মুখ রেখে
এখনো দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে এখানে প্রান্তর
আর তুমি তখন ফেরদাউসের সবুজ পাখি হয়ে
ঐশ্বরিক নন্দন উড়ে উড়ে বেড়াও।

ওবায়দুল্লাহ রাসেল
লাল জামা চাই

আমার একটা লাল জামা চাই।
রক্তের মতো টক টকে লাল।
তাজা রক্তের ফোটা যেন মেশানো থাকে,
আর বুলেট যাওয়ার কয়েকটা ছিদ্র।
আমার ইচ্ছে হয় রক্ত স্নাত হয়ে পবিত্র রক্তে।
তাই আমি একটি লাল জামা পরতে চাই।
তুমি কি অবাক হয়ে যাবে রক্ত দেখে?
তুমি কি রক্ত দেখনি কোন দিন?
আমিন, মামুন, মহসিন রফিকের রক্ত-অনেক রক্ত।
তুমি কী দেখেছো সবুজ জমিন লাল হয়ে যেতে?
তুমি রক্ত পছন্দ কর না?
তবে কেন আমাকে নিষেধ কর মিছিলে যেতে
কলমের কালি লাল হলে কেমন হতো?
ওরা রক্ত শূন্য জান্নাতের মাঝে
সবুজ পাখি।
আমার গায়ে অনেক রক্ত
আমাকে একটা লাল জামা কিনে দাও না
রক্তের মত টকটকে লাল
শহীদের লাল জামা।

www.pathagar.com

মোঃ ফখরুল ইসলাম
সুন্দর একটি অমীয় জীবন

কি সুন্দর একটি অমীয় জীবন
একটি শাশ্বত বিপ্লবের অট্টহাসি,
এ ধরাতে ব্যথাতুর হৃদয়ে খুজে ফিরি,
অদৃশ্যে চেয়ে থাকা পাখিকে তাই পারি না বলতে ভালবাসি।
নিজেকে হারায়ে তবু সে দেয়নি হারাতে সাথীদের
অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন করেছে দান,
শহীদ রফিকের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না
যদিও দিতে হয় নিজেকে খোদার রাহে বলিদান।
দূর্বল অনাথ সত্য সন্ধানী মানুষের হৃদয়ের মাঝে
নিজেকে দখল করেছিল দিয়ে তার অনন্য প্রতিভা,
তাইতো অজস্র বাঁধা পেরিয়ে ছুটে যেত
মানব কল্যাণে তিনি গড়েছিলেন এক কাবা।
অনন্ত সমস্যার মাঝেও টেনে নিত
সকল দূর্বল মানুষকে নিজ বিশাল বক্ষে,
খোদার কাছে ছাড়া হয়নি নত কখনও
আজ সেই উন্নত শির পায়না খুজে কেউ তার কক্ষে।
আর কোন দিন শুনিব না সে কথা
দেখিব না কোন দিন সে হাসি আর,
তার অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করার দীপ্ত শপথে
সামনে চলার বোধ শক্তি গড়ে হবে যে আমার।
প্রেরণা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে সাদা
কাপড়ে শহীদি মিছিলে শরীক হয়েছেন। তার প্রশান্ত
আত্মা চলে গিয়েছে জান্নাতের সুন্দর ভূবনে।

সাবিত
শহীদ তাঁরা

ফিলিস্তিনে আটচল্লিশ সন রক্ত-ঝরনা এক,
পঞ্চাশ বছর রক্ত শূন্য কাশ্মীর কেরে দ্যাখ।
মিশর কণ্ঠে ফাঁসির কাষ্ঠে নাসের নিলো মাপ,
নির্বিচারে আফগানিরা সব হয়েছে সাফ।
গুজরাটে আজ নতুন স্রোতে বান ডেকেছে খুন,
পাকিস্তানে বইবে নদী তার পেয়েছি গুণ।
আরব আমার হৃৎপিণ্ড এই শীর্ণ পৃথিবীর,
এইডস-ভোগা জীবন্মৃত লজ্জা-নত শির।

www.pathagar.com

ইরাক কাঁদে বন্দীশালায় ডাকছে মাকে মা,
ও.আই.সি ঐ বলছে ডেকে আসছি আমি যা।
বিশ্বজুড়ে নিঃস্ব-নীড়ে শুধুই খেলো মার,
শ্রেষ্ঠ জাতি পিষ্ট হয়ে লুপ্ত ধরা বার।
যুগের নকীব চলিশ সনে ডাকলো রণ-ডাক,
সেই ডাকেতে দেশ-বিদেশে জোর মারিল হাঁক।
আমার দেশে সাতাত্তর গোলাপ ঝরা সন,
পঁচিশ বছর বাগান করা এক্‌শ ষোল জন।
মালেক, মামুন, যায়েদ, রফিক প্রিয়হারা প্রাণ,
তের কোটি মানুষেরে শোনায় দ্বীনের গান।
জুলুমশাহে মজলুমেরা আজ তুলেছে হাত,
হয়তো শহীদ নয়তো গাজী এটাই মোনাজাত।
দ্বীনের গালিব আনতে যারা রোজ ঢেলেছে খুন,
বিশ্ব জুড়ে শহীদ তাঁরা রবের কাছে শুন।

মুঃ এহসানুল তানযীল (চমন)
চির জাগ্রত তুমি

তোমার মৃত্যু পারেনি তোমায় ছিনিয়ে নিতে
ছাত্র জনতার সশ্রদ্ধ চিত্ত হতে।
শ্বেত শুভ্র ভুষণে-
দাসত্বের ঘৃণ্য জিঞ্জির ভেঙ্গে
সত্য সুন্দরের অনুপম আবাহন
মৃদু পায়ে, অতি সন্তর্পনে
অবিশ্বাসরূপে একদিন আবির্ভূত হলে
সবুজ শ্যামল ঘেরা
ই.বি.র ক্যাম্পাসে
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।
হাজার হাজার পথভ্রষ্টদের করিবে মুক্ত
অন্ধকারের শৃংখল থেকে।
পথ ভ্রষ্টতার তীব্র বেদনায় ব্যাকুল প্রাণে তুমি
দূর্বার আন্দোলনে পড়লে ঝাপিয়ে-প্রচন্ড দুঃসাহসে।
অন্ধকারের জিঞ্জির থেকে রাহুমুক্ত করিবে জাতিকে।
তোমার আগমনে তাই-
গভীর আধার কেঁটে ভেসে উঠলো আলোর গোলক
সমস্ত পৃথিবী গায়ে মেখে নিলো জ্যোতির পরাগ।
তোমার আগমনের অনুদাস আলোক ছটা
বিদীর্ণ করলো কালো অন্ধকার, সমগ্র তমসা।

www.pathagar.com

তুমি অন্ধকার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলে কেবল আলোর জন্য
তুমি রচনা করলে ইতিহাসের জীবন্ত অভিধান
আর পৃথিবী মুক্তি নিয়তি।
তুমিই আলোর উদ্ভাবক আর ও অন্ধকার তিমিরের পার্থক্য
দেখিয়ে দিয়েছো আমাদের
পৃথিবীর বাগানের অনুপম পুষ্পগুলো উপহার দিয়েছো
আমাদের আরাধ্য জীবনের জন্য।
তোমার আগমনে তাই - আমরা পেয়েছি
পরিপূর্ণতার রশ্মি অনির্বান।
পরম প্রশান্তির শারাবান তহুরা ভরপুর দেহমন।
তোমার আগমনে পথভ্রান্ত মানুষেরা খুঁজে পেয়েছিলো পথ,
অপসারিত হয়েছিলো কৃষ্ণরাত।
সত্য ও ন্যায়ের আলো পাপড়ি মেলেছে প্রতিটি দিন,
যা পায়রার চোখের মত উজ্জ্বল কালো সাক্ষ্য আজ।

তুমি চলে গেছ আমাদের একাকী ফেলে
ধ্বংস করে গেছো ভালোবাসার অরণ্য উদ্যান,
আমার অস্তিত্বের সকল গৌরব গাঁথা।
বুক ফাঁটা রোদনে পৃথিবীর তাবত মানুষ হয়েছে স্তম্ভিত,
কুসুম কানন শ্মশানে পরিণত হয়েছে তোমারই শূন্যতায়।

ঘাতকরা তোমায় হত্যা করেছে?
না! কক্ষণো নয় পারবে না ওরা
হত্যা করতে তোমা।
আজো চিরজাগ্রত তুমি ছাত্র-জনতার হৃদয় মন্দিরে।
"অসীম অনন্ত তোমার জীবনের ব্যাপ্তি সুমহান
সকল শ্রদ্ধার শীর্ষে তোমার নামের মহিমা
আত্মার মিনার জুড়ে তোমারই আযান ধ্বনিময়।"
বরং হত্যা হয়েছি মোরা -
যাদের জীবনের নিরাপদ আশ্রয় ছিলে তুমি।
তোমার সেই মহান জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারিনি মোরা
তাই মৃত্যু হয়েছে মোদের বীরত্ব গাঁথার।
যে অদম্য সাহসে একদিন বিতাড়িত করেছিলাম
সকল তাগুতি শক্তিকে।
সেই সাহসী আত্মার মোদের
মৃত্যু হয়েছে ২০০১ এর ৮ জুন।
এই অমার্জনীয় অপরাধে
অনুতপ্ত রব মোরা জনম জনম ধরে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাইফুল আরেফীন

ঝিনুক বোঝাই কষ্ট দানা

(২৬সেপ্টেম্বর'৯৬ শাহাদাত বরণকারী আমিনুর রহমানের ৩য় শাহাদাত বার্ষিকীতে)

পায়রা গ্রাম।
ঘন বাঁশঝাড়ের নীচ দিয়ে
মাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে
বাঁশের আড়ায় শুকনো কলাপাতায় ঘেরা
ছোট দোচালা ঘর
শহীদের বাস চির চন্দ্রিমা কবুতর

সেপ্টেম্বর শেষ সপ্তায়]
চালক ডায়েরীটা বলে দেয়–
মিছিল হবে বড়ো
দোয়া -মুনাজাতসহ কড়া বক্তৃতা হওয়া চাই
বাগ্মীর দরাজ গলায়
সভা জনসভায়
সেপ্টেম্বর তোলে কলস্বর ধুন্ধুমার চমৎকার.....শুধু একদিন।
ওদিকে
সান্ধ্য কুহকের মত, নিশি বাদুড়
কিংবা ভোরের ডাহুকের মত
ছানিপাড়া গর্ভধারিনীর চোখে
বুকে-হাতে-পায়ে-নখে
রাতের আঁধার নিয়ে ঘনিয়ে নামে সেপ্টেম্বর.....
নামে পায়রার প্রতিদিন।
তাতে কি আছে-
আমাদের আছে বিরাট দায়িত্ব
মাতম-আমিন.... আমিন.....

শোকযাত্রা শেষ হয়।
ক্লান্ত পদাতিক বাড়ী ফেরে;
বাগ্মীর বিবৃতি-ছবি আর

www.pathagar.com

স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি
খুনির দরবারেই কড়া নাড়ে।
সাঁকের প্রান্তে দাঁড়ানো পাগলের মত
স্মারক দেখে সে কয়–
"মনে পড়েছে মনে পড়েছে
সেপ্টেম্বরে স্টেনগান ছুঁড়ে আমরা করেছি জয়।"
খেজুর পাতার পাটীয় বসে
কেবলি ভাবেন মা–
আমিন গিয়েছে, মামুন-মহসিন সকলি গেছে
তিতুমীর গেছে-বেরলভী গেছে, গেছে কত নাম না জানা.....
আজো অমারাত্রি!
কোরানের দিন আসেনা।
খালি নমরূদ আর ফেরাউনই রবে যবে
তবে ইব্রাহিম আর মুসারা বেরোবে কবে?
এতো লোকারন্য!
কালেমা কেতন রঙ্গিন গিলাফে আঁকো!
কেন ঘুনে খাওয়া বাঁশ ফেলে দিয়ে তা তলোয়ারে বাঁধো নাকো?

দিন প্রতিদিন কেবলি পেরোয়
মরিচা ঘিরেছে সঙ্গিন।
তাতে কি আছে–
আমাদের আছে বিরাট দায়িত্ব
মাতম– আমিন..... আমিন.....।

পায়রা গ্রাম
পেছনে ফেলে আজ ঘন বাঁশ ঝাড়
মাটির রাস্তা ছেড়ে হাইওয়ে
কনক্রীট পিলারে নতুন সভ্যতা মোড়া
তোমার আলোর ঝালর ঝোলানো ঘর
শহীদের লাশ
ডানাভাঙা
কবুতর।

www.pathagar.com

চির নিদ্রায় শায়িত শহীদ রফিকুল ইসলাম

www.pathagar.com

শহীদ রফিকুল ইসলাম

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	❑	**মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম** (পরিবারে **টুনু**)
পিতা	❑	মাওলানা মোঃ সাইদুর রহমান
ভাই-বোন	❑	৩ ভাই, ৫ বোন - এর মধ্যে তিনি ২য়
বাড়ী	❑	গ্রাম - লাঙ্গল দাড়ীয়া, থানা - আশাশুনি, জেলা - সাতক্ষীরা
পড়াশুনা	❑	দাখিল - ১৯৯০ - থানপুর দাখিল মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা আলীম - ১৯৯২ - বাগআঁচড়া ফাজিল মাদ্রাসা ফাজিল - ১৯৯৪ - ঐ অনার্স (দাওয়াহ) - ১৯৯৪-'৯৫ - শিক্ষাবর্ষ ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাষ্টার্স (দাওয়াহ) - ১৯৯৮-'৯৯ ঐ (পরীক্ষাদানরত)
সাংগঠনিক মান	❑	সমর্থক - ১৯৮৬ সাল কর্মী - ১৯৮৮ সাল সাথী - ১৯৯২ সাল সদস্য প্রার্থী - ১৯৯৪ সাল সদস্য - ১৯৯৮ সাল
যেখানে থাকতেন	❑	২১১, জিয়াউর রহমান হল
শাহাদাত	❑	৮ জুন,২০০১ সাল, বিকেল ৪.০২ টা মাষ্টার্স পরীক্ষাদানরত অবস্থায় ১ টি পর্ব বাকী থাকতে তিনি শহীদ হন।
সর্বশেষ দায়িত্ব	❑	শাহাদাতকালে তিনি শিবিরের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুব ও ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্বে আঞ্জামরত ছিলেন।
আঘাতের স্থান	❑	বিশ্ববিদ্যালয়ের অদুরে মদনডাঙ্গার কামাল মেস প্রাঙ্গনে
আঘাতের ধরণ	❑	হাতুড়ি, রামদা, চাপাতি,চাইনিজ কুড়াল দিয়ে উপর্যুপরি মাথায় আঘাতে মস্তিষ্কের হাড় চুরমার হয়ে যায় এবং স্পাইনাল কড ছিঁড়ে যায়, ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণে তিনি প্রাণ হারান।
শহীদী ঈদগাহে	❑	১১৪-তম শহীদ হিসেবে জমায়েত হন শহীদ মোঃ রফিকুল ইসলাম।

www.pathagar.com

তুমি চলে গেলে ওপারের সুন্দর ভুবনে,
রেখে গেলে আমাদের জন্য দ্বীনের কঠিন জিম্মাদারী

আঘাতের পর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ শহীদ রফিকের মাথা

খুনিদের হিংস্র নখরে ক্ষতবিক্ষত শহীদ রফিক
চেয়ে আছেন অনাবিল সুন্দর ও চিরশান্তির জান্নাতের পথে

www.pathagar.com

শাহাদাত বরণের পরে

শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন

শহীদ আমিনুর রহমান

শহীদ আল-মামুন

শহীদ মহসিন কবীর

www.pathagar.com

মাটির কবরে ঢাকা পড়ার আগেই শেষ বারের মত শহীদ সন্তানের মুখখানি
দেখে নিচ্ছেন মহসিনের মা, এই মুখ তিনি মিলিয়ে নিবেন জান্নাতের সিঁড়িতে

ই, খাতা, বিছানা-পত্র দিয়ে আমিনকে পাঠিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে,সবকিছু ফিরে আসলেও
ফেরেনি আমিন... ফিরেছে তাঁর লাশ। অবুঝ মাকে সান্ত্বনা দেয় সাধ্য কার

শহীদ রফিকের মা।
নির্বাক নিস্তব্দতায় রয়েছে অ-নে-ক কথা

মামুনরে....কলিজা ছ্যাঁচা আর্তনাদে যখন কঁকিয়ে ওঠে বাতাস
তখন শান্ত্বনার সকল বাণী রুদ্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় সভাপতি সহ শহীদের কবরের পাশে দাড়িয়ে শহীদ রফিকুল ইসলামের পিতার আর্তনাদ-"আমার সন্তান শহীদ হয়েছে দুঃখ নেই, এই রক্তের বিনিময়ে তুমি এদেশে কোরআনের রাজ দাও গো প্রভূ"

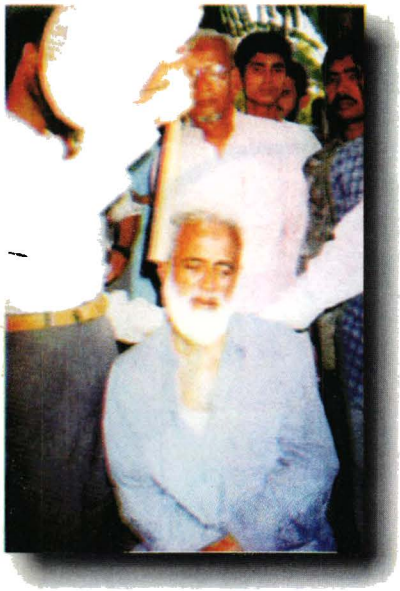

শহীদ মহসিনের পিতা। পুত্র শোকে-র এই বোঝা তাকে বইতে হবে যদ্দিন না আলোর মিছিলের এক সকাল আসে

সন্তান ঘিরে সুখ-স্বপ্ন আজ বিবর্ণ
ছানিপড়া এই ধূসর দৃষ্টিতে।
শহীদ আমীনের পিতা

শহীদ আল-মামুনের পিতা। পুত্রকে সর্বশেষ দেখে এই কামনাই করছেন, পরবর্তী দেখা যেন হয় জান্নাতের সিঁড়িতে

www.pathagar.com

শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুনের মা। বুকের মানিকের লাশ তার সামনে।

শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুনের পিতা। এখনো প্রত্যাশায় ঘুম ভাঙে--তার সন্তানের রক্তের বিনিময়ে আগামী সকালটা সুন্দর হবেই

শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুনের গর্বিত মাতা আজ এ পারে নেই। যার আজীবনের স্বপ্ন ছিল, যে আন্দোলনের জন্য কলিজার টুকরা জীবন দিলেন, কাংখিত সেই কোরআনের রাজ দেখে যাওয়ার, সৌভাগ্য হয়নি, স্বপ্ন বুকে নিয়েই পাড়ি জমিয়েছেন ওপারে।

www.pathagar.com

ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ মিছিলে বিক্ষোভরত ছাত্রজনতার একাংশ

রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে সম্মুখে আগোয়ান শহীদ রফিকের সাথীরা

শহীদ রফিকের জানাযা পূর্ব সমাবেশে জনসমুদ্রের একাংশ

www.pathagar.com

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে শহীদের কফিন শহরের অগ্রণী চত্বরে আনা হচ্ছে

ঝিনাইদহে শহীদের জানাযায় উপস্থিত জনতার একাংশ।

সাতক্ষীরা রাজ্জাক পার্কে অনুষ্ঠিত শহীদের তৃতীয় নামাজে জানাজা।

www.pathagar.com

প্রথম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলা আয়োজিত ছাত্র গণজমায়েতে বক্তব্য রাখছেন শহীদি কাফেলার মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি

শহীদ রফিকের জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল নজরুল ইসলাম

শহীদ রফিক হত্যার খুনিদের ফাসির দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রাইছুল ইসলাম রাসেল ভাই

www.pathagar.com

ছোট বড় সবার মধ্যমনি ছিলেন শহীদ রফিক

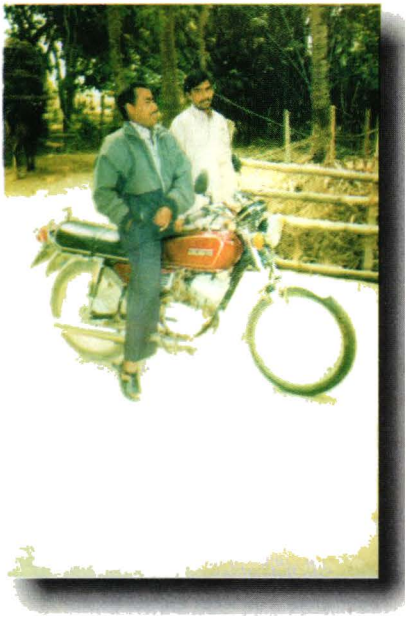

সাংগঠনিক কাজে অহর্নিশ ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সর্বত্র;
দ্বীনের প্রচার আর জনসেবার কাজে কখন পালিয়ে যেত দিনের সূর্য...

সবচেয়ে বড় সত্যি আজ শহীদ রফিক চির নিদ্রায় শায়িত এখানে, ফিরবেনা কোন দিনও;
চলে গেছে ওপারে সুন্দর ভুবনে

www.pathagar.com

মদনডাঙ্গার সেই কামাল মেস,
যেখানে ঘাতকের নির্মমহাতে শহীদ রফিক

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারী
জেনারেলের সাথে শহীদ রফিকুল ইসলাম

শহীদ রফিকুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত শহীদ জিয়াউর রহমান হল যার প্রতিটি ইট-বালুকণায় আজ কেবলি রফিকের অন্যতা!

www.pathagar.com

শহীদের ছোট বোন মাসকুরা। অনিন্দ্য প্রকৃতির সাথে আজীবন মিশে রবে ভাই হারাবার বেদনা

রফিক ভায়ের শোবার ঘর। কর্মক্লান্ত দেহে বিশ্রাম নেয়া চেয়ার, টেবিল, শুন্য বিছানা যেন তারই অপেক্ষায়

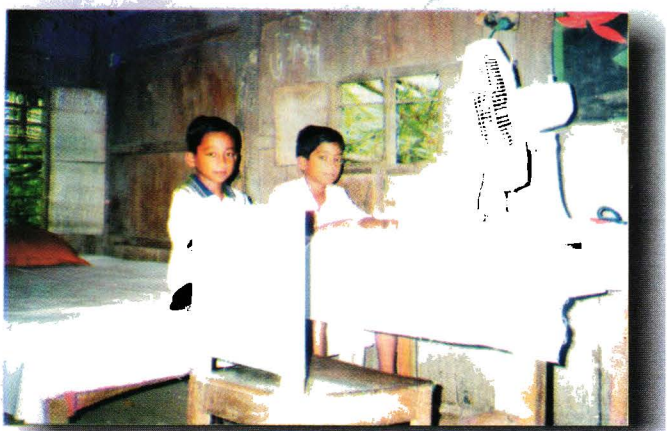

সীমাহীন প্রতীক্ষায় প্রিয় রফিক স্যারের দুজন ছাত্র

www.pathagar.com

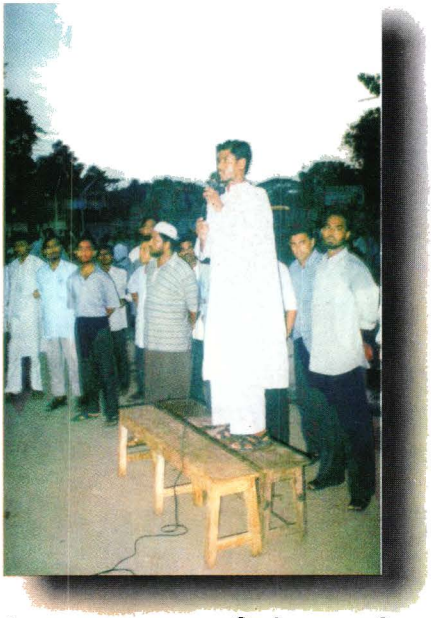

প্রতিবাদ সমাবেশে ঢাকা মহানগরী দক্ষিনের সভাপতি
মোস্তাফিজুর রহমান

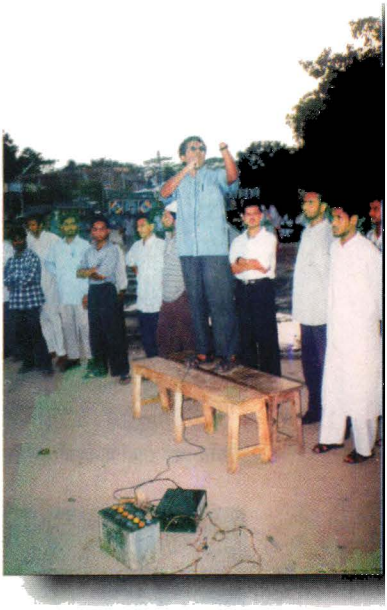

প্রতিবাদ সমাবেশে ইবি'র সাবেক সেক্রেটারী
আহসানুল কবীর মুক্ত

শহীদ রফিকের প্রথম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে মদনডাঙ্গা বাজারে ছাত্র গণ-জমায়েতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের আঘাত ক্ষত-বিক্ষত করেছে তোমাদের দেহ কিন্তু
তোমাদের রক্ত রঙিন করেছে লক্ষ মুজাহিদের বিপ্লবের স্বপ্নকে

www.pathagar.com

রোজার মাসে ছাত্রলীগের হামলার শিকার নিরিহ গ্রামবাসী

www.pathagar.com

তোমার রক্তের উষ্ণ ধারায় ঘুমন্ত কর্মীর
চোখে জন্ম নেবে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র,
আর সেই ঢেউয়ে চূর্ণ হবে তাগুতি প্রাসাদের ভীত।